যাত্রা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ১৯৮৮

একতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ
১৯৬৮

Published by Shri Sumon Ghosh on behalf of the C. U. Students' Union and
Printed by R. B. Basak at Sreekanta Press, Calcutta-9.

23, MUIR ROAD
ALLAHABAD.
The 15th October, 1968.

Dear friends,

Calcutta University Students' Union is issuing an annual Magazine 'EKATA for 1967—68' and they have asked for a few words blessings from me.

The name 'EKATA' chosen by them is very appropriate. If the students are united and decide to work together in a spirit of give and take, any suggestion put forward by them is bound to carry more weight. Difficulty arises rival claims are put forward by rival parties. In when students are divided among themselves and such circumstances the militant group dominates more serious minded students, who are quieter and more reasonable. Absolute unity is not possible but the democratic method of rule by the majority should have the salutary safeguard that the majority must keep in mind the interest of the minority also. No democracy can succeed if the majority decides to run rough shod over the feelings, interest and the convenience of the minority.

I hope magazine'EKATA' will, therefore, give a proper lead to all the students and create a unity among them to that their views might prevail whenever any difficulty faces them.

The world is changing fast. New ideas and ideals are replacing the old. Among other institutions that need a change, Education and University education, administration, accredition etc. have to be carefully looked into and brought in line with modern thought to enable the students to prepare themselves for the new world.

In this Atomic age things are moving to fast, values are changing so quickly that ideals which were considered sacrosanct a few years back have lost all their sanctity and have been replaced by others. One thing that strikes one at the out set is the tremendous national loss when more than 50% on an average of our students have to leave the University at the end either without a degree or without or any real benefit in moulding their mind, their intelligence and their character. The teaching system, the syllabus, the aim behind education, the examination system, the ideals aimed at, have all to be carefully examined and reoriented.

It has become very common to criticise the prevailing system of education. It is easy to see its defects. It is also not difficult to destroy something that exists. But it is difficult to construction & rebuild. It is said that Primary and Secondary Education should be more broad. That education should be such that it helps to build the character of our young men and women, help to develop their minds and intelligence and prepare them to shoulder feture responsibilities and make them good citizens. It is said that University Education should be limited to the few, who are really fit for it and all an sundry should not be allowed to crowd the Universities. But to work out the details, to suggest how the objects aimed at can be achieved is more difficult. The ideas and ideals so vary that the objectives are never achieved, though so many committees, commissions and conferences are appointed & held.

I do hope that with coming into force of the new Calcutta University Act, with all its defects it would make it easier to some extent to introduce at least some of the changes that are ur-

greatly required. The students and the teachers must all combine to work together so that the University of Calcutta which is the largest University in the World and the Premier University in India may be considered to be the best and the most progressive of all Universities. If students have the feeling of loyalty to their Alma Mater and realise that its good name is in their keeping there is great hope for the future.

I appeal to the students not only to publish the magazine 'EKATA' but also to work together in a spirit of unity.

We are passing through a very difficult time. India is faced with problems, which makes many of us feel depressed about the future. Our young men & women who are going to be the future leaders of the country should give up their narrow provincialism and other isms, their selfishness and narrow mindedness, learn to be patriotic sons of their motherland and look after the interest of the country, its good name and fame and help their less fortunate brothers and sisters. We all should bear in mind Kennedy's words :—

"Do not ask what your country has done for you ; but ask what you have done for your country."

B. Malik

Allahabad
24th Oct. '68.

Our beloved Ex-Vice-Chancellor,
Dr. Bidhubhusan Majhi.

Our beloved Vice-Chancellor
Dr. Satyendra Nath Sen.

সম্পাদক-মণ্ডলী

সোমেন ঘোষ—বাংলা, দীপ্তি চক্রবর্তী—ইংরেজী, খাজা ওয়াইদুল হক—উর্দু,
দেওরানী উপাধ্যায়—হিন্দী, অনন্ত মাইতি—ভূগোল,
অমিতাভ ভট্টাচার্য—ইতিহাস, রত্না ঘোষ—মনোবিজ্ঞান,
দীপক চৌধুরী—ফলিত রসায়ন।

সম্পাদকীয়

যে মনটার হাত ধরে গত দু'বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে প্রথম পা ফেলেছিলাম, যে মনটাকে সঙ্গী করে বিভাগ হিসেবের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, আজ আর সেই মনটা প্রাক্তনিকতাবোধ বর্তমান নেই, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গত দু'বছরের অসংখ্য কর্ম প্রবাহের স্মৃতির আবর্তে অনেক নতুন অনুভূতি ভর করে গেল। আজকের এই শেষ মুহূর্তের প্রাক্কালে নিজেকে নিছক একজন প্রবাসী বলে মনে হচ্ছে। সমাপ্তিলগ্নের তীব্রে নিজের বিগত কর্মযুগের হিসাবনিকাশের কথা মাঝারে মনে পড়ছে। ঠিক এমনিভাবেই একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলাম ও পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সমাজের প্রতিনিধি হবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আজন্মলীন সাংস্কৃতিক পরিবেশ, ছাত্রজীবনের অন্যান্য নিবিড় ঐক্যবোধ, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বোধ থাকতে ছাত্রজীবনের অমলিন কর্মপ্রেরণাই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। শুধু তাই নয়, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবিত সমতোলাবোধ ছাড়ার নিয়মের ছাত্রজীবনের বিভিন্ন প্রকাশ ঘটাবার এবং বলা যায়ের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সহযোগিতা ও ভালোবাসা না থাকলে তা সম্ভব হত না, তাই ছাত্রজীবনের পক্ষ থেকে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ছাত্রজীবনের মুখপাত্র রূপে 'একতা'র যার দীর্ঘকালাধিক ঐতিহ্য ও গুরুত্ব বহন করে আসছে। অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকার তীব্রের 'একতা'র স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিতে হবে।

এর প্রচলিত এই 'একতা'র দীর্ঘ বিলম্বিত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি কারণ আছে যা আমাদিকভাবেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিছি। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ঘন্টার বিশৃঙ্খলা, ছাত্র-ছাত্রীদের বৈচিত্র্যহীনতা। দ্বিতীয়তঃ, পরপর বেশ কয়েকটি অনিবার্য ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আজন্মলীন কার্যনিষ্ঠাহ ব্যাহতাগ্রিত, অর্থাৎ রাজনীতির আবিল আবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে অনিশ্চয়তার উদ্রেক এবং সর্বত্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তৃতীয়তঃ, তথ্যাদিসহ লেখার অপ্রতুল্য যার জন্য নিজের ভাবে আমাদের 'একতা'র মুখ দর্শনেরও জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। সময়মতো ভালো লেখা জমা না পড়ায় আমাদের নিজেদেরই অন্য বিভাগের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ক'রে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হয়েছে, এরফলে কিছু সংখ্যক মানুষের সমালোচনার ও কিছু সংখ্যক উৎসুক্যদের প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদেরও ছাত্রজীবনের দ্বিতীয়ক কর্মধারায় ব্যাহত হয়েছে। 'একতা'র এর অনুমোদিত ও কিছু সংখ্যক অনুমোদিত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফল হয়ে গেছে। আমাদের ইচ্ছে ছিল 'একতা'কে সর্বত্রকারে সোভনসুন্দর ও মননশীলতার অভিজাতে

সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করা, তাই সর্বপ্রকার ভাবাবিলাস ও প্রতিক্রিয়ার পরিবেশের বাইরে রাখছিল 'এক্ষণ'র একটি প্রচেষ্টা। তাই এর প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় ছাত্র সমাজের প্রতিটি কর্মী চিন্তিত ছিলেন। এর প্রতীক্ষায় পথ আজ 'এক্ষণ' নিজেকে অনাবৃত করতে চলেছে। হয়তো আনাড়িত্বের উপযুক্ত ভাবে পরিবেশিত হয়নি, হয়তো এক বিশালের যেন কিছু ত্রুটি থেকে গেল তার জন্যে আমরা দুঃখিত। তবু সেরে তোলার আমাদের বিন্দুর প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক বিভিন্নাংশের সম্বন্ধেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের যেন অনেকটি বিভাগে অনেক থেকে 'লেকচারার' নিয়োগের কথা এতদিনে প্রায় নিঃসন্দেহে ভাল নিয়েছিল। আমাদের নিজস্ব দু'একটি বিভাগে সম্প্রতি 'লেকচারারে'র শূন্য স্থান পূর্ণ হয়েছে এবং এ নিয়ে প্রথমেই উল্লেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলাবিভাগ'। এই বিভাগে সম্প্রতি অনেকজন 'লেকচারার' নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক পাঠ্যসূচীর অবস্থাও অনেকটা। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপিকা থেকে কারার স্থানে আরা, মাসীর স্থানে পিসীকে বসানো হচ্ছে, এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেন অধ্যাপনেও যদি পাঠ্যসূচীকে ক্ষেত্র করে এমনি দুঃখার্থ চলে তবে এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। প্রয়োজনটা বিশেষভাবে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা অনুভব করি। তাই বিশেষভাবেই আমরা তাই ছাত্রছাত্রীদের একটি অনুরোধ জানাই, নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা যদি অনেকটি বিভাগের দুর্বিন পাঠ্যসূচীর সংস্কারে ব্রতী হন তবে অনেকজন ছাত্রছাত্রীরা আজ প্রচুর পরিমাণ হবেন এবং সমাজের সকলের ও আমাদের প্রাপ্তি হবে আমাদেরই।

(খ) প্রতিক্রিয়ের মতো এখানও ছাত্রসংসদের উদ্যোগে নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিক্রিয়ের মতো এখানও নাটকগুলোর ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক শিল্পিসত্তার পরিচয় বিশেষ প্রশংসনীয়।

এখানেও প্রতিযোগিতায় ইসলামিক ইতিহাসবিভাগের নাটকটি শ্রেষ্ঠ অভিনয় ও পরিচালনার জন্যে পুরস্কার অর্জন করেছে।

এবার সর্বশেষে যেন কথার আগে আমার সহকর্মী বন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার নিজস্ব পরিচিত মানুষ ও সহযোগীদের। যাঁরা ঋণের দিয়ে ও আমার ভাবে 'এক্ষণ'কে অনেকের সম্ভব সাহায্য করেছেন, বিশেষ জানাই প্রিকার যেসব প্রতিষ্ঠী কর্মী ও পরিচালককে যিনি নানাপ্রকার বিঘ্নের মধ্যেও 'এক্ষণ'কে যেন বাঁচা হবে। এঁদের গতি সকলের সহায়তা করেছেন প্রেরণাদায়ি।

সোমেন ঘোষ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৩

University Students' Union, Calcutta

CENTRAL STANDING COMMITTEE
1967—68

Ashes Maiti : President,
(Dept. of Geography).
Dilip Dutta : Vice-President,
Dept. of Appl. (Chemistry).

Kamaleswar Gupta—General Secretary,
Dept. of Philosophy.
Gargi Ray—Asst. General Secretary,
Dept. of History.

Kumud Ranjan Kanti Chowdhury—Treasurer,
Dept. of Comparative Philology.
Tapas Palit—Member,
Dept. of Islamic History.
Ashis Bose—Member,
Dept. of Commerce.
Tapas Banerjee—Member,
Dept. of Political-Science.
Dilip Charan Chakrabarty—Member,
Dept. of Pure-Physics.
Subhas Samanta—Member,
Dept. of Pure-Physics.
Sunil Ranjan Biswas—Member,
Dept. of Anthropology.
Biswakeshin Chatterji—Member,
Dept. of Pure-Mathematics.
Samir Bhattacharyya—Member,
Dept. of Geology.

College Street Autonomous Students' Union
Rathindra Nath Chowdhury President.
Political Science.
Ram Bose—General Secretary.
Bengali.

Ballygunj Science College Autonomous Students' Union.
Krishna Banerjee President.
Pure Mathematics.
Sunil Ranjan Biswas—General Secretary.
Anthropology.

A.P.C. Road Science College Autonomous Students' Union.
Prayag Mandal—President.
Pure Chemistry.
Dilip Charan Chakrabarty—General Secretary.
Pure Physics.

আমাদের কথা

ভারতীয় জনমানসে সিপাহী বিদ্রোহ জাতির ঘুমেছিল এক বিরাট আলোড়ন। এই আলোড়নের অপেক্ষাকৃত ভারতমাতার পরাধীনতার গ্লানি বা মুক্তি পর্যন্ত ছিল অব্যাহত। ১৯৭৭ এ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে শাসনভারে কংগ্রেসের উদয় হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ এগারোবছরে এই বিশবছর ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এই কংগ্রেস সরকার। স্বাধীনতোত্তর এই দীর্ঘ বিশবছরে একাদশ কংগ্রেসী সরকার ভারতবর্ষে উন্নতির জন্যে গ্রহণ করেন বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলোকে কার্যকরী করার কোন প্রচেষ্টা দেখা গেল না শাসকগোষ্ঠীর। স্বাধীন দেশের জনগণ এই দীর্ঘ বিশবছরে স্বাধীনতার কোন স্বাদ পেলনা। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনের দিকে তাঁরা নজর দিলেন না। পরাধীন দেশের জনসাধারণকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার পরায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজরা আমাদের জন্যে চালু করেছিলেন। স্বাধীনতার আর কোন পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চলেনা না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৭৭ একটি নূতন দিক নির্দেশক বছর। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৭ এগারোবছরে কংগ্রেস সরকারের কি ক্ষেত্রে কি বিভিন্ন কাজে ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। ১৯৭৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের জনগণের রায়ে কংগ্রেস সরকারকে হটে যেতে হল ৯টি রাজ্য থেকে এবং কেন্দ্রেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব অল্প ব্যবধানে থাকল। বাংলাদেশের মুক্তে প্রতিষ্ঠিত হল জনগ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। ১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে ফ্রন্ট সরকার গঠিত হল সেই সরকার কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনয়নের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন। যখন বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীরা প্রথম ঘন্টির মুখার অধিযোগে বেরিয়ে এলেন এবং আবার প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও যখন পরীক্ষা গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা হচ্ছিল সেই সময়ে ফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর প্রচেষ্টায় এক সম্মেলন আহত হয়। এই সম্মেলনে ছাত্র প্রতিনিধি, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানীগুণী উপাচার্য এবং অন্য দায়িত্বশীল শিক্ষাবিদ এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যৌথ প্রচেষ্টায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্রতী হওয়ার সমস্ত গ্রহণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর পূর্বে ছাত্রদের প্রশ্নপত্রের বেশ কয়েক যে সমস্ত অভিযোগ তাদের সেগুলি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। এই প্রথম চালু হল বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে অভিযোগ-পত্র দাখিল প্রথা এবং ছাত্রদের সেই অভিযোগ পত্র সম্পূর্ণ করে ঐ পরীক্ষা-কেন্দ্রের অধিকর্তার হাতে সমর্পণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ঐ সমস্ত অভিযোগ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যা কিছু করণীয় তাই করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্যে সকলে সমর্থ হয় না। ফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে নিজেই প্রথা চালু করে এবং যে সকল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী

সমস্যা তব সেই সকল মহাবিদ্যালয়ে আসন সমস্যা সমাধানের সমস্যা তবলেও এবং এই সমস্যা অনুধাবন করেই সংঘ ছাত্রছাত্রীদের সমুখে উন্মুক্ত হল উচ্চশিক্ষার দ্বার। শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন, পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন ইত্যাদি বহুমুখী আন্দোলনের প্রতিটি প্রয়াসী হয়েছিলেন এই ছাত্রশক্তি কর্মী সমাজ।

কিন্তু ১৯৫৩ সালে চরম বিপদ উপস্থিত: কি ভাবে এই ছাত্রশক্তি সংগঠনের পরিচয় ঘটানো সম্ভব। ১৯৫৩ সালে নিখিল ভারত এস. এফ. এ যোগ্যতা অর্জনে এক অবশ্যই আমাদের এই যোগ্যতা অর্জনের অধিকারকে হরণ করে আমাদের ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা গ্রহণ করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের দায়িত্বভার। আমাদের কার্যধারা গ্রহণের ভিতরে দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃপ্রবেশের পথে বন্ধ হয়ে গেল।

পুনঃপ্রবেশে যাদবপুর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিল যাদবপুর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের তত্ত্বাবধায়নে সভাপতি। ঐ সম্মেলনে ছাত্রদের বহুবিধ সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে আলোচনা শুরু হয় এবং বহু শুরুত্ব পূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে সমস্ত প্রস্তাবগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার স্বীকৃতি।

(২) মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হবে তাতে ছাত্র প্রতিনিধি থাকতে হবে।

(৩) সকল মহাবিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধিমূলক ছাত্রসংসদ থাকতে হবে।

(৪) শিক্ষাঙ্গনে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রভাব বা অনুপ্রবেশ করা চলবে না।

(৬) সিলেবাসের ভাষা দিতে হবে।

পুনঃপ্রবেশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্যে ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে 'Suggestion Form' রেখা হয়। নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করা এবং তারই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব সমস্যা থেকে শুরু করে বিদায়ী অনুষ্ঠান ও সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন সমস্যা ঐ suggestion Form এর মাধ্যমে থেকে যা দুরীকরণের প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়ার পথে এগিয়ে চলবার আমরা। এই সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ে যখন এগোচ্ছি ঠিক সেই সময়েই আমাদের পূর্বাধিকার অর্জনের থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে ছিলাম। আমার ঘরে পরম ঘটনা হল আমাদের ছাত্র আন্দোলনের এক প্রতিষ্ঠা করা যাঁর বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাবর্তনের বেদনার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতা। আমাদের সংগ্রামী আন্দোলন সম্পূর্ণ আইনানুগ ও অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে যে পুরুল সংগঠন করেছে তার বিরুদ্ধে বিচার আনিয়ে ঘরে ঘুরলেন গণতন্ত্রের। গ্রামে, গঞ্জে, নগরে, সহরে সর্বত্রই শুরু হয়ে গেল আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সহস্র সহস্র নরনারী যোগ্যতার কারাবরণ করলেন। ১১৪ ধারা জারী করেও যখন সংগ্রামী জনতাকে রোধ করা গেল না তখনই এই ঘৃণিত সরকার পার্টি, গুলি, টিয়ার গ্যাসের ব্যবহার করতে প্রয়োগ। শুরু হল ঘৃণিত পরিবেশ, গ্রামের মাতা ছাত্র। নিরস্ত্র নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ বা ঘৃণিত পড়া অন্যের প্রবেশ বা এমনিভাবে পরবর্তে বিশ্বাসন,

মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর এক অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজও এগিয়ে এসেছে তার সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের পতাকাকে সমুন্নত করে। বিভিন্ন পর্যায়ে যে গণআন্দোলনের জন্ম উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ প্রতিবেশেই তার স্থান রেখেছিলেন প্রথম সারিতে। এই অসার এবং অপদার্থ শাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ালেন সর্বস্তরের ছাত্রসমাজের কর্মীরা, দাঁড়ালেন সর্বস্তরের যুব সমাজের কর্মীরা এবং আরও অনেক বাড়িয়ে দিলেন সহযোগিতার হাত। সকলের সমর্থনে উজ্জীবিত হয়েছিল :

"আমিও ছিলাম রাজবন্দীর আমি যদি সেই হই
যখন হাতানো শাসনে তোমের
চিন্তা আমি তুলবোই।"

অবশেষে এই গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বৈরাচার খতম করে নিজের দেশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শাসনের ঘোষণা জানালেন।

এই দীর্ঘ তিন চারমাস ধরে আমরা বাংলাদেশের গণআন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন আশু সমস্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা আবেদন রাখলাম যে প্রয়োজনে নিকট, প্রথা চালু করে বা নূতন সেশন শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবী মেনে নিয়ে ঘোষণা দিলেন প্রথা চালু করে ঘোষণা নূতন সেশন শুরু আসন সংখ্যা ঘোষণা বোনাও বিলম্ব করলেন। কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রতিটি শাখাতেই আসন সংখ্যা বর্ধিত হল। অথচ যেন অহীনতা আন্দোলন চলাকালে সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে তাঁরা যেন বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় বন্ধ না রাখেন কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়। তাছাড়া, বি এ, বি এস সি, বি কম্ পাস ক'রে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারবেন না যদি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে এবং এর ফলে Regularity হবে বিঘ্নিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবীজীবন চিন্তায় অনেক ছাত্রছাত্রী মানসিক যন্ত্রণায় আমাদের কাছে যৌক্তিকতা স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখলেন না।

সরকার ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করবে এমন এই আশা নিয়ে যে, আমরা যারা হলে থাকি তারা নিশ্চয়ই চলন ও খোরাক নিয়ে আপ্যায়ন জানাব কিন্তু আমরা সেদিন এভাবে সরকারের স্বপ্ন করতে পারিনি। স্বপ্ন করতে পারিনি এই কারণে যেহেতু সেদিন এমন আয়োজন ছিল না যেটা প্রকৃতে চর্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জীবন ছিল অনিশ্চিত। ত্যাগ করতে করতে ছাত্রছাত্রীরা দেখলেন যে, তাদের ঘরে এসে বিদেশিরা হানা দিচ্ছে। এই ধরণ অনিশ্চয়তা এবং দোদুল্যমান ছাত্রজীবনে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে পারলাম না চলনে চর্চিত করে আপ্যায়ন করতে। তাই সময়োপযোগী নবীন বরণ উৎসবের আয়োজন করলাম আমরা। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের 'Greetings Card' হিসেবে সেই Card দিলাম যার ওপরে লেখানো আছে আমাদের এই পবিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত গৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাস পুলিশ করাবে নিজের নিজের ছাত্রছাত্রীদের উপর ঐতিহ্যের ঐতিহ্যবোধ উজ্জীবিত এবং বিনয়ের নিজে

একটি সমবেতসঙ্গীত কবিতা লেখা ছিল এবং একটি ছবি ছিল যে ছবিতে ঐক্যের মোর মহীরুহের বিরুদ্ধে ছাত্রবিদ্বেষে সংগ্রামী ছাত্রেরা যখন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে সিদ্ধান্তিলেন তখন সেই ঐক্যের মোর মহীরুহের পুলিশ বীরবিক্রমে তাদের উপর যে অত্যাচার চালায় সেই অত্যাচারের ফলে হয়েছিলেন যে নিরীহ ছাত্রমন্ত্র অত্যাচারের বলি হয়ে ছাত্রেরা যখন ঘরে বই এবং ছুড়ে ফেলে পালিয়েছিল সেই ছবিটি। এই ছবি আমাদের সকল সময়েই 'চেতনার সঙ্গে যুক্তির পড়ে কেমন ক'রে শহীদ' সকল করিয়ে দিচ্ছিল। তাছাড়া আমরা ছাত্রছাত্রীদের নবীন সকল উৎসব অনুষ্ঠান করবার 'চেতনার কথা : বর্ষা এল প্রেমে' নামক ভিত্তিপর্দাটির ব্যবহার। এই ভিত্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশের অতীতের সিত্ত ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের সঙ্গে তুলে ধরতে। মুক্তাঙ্গনে সেবারে সেই প্রদর্শনীতে এসে উৎসাহবোধ করেছিলেন উপাচার্যের এবং বাংলাদেশের সকল প্রান্তের আগামর জনসাধারণ 'অবলোকনকারিতা হয়, প্রবিক, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসে আমাদের উৎসাহ বর্ধন করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা বিপুল সাড়া পেয়েছি।

সকল বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা Suggestion Form পূর্ণ ক'রে দিয়ে গেছেন সংগ্রহালয়ের জন্যে। সংগ্রহালয়ের সকল সদস্যবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় গড়ে তুলবার আন্দোলন। ছাত্রছাত্রীদের নিকট যে সকল সুপারিশ ছিল তা যুক্তিসঙ্গত আমরা গ্রহণও করেছিলাম। এবং কোন কিছু ছাত্রছাত্রীরা নিকট সুপারিশ যুক্তিসঙ্গত সম্ভব হয়েছি। বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তোলা হোল। সকল বিভাগের যে সকল সমস্যা যুক্তিযুক্ত হয়েছে একথা আমরা বলি না। তবে একথা আমরা বলি যে, বিভিন্ন বিভাগের যে সকল সমস্যা হয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা আমরা করে তুলেছি। কোন কোন বিভাগের আরও বিস্তর কিছু সমস্যা মেটাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থার বিষয়ে করে তোলা হল ১৮ই এপ্রিলের আন্দোলন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় বেতিবৃন্দের সমীপে আমরা নিম্নলিখিত তুল দাবীগুলো নিয়ে উপস্থিত হলাম :

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে অন্তত সংখ্যা এবং পুরুষ সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের টীপ্ ব্যাপিনের উচ্চমূল্যের খাদ্যদ্রব্যের দাম কমিয়ে দিতে হবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রা পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) ছাত্রীদের জন্য ইন্দ্রের হোস্টেল বাড়ানো হবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ প্রান্তদের এলাকাটিকে বেরে হাল প্রতিনিধি রাখতে হবে।

(৬) হাজরাতে প্রাচীন ইতিহাস ভবনে এবং জগদীশ লাহা হল যোগ বিজ্ঞান ভবনে আরও টীপ্ বাতিল ও টীপ্ টেস্ট স্থাপন করতে হবে এবং স্থায়ী ভাপ্ ভাটিকার স্থাপন করতে হবে।

ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে নিয়ে উপাচার্য সকল দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রে নেন এবং অবিলম্বে কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দেন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই অধিকাংশ দাবী মেটানো হল। ব্যাপিনে প্রায় প্রতিটি উচ্চ মূল্যের খাদ্যের দাম ৫ পয়সা করে কমে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে অধিকসংখ্যক মহিলা নেয়া হল এবং পুরুষদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকটির ভূমিকায় প্রায় বিশ্ব টাকা মূল্যের নিম্নমূল্য প্রদান করলেন এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হলগুলোও পুরুষ মেসের জন্য

নির্ধারিত অর্থের বিল যথেষ্ট সময় ঘোষণা করলেন। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ভেদা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ডিগ্রি আদায়ে সক্ষম হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

১৯শে এপ্রিল আমরা গ্রন্থের উপাচার্য ডঃ বিশ্বনাথ রায়ের মহাশয়কে স্মারকলিপি পরিষদের জন্য জানালাম বিশ্ব সমস্যা এবং আমরা জানালাম নবনিযুক্ত উপাচার্য গ্রন্থের ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে।

বিষয় সমস্যা থেকেই ১৯৬৭ সালে ঘোষিত আন্দোলন মুক্তির পথের স্থিতাবী মহাত্মাগান্ধী কার্যালয়ের ১০০ তম জন্ম পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। আমরা পরামর্শদাতা এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলাম। বিভিন্ন মার্কসীয় অধ্যাপক বিভিন্ন দিনে এই আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে মার্কসবাদের প্রয়োগশীলতা, গুরুত্ব এবং মার্কসবাদের প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধক ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭০ সালে দুটো প্রবল বন্যার সম্মুখীন হলেন। বেরিবাঁধ এবং উপকূলে যে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়ে গেল তাতে জীবনহানি ঘটল লক্ষ লক্ষ মানুষের। সরকারী আনুমানিক হিসাবে উপকূলে সরল সরল নরনারী, শিশুরা পশুর ঘটল জীবনহানি। বেরিবাঁধগুলো বন্যার পর সমস্ত গ্রাম অঞ্চলের মানুষ ছিটিয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে পক্ষ পরিক্রমার মাধ্যমে এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে তা পাঠিয়ে দেওয়া হল দুঃস্থ নরনারীদের সেবার জন্যে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ কিছু দিন পূর্বে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অস্থায়ী বিভাগীয় প্রধানের নিয়োগের ক্ষেত্রে করে এক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ অস্থায়ী বিভাগীয় প্রধানকে নিয়োগের দেরী ঐ পদে বহাল না করে প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিন মাসের মধ্যেই নতুন বিভাগীয় প্রধানের নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলে ছাত্র সংসদ সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

বাংলাদেশে বিগত বছরের মাঝে যখন দুর্ভাগ্য আক্রান্তারা আসেন তখন বাংলাদেশের জনসাধারণ আক্রান্তারা ফিরে যাওঁ অর্থ নিয়ে নিয়ে এগিয়ে আসেন। আমরা জানতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আক্রান্তারার সঙ্গে এক যোগ সভার মিলিত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ উপাচার্যকে ঐ যোগ সভা বর্জনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেহেতু আক্রান্তারা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিয়েতনামের বহু ছাত্রছাত্রী তথা জনগণের হত্যাদান করেছেন। আমরা সেইজন্যই বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম ঐ যোগসভা বর্জনের।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে সবসময় আন্তরিক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সংসদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখে যে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন ছাত্রসংসদ সংগঠিত করেছিল তার সাফল্যের মূল সকল ছাত্রছাত্রীরা ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে জানাই আমাদের অভিনন্দন। স্থিতাবী সংসদের পক্ষথেকে আমরা চলচ্চিত্রের আপনাদের সহযোগিতার কথা স্মরণ করে আপনাদের সকলের কাছে আবেদন জানাই যে, আপনারা আমাদের সংসদের সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন ঠিক সেইভাবেই ভবিষ্যতে সহযোগিতা করে সংসদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ চালাতে সাহায্য করবেন। আসুন, আমরা সবমিলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন গড়ে তুলি যার মাধ্যমে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি দূরীকরণে সক্ষম হই এবং

ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠভূমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের মাঝখানে গড়ে তুলতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আমরা আমাদের শিক্ষা জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারি যাতে। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সমুখে কোনও বাধাই বাধাস্বরূপ দাঁড়াতে পারবে না বলেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের বিশ্বাস। তাই, আসুন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাই আমাদের মূল লক্ষ্যের দিকে। আমরা বিশ্বাসী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতিও দিতে পারি যে, গণতন্ত্রবিরোধীদের যেকোন যে কোন প্রচেষ্টার ছাত্রসমাজ গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে সংগ্রামী হয়েছে (যেমন : উইলসন বিশ্ববিদ্যালয় ও কেনেডির হিবু বিশ্ববিদ্যালয়) আমাদিগেও সেইভাবে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ঈষৎ' ক্ষুণ্ণ হবার আগে আমরা সকলপ্রকার চেষ্টা চালাব। অবশেষে আপনাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের কথা শেষ করছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজ জিন্দাবাদ !!!

ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ !!!

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

এক বছরের দ্বার আরোহণ : একটি পর্যালোচনা

বন্ধনহীন গ্রন্থি সন্ধানে, বাংলা গল্প

বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

সাম্রাজ্যবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

সাম্প্রতিক ছোট গল্প ও কবিতার শৈল্পিকতা

আধ্যাত্মিকতা

দুর্যোধন অপরাধ

অ্যাবসার্ড নাটক বলতে স্পষ্টত কি বোঝায় ? কোন্ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকের জন্ম

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বিশ্ব রাজনীতি : আলজেরিয়া সমস্যা

কাব্যে বৈজ্ঞানিক ভাবনার ও লোকচরিত্র চিত্রণের

বয়স্কাউট প্রসঙ্গে ২৭ দিন

প্রতিবেশী, মুসলমান ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

আর নয়

সমকালীন শিল্প সমীক্ষা

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মার্কস ইসলাম 'সবুজ পাঁচালি'

দুই উপন্যাস : অবক্ষয় ক্ষয় প্রোলেটারিয়ান সংঘর্ষ প্রসঙ্গে 'সবুজ পাঁচালি'

কবিতা

সবুজের সেতুবন্ধ থেকে

জিরো ডিগ্রি সুবোধ

নির্জন প্রান্তরে সকলকে বৃষ্টি

দৃশ্য ভিন্ন

হেমন্তে ভালোবেসে অঘ্রাণে

সুবোধ সিংহাসনে রাজাধিরাজ করো

আজও কাঁদলে উঠোনে

গাড়ির ভিতর

নিবেদন

প্রতিশ্রুতি

অনুজ্ঞা বাতিঘরে তোমাদের পরীক্ষার ছবি

প্রয়োজন সংকার

জনৈক বুদ্ধিজীবী বন্ধুর প্রতি

রাজা

প্রেম ইত্যাদি কয়েকটি বোধ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

English

On being asked to Play

Metamorphosis

Here we go

Love is a Stupid, Stupid Thing

Some Stray thoughts on "The Tyger"

The Indian intellectual Scene : A Post-Mortem

Thoughts of Death in English Poetry

Poetry of Sincerity

William Wordsworth's Philosophy of life and nature

The Governor's Role in New Perspective

Separation of Judiciary and Executive

Employer—Management Relations in Industry

Introduction to an Italian edition of 'Capital'

Parvez Saheb

Hindi

Urdu

॥ এক বছরের ছাত্র আন্দোলন ঃ একটী সমীক্ষা ॥

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
(১ম বর্ষ—ইংরেজি)

ছাত্র আন্দোলনের মতো ঐতিহ্যবাহী ব্যাপারকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মুখপত্র, কিছু পলিটিক্স্, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে রচিত দু' চারটি পুস্তিকা (যার প্রায় সবই দুষ্প্রাপ্য) ছাড়া সাধারণত ছাত্র আন্দোলনের সাহিত্য মানে হলাম ইস্তাহার বা স্টেটমেন্ট এবং (বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে) অভিযোগপত্র বিস্তৃতি। এই সব লেখাগুলি এমনভাবে পরিবেষ্টিত চাহিদাজাত, সবসময় কিছিৎ প্রোপাগান্ডাধর্মী এবং 'বাংলার ছাত্রসমাজ' ইত্যাদি ঘন্টা পরপর যেন্ত্রে বহু ব্যবহারে জীর্ণ বুলিতে ভরা। সুতরাং পরিস্থিতী ইতিহাস হিসেবে সে-সব থেকে কিছু ঘটনার বিবরণী তৈরী করতে পারলেও, কিন্তু স্বেচ্ছায় অভিযোগের সে-সব লেখার মধ্যে মধ্যে বর্তমান, তাই তার মূল চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো বিশেষ সংগ্রামের মূল্যায়ন সাধারণত ছাত্র আন্দোলনে করা হয় না বা-ও বা হয় তা-ও আসলে উদ্ভাস ও অসম্পূর্ণ আত্মসমালোচনার সমবায় বিশেষ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪৯, ৩৬ থেকে ৪১, ৪২ থেকে ৪৭ এবং ৪৭ এর পর এগুলির - কতটুকু তার অগ্রগতি, কতটুকুই বা পশ্চাৎগতি তার কোনো বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পাওয়া যায় না—ছাত্র আন্দোলনের মৌলিকী ভাবনায় কল্পতরু কিন্তু নেই —ফলে সাম্প্রতিক কালে যারা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের তাঁরা বঞ্চিতই থেকে যান।

এবং বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষে কোনো লেনিনও এ-ব্যাপারে কলম ধরেন নি। সম্প্রতি মস্কো থেকে প্রকাশিত Lenin on youth নামক সংকলনটিতে চোখ বোলালে বোঝা যায় তাঁর ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল। রাশিয়ার ছাত্র সমাজের মেনশেভিজম বা কোনো বিশেষ অবস্থাকে তাঁর বিশ্লেষণও একটি বিশেষ পদ্ধতির সূচক। এ সম্পর্কে বিস্তৃতের আলোচনাও প্রয়োজন।

সম্প্রতি জন্ম হয়েছে 'স্টেটসম্যানে'র একটি নেতা পড়ে (১৩ই জানুয়ারি '৬৮)। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত মহলের একটি সাংবাদিকী ধাঁচে এই আলোচনাকে (?) সিদ্ধান্তে উন্নীত হয়েছেন : গত বছরটি কেটেছে এক "বন্যা বিভীষিকাতে"র মধ্যে দিয়ে, তাছাড়াও ছাত্রদের এখন প্রচুর, হজমাস এবং যাদবপুর বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি ইর্ষান্বিত, পরীক্ষায় সবসময়ই প্রথম হবার ওপরওয়ালা হয়ে যাওয়ায় অনেকে আই. এ. এস., ফরেন, বি. সি. এস্ ইত্যাদি পরীক্ষায় বসিত; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের ভেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেই ভেজিটেরিয়ান কলেজ এবং বিশেষত দিল্লীর সেই ইংরেজদ্বী কলেজের মাঝার অনেক আগেই; ফলে কলকাতার ছাত্রদের এবার সব কিছু থেকে ভালো করে নিজেদের 'ইনভল্ভ' করে তুলতে আগ্রহী, রাজনৈতিক দলগুলিকে যদি

ছেলেবয়স থেকে বিরত রাখা যায় এবং অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি একটু তলিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখেন, তবে অনেক ভালো ফলাফলের আশা করা যায়।

ছাত্রদের একটিমাত্র মূলধারা শ্রেণীর সংবাদপত্রের কলম-পন্থী সাংবাদিক তাঁর মতো করে একটা সালতামামি করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী কাছাকাছি থেকে দেখেছেন তাঁদের কারুর এমন বেফাঁস উক্তি করার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সেক্টরদের দুই পরিচয় সম্পর্কে উদ্যোক্তা হওয়ার দুটি কাহিনী শোনাচ্ছেন: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ বাকি দুনিয়ার কাছাকাছি সিনিয়র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মুখোমুখি এসে, এ পরীক্ষা নিয়োগের ব্যাপারে যে, আর তার ফেডারেশনের পরিচয় করানোর জন্যে একটি ইউনিয়ন রেজাল্ট নাকি অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষার্থীর ফল বলতে দেখা গেছে। যাঁরা ছাত্র আন্দোলনের ভুক্তভোগী অথচ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন তাঁদের পক্ষে ঘটনা দুটির সত্যাসত্য বিচার করা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তবে যা হয়ে থাকে তা' সম্ভবেই অনুমেয়। এর কোনো প্রতিবাদও এখনও পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় নি। সুতরাং অবশ্য লোকজন মোটামুটি ধরেই নিতে পারেন যে উদ্যোক্তা ছাত্র সংসদ প্রবক্তাদের বিবৃতি এবং তাঁর সিদ্ধান্তও সঠিক। পরিসংখ্যান আর অঙ্কও খাটে, কিন্তু বিষয়বস্তুর ওজনের দিক দিয়েই আরও বেশী করে ১৯৬৯ সালের ছাত্র আন্দোলনের একটি সালতামামি করা দরকার। ৭১শে মুক্তফ্রন্টের ঘটনার আগেই সালতামামি শেষ করছি কারণ সেটি অন্য এক অধ্যায়। (ঘটনার মূল্যায়ন ও মতামত অবশ্যই লেখকের নিজস্ব)

সালতামামি

(১) সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে শ্রেণিচরিত্রগত কলেজ ও মৌলনা আজাদ কলেজের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় এক পরাজয়কর নিষ্পত্তি ঘটে। শ্রেণিচরিত্রগত কলেজে এই আন্দোলনের নেতারা বর্তমানে তাদেরই ছাত্রপ্রতিনিধি।

(২) সাধারণ নির্বাচনের পরে ছাত্ররা আশ্চর্য রকম ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে নয় দুইফ্রন্টের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

(৩) যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্ররা বিভিন্ন ক'রে নিজে তাদের অভিযোগ জানিয়ে আসেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ২ মাসে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো মৌলিক সংস্কার করতে পারে নি, কিন্তু তবুও যুক্তফ্রন্টের প্রতি ছাত্রসমাজের একটা মানসিক আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল।

(৪) নিম-বাঙ্গালী সরকার সময় ছাত্ররা পথে নেমে বাধা দেবার পক্ষপাতী হন।

(৫) খাদ্যসংকট তীব্র হ'য়ে উঠলে ছাত্র বর্ষপূর্তি আয়োজন করা হয়, এবং একটি উদ্যোক্তাযোগ্য শোভাযাত্রা করা হয়।

(৬) মাতৃভাষা প্রেমীর পরীক্ষার সময় অবাঙালি বিরোধী-মনোভাব দেখা দিলে যুক্তফ্রন্টের বিধায়ক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ও ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপক সংগঠনসমূহের বিভিন্ন হস্তক্ষেপে তার অবসান ঘটে, এবং পরীক্ষাসমূহ পুনরায় শান্ত হওয়ার পর সাধারণভাবে বিরোধের আশঙ্কা দেখা দিলেও ছাত্র-সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেখানে হাজির হ'য়ে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনেন।

(৭) ডিসেম্বরের দুটি সপ্তাহের মধ্যেই বহু সভা শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়, এবং চৌরঙ্গীতে ইউ, এস, আই এস-এর সামনে জনসভার প্রকাশ্য বিচার ছাত্রদের মধ্যে অনেকটা গড়া যেতে।

(৮) যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কলকাতার চলাচল ভাড়া ছাত্ররা তার বিরুদ্ধে ১৪—১৫ দফার প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করেন, এবং তার পরেই থাকে।

এই ছোট সালতামামি থেকে তিনটি বিশেষ দিক্ স্পষ্ট করা যায়:

(ক) ছাত্র সংগঠনগুলি অন্তঃ রাজনৈতিক ও সমাজবিরোধী পরিচয় নিয়েছে। বিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামগুলো তারা পিছিয়ে ছিল না, এবং "বিদ্রোহ-ভাঙ্গি" আগে কখনো সুযোগ বা, তবে আসেনি।

(খ) সাধারণ নির্বাচন ছাত্রসমাজের মধ্যে একটা সাড়া জেগেছে দেখেছিল। সাম্রাজ্যবাদের কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য ছাত্রসমাজের একটা অংশের মধ্যে অন্তত

ছাত্রা আগেই কাজ করেছে. কিন্তু বাজারী দলগুলি আসেনা. প্রেসিডেন্সি কলেজ আন্দোলনের অগ্রগামীদের ভূমিকা ইত্যাদি নয় মিলে ছাত্র আন্দোলনের যে দল-গঠিত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল তা পুরোপুরি কার্যকর হয় নি. কিন্তু রিপাবলোর পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ছাত্রসমাজকে কিছুটা রাজনীতি-সচেতন ক'রে তুলতে সাহায্য করেছিল. রামপন্থী ঐক্য, অসহযোগ্যতি বিষয়. কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার, কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ইত্যাদি কথাগুলির সঙ্গে তারা পরিচিত হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাগ্য-কর্তাও তাদের মধ্যে প্রভাবিত করেছিল বিশেষত মন্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ, অবাধ মত-প্রকাশ, রাস্তায় সভা পথে নেমে আসা ইত্যাদি তাদের অনেকটা কৌতূহলীও জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরের আগে কোনো উত্তাল ছাত্র আন্দোলন হয় নি. কিন্তু বামুন এবং যুক্তফ্রন্ট সমর্থনী ছাত্রা সক্রিয় হচ্ছিল। এ-তের সঙ্গে বিপ্লবীর এবং বামপন্থীরা ছিলেন শুরু। কিন্তু তাদেরও এই স্বাধিত দায়িত্ববোধ ও ব্যাপকতর সমাজ ছাত্রকে টেনে আনার মানসিকতা অনুপস্থিত নয়।

(গ) ছাত্র কেন্দ্রসমূহের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই একটা ভাসা অনেক ছাত্র সমস্যাভিত্তিক আন্দোলন। বৃদ্ধি পৌষ, সেবিদা মুখ. মাও-সে-তুং-এর লাল বই. চীনের 'সংস্কৃতি বিপ্লব' ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে স্বভাবিক আগ্রহ এবং তথাকথিত উপরোক্তের উপর একটি তথ্যপূর্ণ ঘটনা। এদের অনেকেই অতী পরিচয়ে বিপ্লবিয়ান, আবার অনেকেই আশা-তদের শিকার। অসহযোগ ও অন্যান্যদের যেসব বা প্রায়শিক বিভিন্নে এদের কোনো সংযোগ গড়ে ওঠেনি, বিভিন্ন শিক্ষায়তনের আঞ্চলিক ইউনিটগুলিই একক্ষেত্রে বা বিশিষ্টভাবে তাদের কার্যকর করেন।

ছাত্র সমাজের অবস্থা

যাদের জন্য এবং যাদের নিয়ে এই আন্দোলন, সেই ব্যাপক ছাত্রসমাজের অবস্থাটা কী?

স্বাধীনতালাভের পর অনেক ছুতোর-ঘুরিয়া ছাত্রদের হাতে এসে পড়ে. যা. বি পি এস বা আই. এ. এস পরীক্ষার পাশ করে উঁচু মাইনের চাকুরীর পথ অনেকেই পেয়ে বসে, অন্যান্যরাও স্বাধী সরকারী কোম্পানিতে বা ব্যাঙ্কের মাঝারীর সারে কাজ পাচ্ছিল হ'য়ে ওঠেন। আন্তর্জাতের প্রতিটি ইত্যাদি ডিগ্রিগুলি যেন ছুটির ঘ'ন্টা হয়েই, এমনকি নিম্নতম ডিগ্রির মানের অবনমনের ঘটনে থাকে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ব্যাপারটা তাদের কাছে বেড়ে যায়। সমাজের বুর্জোয়াকরণের (bourgeoisification) এই ধারায় মধ্যবিত্ত চরিত্রের, পশ্চিম ইউরোপের অবক্ষয়ী সাহিত্য, কেন্দ্রে সাহিত্যের তার অন্তর অনুকরণ, বোধাই চলচ্চিত্র ইত্যাদি অবাধ সম্প্রসার হয়।

কিন্তু মোহভঙ্গও ঘটে। কলা বিভাগের চেয়ে বিজ্ঞান বিভাগের অবস্থা বাড়লেও, বেকারিত্ব ইঞ্জিনিয়ারিং. পাশ করা ছাত্রও যখন কাজ পায় না, পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়ে চাকরি করিয়ে দেখতে পে—তখন স্বভাবতই বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে মাঝারি ছাত্রদের জন্য মাতৃভাষাদের অনেকে অনার্সের দরজা বন্ধ. তৃতীয় বিভাগের কথা নাই ছেড়েই দিলাম। অনার্স পাওয়া ছাত্রদেরও সবসে মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও ঠাঁই পায় না। অগত্যা যাঁরা আইন পড়তে যান সেখানে অবাধ দুর্নীতির জন্য—পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি হওয়া দুষ্কর। বুর্জোয়া শ্রেণী এদের সামনে আন্দোলনের কিছু হিসাবে হাজির করতে চায় গণিত অসন্তুষ্টি।

জোতিষ্কন ছাত্রদের জন্য এখনও উন্মুক্ত রয়েছে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের দরজায়, যাঁরা সেখানে পড়ার খরচা চালাতে পারলেন না তাঁদের জন্য ছুটিয়ে আছে হার্ভার্ড থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। যাঁরা ছাত্র হিসাবে খুব ভালো নন, তাঁরাও ইউ. এস. আই. এস-এ একটু দৌড়াদৌড়ি ক'রে একটা বৃত্তি জোগাড় ক'রে নিতে পারেন। ভারত সরকারের ছাত্রবিনিময় প্রকল্প রয়েছে, জোগাড় ছাত্রা তার ব্যবস্থাও করে নিতে পারেন।

আর যাঁরা এর কিছুই পারেন না, তাঁরা লাইব্রেরি চাইলাইটিস দেখেন, প্রফেসরের কাছে সময় বছরের পর বছর রিসার্চ করান, অথবা ব্যাকলগ পড়াশুনা ছেড়ে সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা পড়েন।

যেহেতু পূর্বজন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালয়ে আমরা বঞ্চিত তাই বুঝতে পারি না স্বাধীনতার আগে অবস্থাটা কী

ছিল—এর সুযোগ সুবিধা তখন নিশ্চয়ই ছিল না, তবু নিশ্চিন্ত আশ্রিতের মতন ছিল, আশ্রিতের হুজোর বা সরকারী চাকরি করার বাসনা ছিল। এখনকার পরীক্ষার্থীরা যারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে সাধারণ ছাত্রের বা পরিবারের অংশ নিয়েছেন তাদের অভিমত শুনলে তা জানার আর কোনো উপায় নেই। ছাত্র সংখ্যাও তখন অনেক কম, তবু সুযোগ যেমন জানবার আগ্রহের পরিমাণ কী ছিল? একটি অভিমত এসেছিলো: জানবার আগ্রহ রাজনৈতিক কর্মিদেরই বেশ ছাত্র-আন্দোলনে। মোট কোনো। ইতিমধ্যে জানবার আগ্রহ যেমন পরিমাণ জ্ঞানার্জনের নিষ্ক্রিয়তার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে যে অঙ্কে অবশ্য নেমে। শ্রেণীভিত্তিক জ্ঞানার্জনের অধিক সমৃদ্ধির ফলে প্রাগ্‌চৈতন্যিক্‌যেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়, 'আমি তত বুঝি না যত বুঝি' এই জাতীয় উক্তি অথবা প্রশ্নেরও পায়। ফলত এক ধরনের রাজনীতি-বঞ্চিত কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব আমাদের ছাত্র-আন্দোলনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। জ্ঞানবার্তাদের মধ্যেও যদি এই যুক্তিহীনতার ধারা চলতে থাকে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আশঙ্কা হবে। এর দিকে লক্ষ্য রেখেই ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য, ব্যর্থতা ও দুর্বলতার কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে।

দুর্বলতা ও ব্যর্থতা

জ্ঞানবার্তা অবশ্য অবীকার যে এরা কিছু একটা রাজনৈতিক মানসিকতাসম্পন্ন তা নয়। তবু তাঁরা প্রায়ই অভিযোগ করেন: আমাদের অনেকের ছেলেমেয়েরা তীব্র অ-রাজনৈতিক, অ-পলিটিক্যাল। যদি তাদের প্রশ্নে, দুই প্রজন্মের এই পার্থক্যগুলির অনেকে একই অভিযোগ করবেন। কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এতদিনকার সম্পর্কহীন এমন দুই পক্ষ সমস্যার মুখোমুখি হয়ে কথাটা সত্য হতে পারে। কিন্তু আন্দোলন ছোট বা আশানুরূপে এগুল হয়ে কেন? অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির অনেক বা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ধরনের হাল হচ্ছে কেন? ১৯৬৯ সালের আগে যেখানে দুরন্ত আন্তর্জাতিক প্রশ্নের সূচী অনেক উপাদান-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেছে, সেখানে এখন এমন অভাব নিষ্ক্রিয়তা কেন? ভৌগোলিক বন্ধুত্বের সঙ্গে এস. সি. সিন্ড উপাধারী ছাত্রের যুক্তি হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ছেলেদের অনেক ছুটি থেকে যায়, বিশ্বীকরণের বিষয়ে "আন্দোলনে" পরে পাঁয়ে ছেলে নিজে নিজিল করে। ১৯৬৯ সালের কথা বলছি। কোনো স্থায়ী ছাত্রবার্তাধারী বা জাতীয় প্রশ্নে সেই পরিমাণ অগ্রাধান হয় না কেন? বিশ্লেষণের দিকে আমরা যথেষ্ট ক'রে থাকি না কেন, সেদিকে এ-আন্দোলন জ্ঞানবার্তাদের অনেকে গভীর আন্দোলন। বাস্তবিক ছাত্রসমাজের অনেক এখনও পর্যন্ত প্রশ্ন হয়ে আছে: কারখানার কাজ অনেক তো কৃষাণের তার জন্য হাহাকার ক'রে কী হবে?

ছাত্রদের ও প্রায়ের অনেকগুলিতে তো কটাই, যার কলকাতা শহরের অনেক এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এখনও পর্যন্ত অ-রাজনীতিবাদের আধিপত্য। ছাত্র সংসদ যদি বছর ছুটে সংস্কৃতিচর্চা বা অনেকগুলোর নামে ভাড়াটিয়া শিল্পীদের দিয়ে বার্ষিক উৎসব এবং সাধারণ-তহবিল ইত্যাদি ব্যয়বহুল বিষয় ইত্যাদিতে চালাতে পারে (এগুলি নিষ্প্রয়োজন—একথা বলছি না) তবে তার বছর-বছর ঘিরে কেউ রুখতে পারবে না। যে ছাত্রিসমাজ আজকে যি শিল্পকলে সবচেয়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের ভোট আন্দোলনের ও ফেরিয়ার-পড়ার বাসনা দেখে আসছে।

অবশ্যিকভাবে নিজেদের যারা পাকা বিপ্লবী ও প্রগতিশীল বলে মনে করেন, আর—পাঁচটা ক্ষুদ্র ব্যাপারে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত, তাঁরাও কিন্তু ধারাবাহিক নাম দেখাতে অনিচ্ছুক। যুক্তফ্রন্টের আমলে যারা বিপুল উৎসাহে যারও ক্ষুদ্র একটি বা দশ একটির সভা হয়েছিলেন, তাঁরা আজ আমাদের সব কিছু থেকে দূরে সরে থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করছেন।

অন্য অবস্থাগুলিসহ আমাদের এই একটা খারাপ দিক নয়। পরিস্থিতি পরিপূরক টিকই, কিন্তু আমাদের সংগ্রামের দুর্বলতাই কি এর জন্য অনেকখানি পরিমাণে দায়ী নয়?

একটি খাপছাড়া প্রস্তাব

কী তাহলে করণীয়? ১৯৭১ সালে রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র-এর পর বিশ্লেষণের (Liquidationism) বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় লেনিন বলেছিলেন।

During the revolution we learned to "Speak French", i.e. to introduce into the movement the greatest number of rousing slogans, to raise the energy of the direct struggle of the masses and extend its scope. Now, in this time of stagnation, reaction and disintegration we must learn to "speak German", i.e. to work slowly (there is nothing else for it, until things revive), systematically, steadily advancing step by step, winning inch by inch."*

আমাদের বাংলাদেশে এর ভাবার্থ যেখানেই প্রযোজ্য সেখানে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার। এখন কথাটা বলার সময় এসেছে। কিন্তু একেবারে নিরাশাবাদী হলে চলবে না, ধীরে আসবে। জার্মান ভাষার ব্যবহার তখন পরবর্তী আমাদের সবই প্রস্তুত করে রেখে। সাংগঠনিক দিক থেকে জার্মান ভাষার ব্যাপারটা আমরা ধরি এখন না-ও ধরি তবে ভবিষ্যৎ আমাদের সবসময় কথাটা মনে রাখতে হবে—আমাদের উচিত হবে এই কথাগুলো যেন ভুলে না-যাই।

—)o(—

* (V. I. Lenin, "Collected Works", Vol. 15. p. 458-59).

বন্ধনহীন গ্রন্থি সন্ধান, বাংলা গল্প

শ্রীসেল রায়
(দ্বিতীয় বর্ষ—বাংলা)

ছোটগল্প প্রসঙ্গে বিশ্ব সমালোচক অনায়াসে বলতে পারেন : another kind of prose fiction, and has now its recognised and important place in literature'.[১] কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক ও বিষয়ের ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস ও তার সম্প্রতিকার রেখাপাতটি কিন্তু এত সহজে নির্দিষ্ট হবার নয়। নির্দিষ্ট হবার নয় এই জন্য যে, কোনো বিশ্ব সমালোচকের মত আমরা অনায়াসে বলতে পারি না 'এক বর্ষীয়সীরই বাংলা ছোট গল্পের চক্ষু এবং শেষ এবং অন্তর্দৃষ্টির এই উৎকর্ষতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি।[২] অধিক পাঠকমাত্রেই জানেন বর্তমানের হতে বাংলা ছোটগল্প পরিমাণে হলেও তা বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে কতটা গোত্রান্তর ঘটিয়ে প্রকরণগত বর্ণালিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তর বিভিন্ন গল্প লেখকের অক্ষর ও আত্মাবলম্বনের মধ্যেই নিহিত। প্রশ্ন ওঠে এই অক্ষর ও আত্মাবলম্বনে কি উপন্যাসের অধিকে প্রকাশ পায়নি। পায়নি, পাওয়া-যাবার নয়। জীবন একটি নির্দিষ্ট পরিধির পরিমাপ—এই মাত্রার শেষ প্রান্তে এসে তার যে অভিব্যক্তি তাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। কিন্তু ছোটগল্প তো জীবনের সামগ্রিক রেখাঙ্কন নয়, তার জীবনের ঘটা-বেলা, 'সুখ-দুঃখ, নিত্য-দিনের, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি এর বিষয়বস্তু এক একটি উপন্যাস ইটনিট। 'সমগ্র জীবনের বিচিত্র উপরে উপন্যাস গড়িয়া ওঠে, ছোটগল্প ইঙ্গিতধর্মী। উপন্যাসে পূর্ণের সন্ধানে যায়, আর ছোটগল্প যায় খানিকটা।[৩] জীবন যেহেতু একটি বিশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা—তাই তার নিহিত সত্যে অন্বেষণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের জীবনে 'ঘাত বেদনা, ঘাত ঘটনা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার আলোআধারের ঘাত-প্রতিঘাত। ইহার সমস্ত ইতিহাস, একের সঙ্গে অন্যের, সাধনার সঙ্গে সাধনার, কামনার সঙ্গে কামনার সংঘাতের ও ঘাতের। কবি যেমন কল্পলোকের দ্বারা, মানুষ তেমনি স্বপ্নের দ্বারা।' সেইহেতু চলমান জীবনের পটভূমিকায় যেমন বিস্তৃতির বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী তেমনি আঙ্গিকেও। ফলত বাংলা ছোটগল্পের রূপরীতি অনিবার্যভাবেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এই আমূল পরিবর্তনের মধ্যেও আমরা ছোটগল্পের কাছে যেগুলি প্রত্যাশা করে এসেছি—সেগুলিও। বিষয়বস্তু ও প্রকাশ কলার চমৎকারে যেমনই বাংলা ছোটগল্প তার ঘনত্বকে পরিত্যাগ করতে পারেনি, তাই আমাদের ক্ষুধা আজও আমাদের অন্তর্মুখ বলে মনে হয় না।

বর্তমান বাংলা গল্পের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন অবিভিন্ন গল্প লেখককে তিনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। বাংলা গল্পকারদের সকলেই বিশেষ প্রদেশ হয়েছেন। যেমন, ১. গল্পকার + সাংবাদিক ২. গল্পকার + কবি ও গল্পকার + চিত্রশিল্পী ৩. গল্পকার + রাজনৈতিক প্রবক্তা ইত্যাদি।

এই বিভাগ তো নিশ্চয়ই নয় বরং এই বর্তমানের বিশ্লেষণের পূর্ব প্রকাশের আগে কোনো কোনো লেখক গল্পকার অভিনন্দন জানাতে পারেন। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল। জীবনের ক্যানভাস যখন দিন দিন বিস্তৃত হয়ে পড়ছে তখন তাতে বৈচিত্র্যের প্রতিফলন তো অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আর 'জীবন যেখানে অর্থহীন ঘটনায় মুখরহীন, ইতিহাসের মধ্যে বেঁচে থাকার আন্তরিক প্রয়োজন যেখানে জীবন নিয়ে গল্প লিখতে হলে গল্প যে পরিণতিতে গভীর হবে তা এক রকম সুনিশ্চিত তার জন্য প্রয়োজন নতুন ভাষা ও আঙ্গিক। ছোট বড় ও মাঝারি লেখকের হাতে মাধ্যমের হয়ে হয়ে এল পাঠকের

১. Hudson ২. জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩. প্রমথ নাথ বিশী ৪. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মনে অবাক হয়ে ভাবে এ যাবৎ কাল প্রচলিত যত রকম গল্পরীতি আছে সেগুলির কোনটিতেই তার একটু অক্ষরও ব্যবহার করেননি।[১] এই প্রসঙ্গে শুধু একথা বলা যায় যে, বাংলা গল্প লেখকের মধ্যে প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব ধারা অর্জন করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'নবা' গল্পটিকে সাংবাদিক জীবনের পটভূমিকায় রচনা করলেও সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশের জন্য লিখে নবা প্রতিষ্ঠিত একটি জনপ্রিয় ধারা ছুঁড়ে ফেলেছেন। 'ঘুমাবি' গল্পের কাহিনী যেমন মূল্যবান না হলেও গুরু শিক্ষকের আত্মিক সম্পর্কের সামান্য আবহ তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনবত্বের গল্প 'অসিতলার বিবরণ'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছিলেন তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো ১. সাংবাদিকতা ২. নাগরিকতা ৩. যান্ত্রিকতা ৪. তারুণ্য। শুধু কবিতার ক্ষেত্রে নয় গল্পের ক্ষেত্রে তিনি একই বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক। সে দিক থেকে তাঁর 'অসিতলার বিবরণ' প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পারে। 'তুই কেমনতা আমাকে সকাল-বেলায় যে ঘরে প্রেম করতে দেছে? বিশ্বাস পারি না। লিটারেচারের পারি না।' কিংবা 'অনেকদিন পরে আমি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যাব দেখুম।' এ ধরনের ভাষারীতি ব্যবহারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সৌকর্য বেড়ে যায়—এ দিক দিয়ে গল্পকারের ক্ষমতা তিনি অনন্য। তাঁর গল্পের বক্তিবেশ মুখ্য—পাঠকদের কেবলমাত্র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়ে যেতে হয়। 'হরিশিকার' ও 'অপরিচিত' ঘটিতাকর্ষণের ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি কিন্তু মনোচিত মানসিক সংঘাতের পটভূমিতে 'নবা' গল্প অবশ্যই মূল্য রাখে। মোটামুটি বলা যায়, গল্পকার হিসাবে যে ভঙ্গিতে আমরা আমরা আত্মবিশ্বাসের তা সম্পূর্ণ ধার্য হয়নি। ছোটগল্প পরিবেশ রচনা একটি মূল্যবান অঙ্গ—সে অঙ্গ উপাদানে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধহস্ত। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক বিষয়বস্তু থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'হা-অন্নের ছবি' গল্পটিতে যেমন নিপুণভাবে পরিবেশ রেখাটি যেন চিরকালীন বিষয়ের কাহিনী বলেছেন। ছুরা ও অন্যান্য গল্প দু'খানি বিষয়বস্তুর জন্য এবং অনবদ্য ডিটেলিং-এর খাতিরে অবশ্য হয়ে থাকবে। 'দুটির আগে কোনো সমালোচকের মতে 'গল্প লেখার অপরাধ'।[২] অবশ্য দুটির আগে গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রাচীন ছেঁড়া কম্বলকে নূতন ঢঙে আধুনিক গল্প সম্ভারে মুড়ে করে তোলার সহজ সম্ভাবনাই লক্ষণীয়। তবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব মেজাজ থেকে এ গল্প রচিত হয়নি, সেখানেই এর আসল সার্থকতা। নিটোল গল্পের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নীরেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছে। জটিলতর মানসিক বা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি নিজে কখনোই জটিল হয়ে পড়েন না। তাঁর গল্পের মুখ্যবিন্দুর আকর্ষণ তাঁর গল্প রচিত সেই বেদনাবহ হয়ে ওঠে মূলের এবপাশে কুঁড়ি থেকে ফুলের মত কমনোহর হয়ে ফুটিয়ে পড়ে। নীরেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকবুদ্ধি ও 'বিষয় থেকে' ইত্যাদি ছোটগল্প বৈচিত্র প্রকাশের একটি সুন্দর রেখা চিহ্ন হয়ে থাকে। 'অন্ধকার রাত' গল্পখানি নীরেন্দুর যা হাতের লেখা বলে মনে হয়। ছোট একটি টেলিগ্রামে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে-ফেলার মূল তিনি পার হয়ে এসেছেন। অন্ধকার রোগ ও অন্ধের গল্প আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। গল্প পরিবেশ রচনা সৃষ্টিতে শংকর চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় উপায়ের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'সন্ধির সময় যা' 'আততায়ী' 'ছাত' প্রভৃতি গল্প বিভিন্ন গল্প-পরিপাটীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শংকর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে অন্তত একটি জিনিস লক্ষ্য করার ছিল, তাহলো মনোরঞ্জিত বিরোধী মনের সমন্বয়। অন্তত তাঁর দুই গল্পে এই ধারণা জিয়াশীল থাকতে দেখা গিয়েছে। সেই যে ছোটো ছেলে গল্পে ছোট আইটি ছেলেটাকে মোগল ঘুম ও চা করে দিয়ে আসতো প্রথম পাড়ি দেবার আগের রাতে বাদুড় ঝুলে ঘুমোনো (গল্প। নাম মনে নেই) যেমনি লক্ষ্য মেলে আগে 'নিশ্চিন্তে অন্ধকার' গল্প পড়ের ঘোষণা। তাই, শুধু কয় তার হাতে যেমনাইয়ের

১. বিনয়েন্দু পালিত ২. কৃষ্ণা মিত্র।

কাটা ঘরে উঁকিটা পর্যন্ত মেরে যুক্তে দেখল। ... একবার মনে হয়েছে চীৎকার করে উঠবে ইচ্ছে হল পরক্ষণ, কিন্তু বুঝলো আজে কোনো ফল হবে না, যখানে কেউ কিছু বলবে না, বলা হাসবে থাকবে।' অবশ্য এই বিদেশী দুটি ভিন্ন পরিবেশে পরিবর্তিত এবং তাদের দু'জনের সঙ্গে ও সংযোগের আলাদা ভিন্ন ভিন্ন মনের সীমারেখা ধরে এই পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি মুসলমী মেয়ে মনের মেয়ে একাকারে এসে মিশে যায়। এই ধরণ ও ভাবনার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে কবিতা লিখের গল্পে। বিদেশী মনের সঙ্গে কাজলের যে রং মিশে 'সিরাজের নামে লেখা' হয়ে ওঠে, তারই জন্য পরিণতি বয়স-বয়সী দুই-অধ্যাপিকার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে সমীকরণে 'বাস' শব্দটির ব্যবহার চূড়ান্তের সমান। কবিতা লিখে গল্প শুরু হিসাবে উঁকিটা না হলেও তাঁর মনে যে ভাবনা তা হলো Frankly and sincerely as a woman knows and feels it?[৭] বাংলা গল্প জগতে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোজনার জন্যই কবিতা লিখ আলোচ্য হয়ে থাকবে। আইরিশ রাষ্ট্র লিখে কবিতার কেন জানি না বিশ্বাসেই এ বাক্যের ও সাবলীলতা অর্জন করতে পারেন না। 'বিদ্রোহ-ভরা ইতিহাস আর মানুষের ভয়ঃ কাহিনী, এই দুইয়ে মিলে মানুষের সংসার।'[৮] সেই সংসারের কোনে কোনে যে অন্ধের উপাদান জমে ওঠে তার পরিমাণ কম নয়। প্রীতি যার পীড় আনে কিন্তু 'পীড় প্রীতির সৃষ্টি করলো যার হ'তে যায় না। বিদ্যুৎ পাণ্ডিতের 'পীড়-প্রীতির সৃষ্টি' গল্প জুড়ে তাঁর শিল্পীসত্তা ও ব্যক্তির ভিন্নিক হ'য়ে বিরোধিল কিন্তু আপাতিকভাবে তাঁর 'দুটো গল্প বিকল'-এ সুনীল অন্যোপাধ্যায়ের মনুষ্যত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক প্রকট হয়ে উঠেছে দেখা, আমরা ধরে নেব বিদ্যুৎ পাণ্ডির জন্যেই দৃষ্টিতে আসছে। তাঁর রচনার জৌলুষ আছে, তা যদি অবশ্যকারে নষ্ট হ'য়ে যায় তা হলে পাঠকের সামনে হতাশা নেমে আসবেই। প্রবাসবন্ধু অধিকারী, অনেক জীবন জটিলতায় এঁরাও যেমন করে প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারছেন না। অথচ মানুষের দেহ কিংবা অন্তির মেয়েদের অঙ্গ প্রতিপ্রতির বাহার দেখা যাচ্ছে। মানুষের দেহের অঙ্গ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার আলো। প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে তাঁর 'পোড়োবাড়ী ও ঝড়ো' বাক্যের সন্ধান দেবে। স্বাভাবিক জীবের মধ্যে অস্বাভাবিক এক মানবীকে আবিষ্কার ও সেই প্রেমময় উপলব্ধি শিল্পের সৃষ্টি ও জগৎ আমাদের কাছে নিরাভরণ কপাল চোমানো ন' কৌটা চাঁদ্‌কা রক্ত'-এর মতই বেদনার ঘন-চিহ্ন হ'য়ে থাকে। অন্তির মেয়ের 'মানবী' আর দুর্ভিক্ষের এবং ভবিষ্যৎ গল্প দুটি বৈশিষ্ট্য অন্তির। দুর্ভিক্ষকে অন্তির এক অন্যরকম গল্পের সন্ধান পেয়েছেন — বেলফাস্টের রাত পার হ'য়ে যাওয়ার প্রতীক ও তার গল্পের ব্যবহার কোথাও জীবনধারা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েনি। দুর্ভিক্ষকে সাধারণীর মানবিক অবক্ষয়ী মূল্যায়নে দেখানো হ'য়েছে। পুনঃ পুনঃ একই পংক্তির জপমালী ব্যবহার (সহজতঃ, তাদের আর ঘরে রাখা গেল না) গল্পটিকে কবিতায় সমৃদ্ধ করেছে। দিব্য চৌধুরীর লিখের ইমানীং গল্প পাঠকের আকর্ষণ কম নয়। 'খোড়া পুতুল' যিনি যে ভঙ্গির পরীক্ষা নেবে ছিলেন তাকে পাঠকের সমর্থন পাওয়ার সময়ের যেমন প্রত্যাশাও তাঁর ছিলো না তারই ফলে কিছু আসে যায় না তাঁর ব্যাখ্যাধর্মী ভাষা ও বিচিত্র চিত্রাবলী যিনি পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য রাখতে পারলে পাঠকে অর্জন করতে পারবেনই। 'দুঃখসঙ্গম' কিংবা 'হজমজনের পালা' তাই প্রতিশ্রুতি রয়েছে। চির যোবন ও বিরির মেয়ে যেমন কোনো ভালো গল্প আমাদের হাতে পৌঁছে দিতে পারলেন না। চির যোবনের বহির্বাসন ও অন্তীর উত্তর পুরুষ বাকী বকী লেখা চলছে আশ্চর্যজনক অক্ষয়ী নয়। সেই চিরাচরিত ফুল উপহারের ধীরন—বহির্বাসন মুখরক্ষার মতিমানে ভেবেছে: 'সবার সব কিছু হয়, যৌবন যায়নি মোর-এ লিখেছ, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, হাঁটুরের হুঁচোনো ভুরু, বক বাজনি মুখার অতি অনেক রকমের আশা, এমন কি রমনীয় যায় পান খোকা পর্যন্ত। তবু অভাব কি তাঁর লেখার।' খোকা যায় 'বহাবয়ব' চলচ্চিত্রটিই এ গল্পের মূল প্রেরণা—তার জন্যে এতো

৭. জন এমিংস্ট ৮. রবীন্দ্র নাথ মৈত্রর

লেখার প্রয়োজনই ছিল না। ঘটনার পরে মনিবারকের লিখেছা হল থেকে ফিরে আসার পরও বারে বারে সংশোধন করে, সিরিয়াস্ গল্প পড়ছি না কৌতুক রচনা পড়ছি। মিহির সেন তাঁর 'পরাজুত নৈমিক' গল্পে আদর্শবাদী লেখকের মানসিক পরিবর্তন ও সংকটের বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র রচনা করেছেন। বিষয়বস্তু পরিবেশ স্টাইল কোন দিক দিয়েই গল্পকার নৈর্ব্যক্তিকের পরিচয় রাখতে পারেন নি। একটা ছোট গল্পের জন্য অনুপ সেখা পরের পর 'আপেক্ষিক' শব্দের এবাধিক ব্যবহার বিরক্তিকর মনে হয়। মিহির সেন গল্পটির যদি দিয়ে কলেজ পার্কের জন্য যোগেন্দ্রা গল্প লিখলে প্রশংসা অর্জন করতে পারতেন অথচ অমিয়ের যোগেন-অন্তর দুন্দ্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমার বার বার এ কথা মনে হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের কয়েকজন গল্প লেখক বক্তব্যহীন গল্প লেখার চেষ্টা করছেন। কমলাক্ষ বাবু তাঁর 'সেনদিন' রচনায় তাঁদের প্রবর্তিত আন্দোলনকে ঘরটা আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন তার চেয়ে বেশী সফল হয়েছেন কোতো-কাহিনীতে, সেখা বন্ধুর 'সফরল'-এ বক্তব্যহীনতার অন্তরে বক্তব্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অ্যাবসার্ড গল্পের প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন এ গল্পে এমনি গভীর যে যেকোনভাবে কৌশলীরা দুরুহতাকে ঢাকতে পারেন, আসলের চেয়ে নকলের সম্ভাবনাই বেশী। এই সম্ভাবনার যাদুমন্ত্র দেখতে পেলাম মাণিক বাবুর 'বেদনার্ত যোবন'। অ্যাবসার্ড রীতিকে সেখা গল্পের জন্য কৌশিক সান্যালের পোশাকধারা অনেকাংশে দায়ী। কৌশিক সান্যালের পোশাকধারার কী প্রভাব দেখা যায় দেখবার আগেকার লেখা 'মাটি আর মিছি' গল্পে। দুটি গল্পের দুরকমই পোশাকধারা দিয়ে। কেবলমাত্র ভাষার কৌশিক সান্যালকে অনুসরণ করেছেন কি না আমি না জানার জন্য তাঁর মনে যে প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না (দ্র: অনুক্রম ১৩৭৩)। বাংলা গল্প রচনায় রাজনৈতিক উপাদানের বেশ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মার্কস্ বলেছিলেন অনুপ্রাণিতদের সব চেয়ে বড় কথা হলো গোঁড়ামুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী। সেদিক থেকে বাংলার মার্কসবাদী গল্প সফল হয়ে উঠলো না। উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য দিয়ে ঘটনা প্রবাহ রাজনৈতিক উপাদান রচনার প্রয়াস চললেও Dogma-বিমুক্ত কোন সার্থক গল্প আজ পর্যন্ত লেখা হলো না। সৌমী ঘটক, নন্দা ঘোষ, মিহির আচার্য, অমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা রাজনৈতিক প্রচারণার যে পটভূমিকা রচনা করেছেন সে গুলো সার্থক হয়ে উঠেছে কি না তা নির্ভর করছে শক্তিশালী বক্তব্যসত্ত্বের লেখন-শৈলীর উপর।

আমরা মোটামুটিভাবে এই নিবন্ধে আসতে পারি যে, বাংলা গল্প মোটেই বর্ণালীসুলভ বিভিন্নমুখী হয়ে নেই। তা ভাবনাধর্মী-চিন্তাধর্মী গল্প, মনস্তাত্ত্বিক গল্প, অ্যাবসার্ড গল্প, রাজনৈতিক গল্প এমন কি বক্তব্যহীন গল্পের ধারা নিয়ে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত পথ ধরেই বহুমুখীন প্রতিভা দিকে ছুটে চলেছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা গল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা দিয়ে, অভিজ্ঞতা, অনুভবের ও অনুভূতি-বেদনার ধারা দিয়ে এক নতুন উৎসবের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে—কেননা, 'গল্প রচনাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সব চেয়ে বেদনা; যাকে শোনাতে পারা যায় না তাকেই শোনাতে হয়।'[১]

—:০:—

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

সৌমেন্দু ঘোষ
(গাইডপোস্ট, প্রথম বর্ষ বাংলা)

আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দটি গল্প যাদবচন্দ্র, বিসর্জন, শাস্তি (নির্বাক), দৃষ্টিদান, কাবুলিওয়ালা, মেঘমুক্ত প্রতিশোধ, ক্ষুধিত-পাষাণ, মণিহারা, পোস্ট-মাস্টার, সমাপ্তি, নিশীথে, নষ্টনীড়, শুভা, এবং অতিথি, দুটি উপন্যাস—নৌকাডুবি (সবাক ও নির্বাক), গোরা, চোখের বালি, বলেক, বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও যোগাযোগ, পাঁচটি নাটক, প্রায়শ্চিত্ত ও মৃক্তধারা—বিসর্জন (নির্বাক), শোধবোধ, চিরকুমার সভা (দুবারই সবাক), শেষরক্ষা ও মালীর পূজা এবং পাঁচটি কবিতা ও কবিতা—অভিসার, দুরাকাঙ্ক্ষী, দুই বিঘা জমি, দুরন্ত আশা ও বেতারে প্রাপ্ত, সর্বসমেত তিরিশটি রবীন্দ্রকথা বাংলা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

বাংলা ছবির প্রথম পরিপূর্ণ কাহিনী চিত্র ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মোটামুটি এই পঁচিশ বছরে যে কবিতাগুলি উঠেছে, সেগুলি যথাক্রমে যাদবচন্দ্র ('২৩), বিসর্জন ('২৬), শিশিরবালা ('৩০) শাস্তি ('৩০), নৌকাডুবি ('৩১), মালীর পূজা ('৩১), চিরকুমার সভা ('৩২), গোরা ('৩৮), চোখের বালি ('৩৯)। পরিচালনা করার জন্যও তিন তিনবার বিভিন্নজনের পায়। অবশেষে দিয়ু, শিশির কুমার ভাদুড়ী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মধু বসু, নরেশ মাস্টার প্রমুখ বাঘিরা পরিচালনা করেছিলেন। আজকের চলচ্চিত্রে ব্যাপারটা যতটা তথা মনে 'স্টেট' করটা 'রিলাইট' করে তখনকার দিনে তার কিছুমাত্রও ছিল না। অবশ্য অনুকরণে প্রকরণগত দুর্বলতা যে ছটোরাপ এই চলচ্চিত্রগুলিতে বিদ্ধ আছে, তাতে না পাওয়া যায় পরিচালনাকে, না চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথকে।

চারজনের অভিনয়ের যার চিরোলেই বেশ ছিল। অর্থাৎ পৃথিবীর মালমশলা। সেক্ষেত্রে যাদবচন্দ্রের গোপীনাথ, বিসিবালাকে, দুর্গাদাস এবং মৌলিমা বাবি, বিসর্জনের মোহিত মোহন, শেষরক্ষার শিশির কুমার, তথাকথী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বাস্তবিকই ফুলচন্দন পরে ফুলেছিলেন মনে হয়। যাদের কেবে শিশির কুমারকে ওজন রাখে রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে 'শিশির বোসের বর্ণক বৈরী করতে পারেনি', বস্তুতপক্ষে শিশির-কুমার প্রয়োজনা করলেন তাদে হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'ওরা যত্নকর্মী না, শুধু নকলকর্মী'. তথা ঐতিহ-কালে রবীন্দ্রনাথের মন্তিষ্কের কোনো ছাপ পাওয়া যায় না বলেই কাহিনীর তথা রচিত এইসব চলচ্চিত্রগুলি সম্পর্কে।

১৯৪১ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট বৎসর। বাংলা ছবি কথা বলল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনীর চিত্ররূপের ভার চারটি ছবি থেকে পেলেন যাতে তাঁর চরিত্রেরা কথা বলল।

এরপর আমি একেবারে চলে আসব চাই অনেকটা এগিয়ে '৪২ এ শোধবোধ, '৪৩ এ নৌকাডুবি, '৪৮ এ 'দৃষ্টিদান', '৪৩ এ মালেক, ও বৌ-ঠাকুরাণীর হাট হয়েছে, কিন্তু সেগুলো বিশেষ বলার মত করে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথকে গোড়ার দিকে অবশ্য চন্দ্র বিয় এবং মধু

বহুই না বুঝেছিলেন। '৯৮ সে আমার বুকলেন বেহারী মুখার্জি নতুন করে 'চিত্রমুখার সভায়'। তাকে আমরা নতুন করে চিনলুম, পুনর্বার, নীলকে, বুঝলে দেখায়। পরিচালনা অভিনয় চিত্রগ্রহণ, শব্দযোজনা এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োগকলার মধ্যে দিয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রমুখার সভা'র সৃষ্টি হয়ে যাবে যেন। এই পথে এলেন দুই ব্যক্তি একজন তপন সিংহ, অন্যজন সত্যজিৎ রায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল বাংলা দেশের দুই প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক অভিনয় করার ও ব্যাপারে যেন কখনও রবীন্দ্র সাহিত্যকে তাদের ছবি করার উপযুক্ত বলে মনে করেননি। এটি বোধের অথবা তবের তা বোঝবার ভার দর্শকদের ওপর দিলাম।

তপন সিংহ এলেন জাদুলণ্ঠনওয়ালা, ভূতির পাগল এবং অভিযি। সত্যজিৎ রায় তাঁর সাহিত্য থেকে নিলেন পরশুরাম থেকে অভিযান, পোষ্টমাষ্টার, সমাপ্তি এবং 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে চারখানা।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে পাকাটী ফুকোয় যত ছবি তৈরি থাকবে, অন্তত কয়েক, তাদিকে ফুলবে—সেগুলি সত্যজিৎ রায়ের ছবি চারুলী এবং তপন সিংহের অভিযি। আমাদের আশেপাশে চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে এদেশের জীবন জিজ্ঞাসার বাণিজ্য, চারিত্র, উৎসাহিত চলচ্চিত্রকারেরা অনেক বেশী চরিত্র দর্শন যোগেন, চরিত্রের গভীরেরাজ্যের সাধন রাখেন। নিজের নিজের জীবন বোধের তপন প্রতিটির যে দর্শন তাই বা আমাদের অন্য ব্যক্তি থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে তোলে? সত্যজিৎ রায়ের চারুলী ছবি ও তপন সিংহের 'অভিযি'র মেয়ে যে স্বাতন্ত্র্য তিনিটী তাঁরা তাঁদের চিত্রগুলিতে কাজে লাগিয়েছেন তা তাঁদের বুদ্ধিমত্তার, বহুজনের উপাদিত প্রতিভার যোগফল। এই পাকাটী সিনেমা যেমন যে Film Sense এর প্রকাশ পাওয়া যেতে আমরা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি পেয়েছি, তার মাঝেও, এমন কি রবীন্দ্রনাথও যা ভাবেননি, তাকেও পাবেননি তাকেও পেয়েছি এর কোনো কোনো ছবিতে।

তপন সিংহ মূল কাহিনীর প্রতি আনুগত্য রেখে যা করতে পেরেছেন 'অভিযি'তে, সত্যজিৎ তার অনেকটি বিপরীত থেকে যেন আমাদের উজান টেনেছেন। সত্যজিৎ রায় নিজে একজন অমর শিল্পী, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে বলতে পারার ক্ষমতা তাই তিনি অনেই পেয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের কোথা থেকে কোন ছোট ছোট অংশগুলিকে তিনি যেভাবে সেলুলয়েডে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তার তুলনা বোধহয় তিনিই। রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রকৃতি বা চরিত্রের একেবারে কলমের যেখানে সেখানে সত্যজিৎ রায় তাকে যেভাবে ব্যাখ্যার মধ্যেকার তা যেমন প্রকৃতির ক্ষেত্রে তেমনি চরিত্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ। 'চারুলতার' উদ্ভূত মাষ্টারকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এঁকেছেন "ভদ্রলোকটি অত্যন্ত্যপর্দা, তাহাদের বর্ণ নিতান্ত অনাবৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চারুরে যেমন একরকম রহস্যজনক সংযমে বিহীন চেহারা, ইহারও সেইরূপ। ভূতির উপরে একখানি চরিত্র তৈলাক্ত আলাদী ঘটনার যোগাযোগ যোগ চাপরাশ, কর্তৃত্বের হইয়ে যেন অত্যন্ত হইল বিরিঞ্চিবাবু।" সত্যজিৎ এর কাহিনীর ভিতর দিয়েও আমরা তাকে সেইভাবেই পাই।

প্রকৃতিকে আঁকার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "বর্ষাটি ক্ষুদ্র। বর্ষা ঘরে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ডাঙ্গায় ঐক্য একেবারে গাছের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ ডুবিয়া চলিয়াছে। বহুদিন ধরে বর্ষার সঙ্গে আজ যেমনটুকু আকাশের যোগ দেখা দিয়াছে।" তখন অপুর ছবি বি. এ পাস করে কলকাতা ছেড়ে আসছে একথা বুঝতে বাকী থাকে না। সত্যজিৎ ও সেই একইভাবে অপুকে কলকাতা থেকে এই গ্রামের জন্য এনে ফেলেছেন এবং 'নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল···'। রাহিরাবার তীর দিল নিজন, ঘাস সবুজ অপুর মায়ার পড়িয়া যেন যেমন পড়া আমনি ঘোমা হইতে এক ঘুমিই উজানের তরল হাত সহরী উদ্ভাসিত হইয়া নিকটবর্তী অথচ গাছের পাখীগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।" রাহিরী যে ক্ষমতায়, সেই ক্ষমতায় প্রকৃতির মাঝে রেখে প্রকৃতিকে, চরিত্রকে এবং প্রকৃতির কোলে চরিত্রকে যেভাবে সত্যজিৎ রেখেছেন তা রেখে ছবি তোলার,

যোগাযোগ নয়। প্রকৃতি ও চরিত্র অভাবীভাবে তাঁর হাতে যেমন এসেছে তেমনটি যেন হয় 'অতিথি' নিয়ে আর কোনো রবীন্দ্রচিত্রকল্পে অসম্ভব। পোস্টমাস্টার "যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, কন্যা বিদায়ব্যথা নবীন উদ্ভূসিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিক হইতে তাহাকে বিরিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখশ্রী যেন এক বিস্তীর্ণ দূরব্যাপ্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিজের ইচ্ছা হইল 'ফিরিয়া যাই, হরকুমার কোর্টশিপের সেই অন্ধকারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে ... রবীন্দ্রনাথের জীবনের পথিকের উদাস হৃদয়ের এই ভাবের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত ক্ষতি আছে, ফিরিয়া কল কী।' সত্যজিৎ যেন সেই পোস্টমাস্টারকে, চন্দনের এক ছেড়ে যাওয়ার সময়ে যে ব্যাকুলতা, তাহা বিচ্ছিন্ন গভীর জীবনবোধ, তবে দুঃখের আর দুঃখের ভার মেয়েদের আরো বিচিত্র প্রকৃতির জেনেছেন। সত্যজিৎ প্রসঙ্গে যে 'ফিল্মসেন্স' কথা বলা হয়ে থাকে তা যেন রবীন্দ্রনাথের এই কাহিনীগুলিরও দেখা যায়। 'সমাপ্তি' রবীন্দ্রনাথের কাহিনী হলেও রবীন্দ্রনাথকে যেমন মেয়েদের ভালো লেগেছিল তা তাঁর চলচ্চিত্রে পাইনি। তাই ছোট মেয়ে পাইনি বলে, কিন্তু বলেও যা পেয়েছি তাও যেন রবীন্দ্রকাহিনীতে পাইনি। মেয়েদের দুরন্তপনা পেয়েছি, মেয়েদের দুরন্তপনার মধ্যে অপরূপ পেয়েছি। কিন্তু যে দুরন্ত "অপূর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গভীর দুঃখের মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। হাত সরল করিয়া খুব বাড়াইয়া চুলনা করিতে উদ্যত হইল—তাহাতারি দিয়া আর পারিল না। খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।" সেই দুরন্তকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, "ঘাটে স্নানের করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় হঠাৎ কয়দিনের মধ্যে একটি অপরিচিত ব্যক্তিকে তাহাকে দুরন্তপনা বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুষ্ট ফুল্ল প্রাণের বৃন্তের মতো আসিয়া পড়িল, অমিয় অজস্রসঞ্চিত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিন্দু প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর খুশিতে গলিল অনেক দিনের একটি হারাইবার অনন্ত স্রোত অন্ধ অন্ধকারে সমাপ্ত হইল।" কিন্তু সত্যজিতে সেই দুরন্তকে পাইনি। মেয়ে করি আমাদের দেখার বোঝার কথা চিন্তা করে তাকে আর দুরন্ত করার করে ধরনা বন্ধ করেই ছবি শেষ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে যা আছে তার সব মেয়ের কথা চলচ্চিত্রে আসতেই পারে না। পরিচালকের সীমাবদ্ধতা এ ব্যাপারে আমি স্বীকার করি কিন্তু 'অসমাপ্তি' যেই সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথ যা পেয়েছেন সত্যজিৎকে সেখানে শেষ করি হারতে হয়েছে বলতেই বিচ্যুত হতে হয়েছে। অমন নষ্টনীড়ের দুর্গতি, চারুলতা অমলকে এমন করে আর কে বুঝেছে? গল্প পড়ার চরিত্রগুলোকে তিনি অভিনেয়-অভিনেতা চরিত্রের মতোই যে কল্পনা করেন তা বুঝেই কত দেখা যায়। এখানে সেই একই পদ্ধতি 'অতিথি' মেয়ে বুঝেই কাজ করেছে বলে আমার বিশ্বাস। এমন করে চরিত্রের সামান্য প্রতি নজর আর ছোট ছোট পরিবর্তনের দুরন্তপনার প্রতি নজর এর সেটার প্রতিটি কথা প্রতি মেয়েদের এর আগে সত্যজিৎ ছাড়া কেউই করেন নি। ফলে কাহিনীকে বর্তমান তার পরিবেশকে ছুঁয়ে, তার চরিত্রের বুঝতে খুবি এত বেশী করে সাহায্য করেছে।

সত্যজিতে রবীন্দ্রনাথের দুপুরটি, অমল এক চাঁদ দুই। "দুপুরটি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কি বলিয়া আরম্ভ দিতে হয় দুপুরটির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে বুঝিল না, কেবলে যখন কেহ অকারণে কাঁদিয়া উঠিয়া চাহে তখন লোকী বলিয়া থাকিলে ভালো লাগে না' এই দুপুরটিকে সত্যজিৎ বুঝেছেন। যে চারু এমনি সাধারণ কথোপকথন করতে পারে অমলের সেখিয়েছেন। "বিদায়ের ঘণ্টা বাজিতে বাজিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল। হঠাৎ নবাবের কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল নবাবের বাগানবাড়ি, নবাব চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এসে করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত দুঃখ! এমন বন্ধুহীন? বিবাহিত চারুর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব। সত্যসত্যই একবার চোখের জল ফেলিয়া দিতে চাহিল কিন্তু অমলের তাহাকে সমস্ত ধৈর্য করিয়া রহিল।"

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের দুর্লভতি, চারু যেখানে এইভাবে তাহার বক্তব্য শেষ করে একেবারে দাঁড়াইছে "দুর্লভি বুঝিল, অমলার বিরহ মূর্তি যে বাহিরে থেকে করিয়া অভিমেছে, চারু বাবসলাপ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিয়াগ করিয়া পালাইতে চায়। 'কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব।' যে স্ত্রী স্বামীর মতো নিচক অন্তরে স্থান করিতেছে কিন্তু প্রকাশ দিয়াও তাহাকে বুঝিতে সমর্থ পাইব না।'.....দুর্লভি চক্ষুকে আসিয়া করিল, 'না সে আমি পারিব না।' দুর্লভের মতো সমস্ত রক্ত বাহিয়া দিয়া চারুর মুখ কাগজের মত শুভ্র সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া দাঁত চাপিয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ দুর্লভি কহিল, 'চলো চারু আমার সঙ্গেই চলো।' চারু বলিল, 'না যাক'। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শেষ কিন্তু সত্যজিৎ এই এসেই তাহাকে নেতাবে চলচ্চিত্রে যেখান তার বাজনা যেন বাহিরা থেকেও অতিরিক্ত বলে বোধ হয়েছে। সত্যজিতের দুর্লভি চলে গেলে চারু ও, কিন্তু তাহাই তাহা আলো হাতে-আঁকা কৃত্রিম শব্দের, তাহা দুজনে সিনেমার ছবির মতো থমকে গেছে Freeze shot মারফৎ। রবীন্দ্র-কাহিনীতে এই অতিরিক্ত যাতনাই সত্যজিতের চোখ খুলি মেলে দুর্লভি।

তখন দিয়ে কিন্তু কাহিনীর চরিত্রে, প্রকৃতি বর্ণনায় কাহিনীকে প্রায় ধীরে ধীরে এগিয়েছেন। শুরুতেই "ঝড়ো হাওয়া চলু এবং হাওয়ার আঘাতে একটি দুর্লভিত সৌন্দর্যের প্রকাশ পাইয়েছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি, অনাবৃত দেহখানি পর্যাপ্তরূপে বাহুলাবর্জিত, কোনো শিল্পী যেন এক মন্ত্র নিপুণ নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।" এই অবাপককে দেখতে পাই। "অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তোমাকে ভালবাসেন না?" অবাপক এই প্রশ্ন অত্যন্ত অন্তুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালবাসেন না?" এই হোই উত্তর প্রশ্নকারের মনো দিয়ে যে অন্নপূর্ণা ও অবাপককে পাওয়া যায়, অভিনেত্রী এবং অভিনেতা যেন তাকে মূর্ত করে তোলেন। প্রথমদিকে অন্তুত জ্ঞান করে যে হাসিটি অবাপক প্রথমদিকে তা যেন এখনও কানে বাজছে। অবাপকের গান শুনে অন্নপূর্ণা যখন চারুলতাকে জিজ্ঞাসা করেন কেমন লাগল "সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া চলে। এই অভিনয়ে অবাপক অবাক করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, বিদ্যুৎ জ্ঞান নাই এবং কোন কালেই ভালো লাগিবে না।' রবীন্দ্রনাথের এই চারুলতাকে যেন তাঁর মুখেতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যেতে। উদাহরণ অতিরিক্ত করে লাভ নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথের কলমে যেসব যে চিত্র, সেগুলিকে তখন দিয়ে যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তা অসাধারণ। "তারপর ঘরটি দিয়া দেখিল, কোন মৌজা নামজাদা কোন মৌজা মাঠের ধন কোন মৌজা পরাস্ত লইয়া এখন নবীন যোদ্ধের মুখ জ্বলজ্বলে লেখা অক্ষিত চলিয়াছে; কলিকাতার অবসাটের ধন বিপুল সুখে জ্বলজ্বলের বাজনা বুঝিয়া দিয়াছে, বাজার ধন বেহালের সঙ্গে তান দাঁড়িয়েছে এবং সভার কাজে যাহারা সুখে চীৎকার উঠিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরী মৌজা চাড়িয়াদহ মৌজা কেবলমাত্র মাঠের এবং ফসলের লইয়া উৎসব উপলক্ষে কিছু দলীতে অন্তর সুখে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে।" অসংখ্য 'শট' ব্যবহার করে অবাপকের চোখ দিয়ে তিনি এই প্রতিটি বস্তু আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। চরিত্র নয় শুধু লাইনের পর লাইন বর্ণনা যে এত সার্থক করে চলচ্চিত্রে দেখানো সম্ভব তা এর আগে খুব কম হয়েছে।

শুধু রবীন্দ্র কাহিনী, নাটক, গল্প কাহিনীগুলিকে করিলে এমনও বহু গল্প আছে যা চলচ্চিত্রায়িত হইতে পেলে অনেক-বছর কেটে যাবে। কেউ কেউ বলেন লেখা বছর সবই কি চলচ্চিত্রায়িত হয়?

> বিচিত্র বস্তুগুলো যেন বিশ্বের প্রলাপ,
> অসম্পূর্ণ জীবনটার ধূলিবিলীন চিহ্নাবলী;
> তারা অভিযাত্রী দূর প্রয়াসের অন্তরোধ,
> সুদূর নীড় বিস্মৃতিলিপ্ত জীর্ণ সেতু
> অবয়বহীন ছেঁড়াপাল সর্পবিদলিত বেণী,
> অসমাপ্ত দীর্ঘ শ্লোকাবলিকে মুক্তরূপ অর্পণের।
>
> —বিভূতিভূষণ

এমি দেখানো যায়? কিন্তু দেখানো যা যায় তাহাও তো এখনও 'চতুরঙ্গ'র কাহিনীকে পাইনি পাইনি তার 'শেষের কবিতা'র বিরহকে, পাইনি 'অ্যাবসার্ডনেস'র সোফিসটিকে।

পেছনে পেছনে একদিন বেলা যাবে আমরা দর্শক হিসেবে টিকা হয়ে যেতি, তখন আর বুঝতে পারতি না এমন নয়। বোঝাতে পারতাম হয় পরিস্থিতিই পরিস্থিতিকে আপন মোহনায় দূর ভবিষ্যতের দিকে আরও আরও আরও। তখন, "যেখানে যেমনো রাতের যেমনো শব্দ, যেমনো প্রেমের যেমনো অভাব নাই এমন একটা শীতলাহীন আকাশের নিচায় দাঁড়াইয়া পাখিটাকে" বুঝতে কষ্ট হবে না। বুঝতে কষ্ট হবে না "শূন্যের ওপরে কেবল পাখিরা আছে, এইটা না। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি, যাহাতে না আছে মেঘের গন্ধ, না আছে বাষ্পশালার সমুদ্র, না আছে আকাশের বীজ, না আছে নাভির ঘোলা।" তখন দিন, দিন, দিন ঘোলা হবে।

—০:০—

সাম্রাজ্যবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমল বসু

(মাতৃভাষা পৌষ—ইংরাজী ১৯ সং)

সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর ভারতবর্ষে কবি হয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের ভাবকতা একেবারেই অসম্ভব। তবে, রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় না যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সক্রিয় মত এক বৈরব ঘোষণা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে তাঁর ভেতরকার পরস্পর সম্পূরক ও অন্তর্মুখর কথা ভেবে পাবে। রবীন্দ্রনাথের কাছে 'দেবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' (চতুরঙ্গ)। তিনি সবল জাতির অবদানটি দেখেছিলেন —পরিচয় হেরেছিলেন এক অখণ্ড ঐক্যসাধী জাতি—মানবজাতি। সেই দিক থেকে এক জাতির অন্য জাতিকে অনুকরণীয় আদর্শে তিনি খুব ছোট করে দেখেন নি। তবে, ইংরেজটা যেখানে বিদেশের-সম্পর্কিত সেখানে তিনি সবে উঠেছেন। তিনি বলি। ছলের আবেদন তাঁর কাছে প্রধান উপজীব্য বিষয়। যেখানে এক জাতি অন্য জাতির সংস্পর্শে এসে ছলের প্রতি উদ্রোহনে সরব হয়েছে সেখানেই তাঁর কবি-মন আঘাত পেয়েছে যেখানে তিনি তাঁর ভাবনীয়া। তিনি দেখলেন ইংরাজ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে আবার, অর্থাৎ দুই মহান জাতি—এক জাতি অর্থে ও ঐশ্বর্যদানে, অপর জাতি ঐতিহ্যে ও ইতিহাসের মহানে—সম্পর্কের আদান-প্রদান করেছে। ভারত পেয়েছে দীক্ষা: বিদেশ থেকে। এই দীক্ষা উন্মুক্ত করেছে আমাদের মনে, পুথিগত ও জ্ঞান-আহরণে। আমাদের চিত্তবৃত্তির ঘটেছে উন্মেষ। তখন তিনি ইংরেজ জাতির এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে একেবারে ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন নি—বাধা দিয়েছে তাঁর নিজের মনোভাব যেখানে ছলের দীক্ষা থেকে এসেছে একটা অবিশ্বাস। এদিক থেকে তিনি ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রসারকে একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি বলেন, তাঁর মতে বাহুবলে যে রাজা-সাম্রাজ্য গড়েছে, কিন্তু তাঁর চিত্তের সৃষ্টি দৈন্যিয় ছিল না। রাষ্ট্র প্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব তেমন করেছে, চিত্তের জন্যে তার কিছা সর্বজনগ্রাহ্য প্রকাশ হয় নি। এক প্রমাণ পাওয়া যায় স্থাপত্যে। মুসলমানের মনের মধ্যে মুসলমান রাজপ্রাসাদের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু বা অন্তরে মুসলমান ভাবনার কোন ছাপ দেখা যায় না। বৈষ্ণব গীতি আবেগ যেমন কথাই নেই। বাহুবলের রাজা দেশের উপর খুব জোর দেখেছে, কিন্তু কোন নতুন চিন্তাধারা কোন নতুন সৃষ্টির উৎসে তাকে মনকে তৈরিতে দেখে নি। বাইরে থেকে মুসলমান ইংরাজের স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, কিন্তু আমাদের সৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। এইজন্যই মুসলমানী সাম্রাজ্যকে রবীন্দ্রনাথ মনের মণিকোঠায় স্থান দিতে পারেন নি। কিন্তু মুসলমানী আমলের শিল্পকলা যদিও এটা পারস্যদেশীয় যেমন বা রবীন্দ্রনাথের উপাদানে চরিত্রবৈচিত্র্য অর্থাৎ, বিদেশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শিল্পকে এক উঁচু স্থান দিয়ে গেছে। তবে, রবীন্দ্রনাথ যে কারণে ইতিহাস বলেছেন সেটার সঙ্গে এটা প্রায় পুরোপুরি সম্পর্ক বিবর্জিত। কেননা, সাধারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্মেষিতে ইহা সহায়তা করে নি।

অপরদিকে, ইংরাজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ঘটনা। ইউরোপীয় চিত্তের প্রবলশক্তি আমাদের স্থাবর মনে আঘাত করলো এই ঢেলা-ঢেলা প্রবাহ যেখানেই চলছে সেখানে চিত্ত জেগে আছে—চিত্ত জেগে আছে। ইংরাজকে আমরা সাদরে জানাই তার সত্য-সন্ধানের সন্ধানের। ভারতবর্ষের পক্ষে এইরূপ শক্তিশালী জাতির সম্পর্কে আসতে পারাতে গৌরবের বিষয় বলে মনে

করা উচিত। এটাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের বিদেশ ভূমি দেন নি। অন্যান্যদের তুলনায় এক জাতি আর এক জাতিকে আকলন করবে এইরূপ ইচ্ছা মনোভাবকে তাঁর সুস্থমন পুরোপুরি তো বিশ্বাসই মেনে নিতে পারেনি। একটা জাতিকে জানার আগ্রহ, তার সঙ্গে সহযোগিতার কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে তাকে গ্রাস করাকে তিনি বর্বর লোভের বিকাশ বলে মনে করেছেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্ন মনোভাব পোষণ করলেও তা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিই স্পষ্ট হয়েছে :—

"The view that we can get of her (Europe), in her mutual dealings, is that of a titanic power with an endless curiosity to analyse and know, but without sympathy to understand, with numberless arms to coerce and acquire, but no serenity of soul to realize and enjoy."

ইংরেজ মনোবৃত্তির তিনি বলেছেন, "It is the spirit of organization which is not social in character, but utilitarian." Bentham-এর উপর তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর সকল মনোভাবের আক্রমণেই তাঁর আসন আঘাত করেছে। তিনি ইংরাজ আক্রমণকে কবির দৃষ্টিতে দেখেছেন বটে, তবে বুদ্ধিবিকারে পুরোপুরি মেনে নেননি। মানুষের কবি হিসাবে তাঁর কাছে এটাই চিরন্তন যে মানুষকে আগে জানো, পরে মানবজাতির খোঁজ করবে :—

"Know then thyself, presume not God to scan,
The proper study of mankind is man."
(Alexander Pope)

তাঁর নিজের ভাষায়—

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।"

তবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ 'Deistic' নয়। Pantheism-ও তাঁর কাছে একরকম ভাবে ধরা দিয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁর কাছে এই দুই বিপরীত ধর্মীয় মনোভাব কিভাবে ধরা দিয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের উদ্দেশ্য হল এই Deistic মনোভাব তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ধারণাকে কতখানি পুষ্ট করেছে তার বিশ্লেষণ করা।

ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি পাতায় পাতায়, প্রতি ছত্রে ছত্রে মানুষের কথা। আকণ্ঠপান চিরকাল মানুষকে মদিরা দিয়ে এসেছে। কবিগুরু তাদের আমাদের জন্য "মহামানবের সাগরতীরে"। এর তীরে বসে সমস্ত মানবজাতির গানগান শোনা যায়। অতএব, এর সঙ্গে ইংরেজী মনোভাবের সাদৃশ্যের সীমা যায়। কেননা, ইংরেজের কাছে 'A man is a man for all that' (Burns) এটাই শেষ কথা। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অংশে যে জাতের স্বাধীনতার প্রচারণায় মন মেতে ছিল তার এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ, আর এক দিকে ছিল ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু যখন দেখা গেল, ইংরেজদের বাইরে স্বাধীনতা বলতে ইংরেজীর সমস্যার জন্যেই ভালো দেখবার জন্য নয়, আত্মস্বার্থের জন্য, তখন এক দিন যাদের পিঠ চাপড়ে এল তাদের বর্বরতার উপর। তারপর চোখের সামনে দেখা গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুরতা। যে ইংরেজ পূর্বদিকে একদিন স্বাধীনতার মন্ত্র পড়িয়ে দিয়েছে তারই উদ্ধত প্রকাশ পেল 'Fascism' এর নির্লজ্জতায়। ইংরেজের সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ মূল্যবান মনে করেছেন, কিন্তু গালিবদ্ধ করেছেন তার ভণ্ড বর্বরতার উপর।

তবে, রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে যে পথায় অভিযান চালিয়েছিল তার কারণে কেন তাঁর বাণীর শ্রোতা হতে পারেন নি। বর্বরতা বিরুদ্ধে তিনি বর্বরতা টেনেছেন পক্ষপাতী নন। ইংরেজী সভ্যতাকে বিরুদ্ধে তেমন তে তাদের অবদান অস্বীকার করেছিল সেটাও তেমন সাদরণ ছিল না। তাদের Politics এর সঙ্গে আমাদেরই ছিল উদারতার বাদ, তেমের তেমের বাদে একেবারেই না। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকেও তিনি মন মনে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে—

"বস্তুত যখন সমস্তরের মেরুর বুদ্ধিশক্তি, কর্মশক্তি উচ্চতর স্তরে তখন অন্য দেশ থেকে আলাদা ভিন্ন পরিবেশ থাকলেও ধরনধারণ মূলে আঘাত করে না। মানুষের লোভের বিশ্বরূপ যা বিদেশী গায়ে বিদেশী হয় না, সে যাতে তার যথেষ্ট তার মূলগত প্রভাবের পার্থক্য নেই।

কিন্তু, রাষ্ট্রনীতি-বিরোধী এই সমালোচনাকে আমার অকপটচিত্তে গ্রহণ করা যায় না। রাষ্ট্রনীতি যেখানেই সমস্তরের মানবের অন্তরের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি আঘাত করতে। অথচ সমস্তরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় সমস্ত বিশ্বকে "শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্র"-এর দিকে পরিচালিত করে বেশী কাজ করেছে। তবে, একথাও অনস্বীকার্য যে কেবল যথেষ্ট মাটি থাকলেই চলবে না, সে মাটি উর্বর ও রসসিক্ত হওয়া চাই, নতুবা সমস্ত বিফল হয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা বোধহয় তাঁর প্রবন্ধগুলিতে নয়, তাঁর কথায় বার্তায় ব্যক্ত হয়েছে। "রক্তকরবী"-তেও এধারণা পুরোপুরি কাজ করেছে। নাটকের নায়িকা "নন্দিনী" মানবতার দূতে রূপে বাণী বহন করেছে। এই দূত যান্ত্রিকতার পীড়নে বেঁকে যায় নি। চরিত্রটির পীড়নের কথা দিয়ে এর প্রকাশ। কিন্তু যেসব সমাজতন্ত্রিক পীড়নে যান্ত্রিকতা সমস্তরের উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—তেমনি।

এই নাটকের ঘটনাস্থল রক্তপুরী, যেখানে বিশ্ব সমস্তরের মূল প্রয়োজন জাগানোর প্রয়াসে যক্ষপুরী নির্মাণিত—বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। সর্বগ্রাসী এই শক্তি রাজতন্ত্র রূপকে চিহ্নিত করে, নন্দিনী ও রঞ্জন (রাজা) রূপে দাঁড়িয়েছে। এখানকার রাজা বলেছে যে "রাজত্বের অন্য পূর্তি নেই, প্রেমের অন্যই পূর্তি"—"It is excellent to have a giant's strength, but it is tyrannous to use it like a giant." (Shakespeare) "রক্তকরবী"র রাজা ও নন্দিনী সেই ইংরাজ শাসক শ্রেণীরই প্রতিনিধি। এই সর্বগ্রাসী সভ্যতা মানুষের সঙ্গে প্রেমের বিনিময় গড়তে চায় না—এ চায় লোভের জাগ্রত বিশ্বরূপ ও লক্ষ্মী। "It is an organised passion of greed that is walking abroad in the name of European Civilization. It barricades itself against all direct human touch with barriers of race, pride and prestige of power."

এই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীনকালের রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রভেদ রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"Once our people had either an Akbar or an Aurangzeb to deal with, now we have an organised avarice—Frightfully simple in purpose, mechanically complicated in process."

পরিশেষে, আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান মন্ত্র উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদকে একেবারে ফেলে দিতে পারেন নি। কারণের দৃষ্টিকে চলমান বিশ্বের দিকে এঁকে তিনি থামিয়ে রেখেছেন—উপলব্ধির ও বাস্তবতার মানবতে পুরোপুরি নয়। তাঁর কিছু সময় কাজ করেছে এক অখণ্ড মানবসত্তা হয়। সেইজন্যে তিনি সর্বদাই আশা আকাঙ্ক্ষা ছিলেন কখন উপনিষদ হয়ে মানবজাতি ঐক্য, সৌন্দর্য ও প্রেমের জাতি গড়িয়ে। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতা বিশ্লেষণে তিনি বিদেশী ছিলেন। কেননা, তাঁর ছিল সুসমঞ্জসী ভাব ও দৃষ্টি। সেজন্য তিনবার তাঁর এই কল্পনাকে আঘাত করে প্রমাণ দেন নি। সেজন্যই তবে প্রাচ্যের বাঘ ও প্রতীচ্যের গরু এক ঘাটে কখনই নিরাপদে নির্বিঘ্নে জল খেতে পারে না। এই কারণেই বিদেশী সমালোচকের (বসুটি) মতে—"He (i.e. Tagore) lives in the ivory tower of imagination isolated from the world of reality." তবে, রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বকবি গোলের একমাত্র সত্য ছিল মানসিক প্রকৃতি যার জন্য তিনি জাতিতে জাতিতে আদান-প্রদান প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। তাঁর প্রার্থনা—

"এ মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো হে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

কবিদের প্রার্থনা হলেও এটাই কি আজকের ধ্বংসের পৃথিবীতে বিশ্বশান্তির পথে সকল জাতির একমাত্র পাথেয় হওয়া উচিত নয়?

—x—

সাম্প্রতিক ছোটগল্প ও কবিতার বৈশিষ্ট্যচুক্তি

শ্রীশঙ্কর ঘোষ
(দ্বিতীয় বর্ষ—বাংলা)

"অনেকদিন এই অভিযোগ ছোটগল্প লক্ষ্য দিয়েছে। এদিক থেকে উপন্যাসের সঙ্গে তার আত্মীয়তা অপেক্ষা, বীতিকবিতার সঙ্গে তার অনেক বেশী নিকটতর"—রবীন্দ্রনাথ এমনি মুখবন্ধটি লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁর বক্তব্য যে বিশেষ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়। তবে তাঁর ধারণা মূলে একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছে এবং তাঁর পক্ষে অবশ্য সমর্থনের কথা যেমনই উঠেছে তা নিঃসন্দেহে তর্ক বিতর্কের। হাল আমলের গল্প লেখকের কলম দিয়ে যা প্রকাশিত হবে। বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর গল্প-সাহিত্যে দুটি ভিন্ন ধারা লক্ষ্যণীয়, তবে কি ভাবে একটি বিভক্ত, বিভক্তের অন্তরে, দুটি ঐক্যের—তা নিয়ে কেবল দেখানো মূলোপও ইতিমধ্যে প্রকাশ।

আমরা জানি, নিজেকে জানবার কথা তাঁদের মনে এসে, যাঁরা মনস্তত্ত্বের দৌরে অর্জন করেছেন। এই আজ নিজেকে উপলব্ধি আজ হলে নিজ ছেড়ে আছে। নইলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিসের এত টানাপোড়েন? রবীন্দ্রনাথের গল্প অনেক কম লিখিয়ে, আজ নানা মনোভাব গল্প ধরার চেষ্টা নিরন্তর ছেড়ে পড়ছে—এই জন্য, মূলের প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য। জীবনের সমুদ্রতীরে, তাঁর খেলার ঘরে, কর্মাধ্যায়ের ক্লান্ত দুই দণ্ড নানা আয়তনে গল্প আসছে গল্প আসছে গল্প আসছে পড়ছে; তা থেকে নির্বাচন আজকে করে গল্পকার আলিয়ে নিজের মৌজমেজাজে মোলাহাই। এ অবস্থায় অবশ্য আশা আজকাল। তবু ভাষাহীন নিরীক্ষা লক্ষ্য সমালোচকের কাছে ভাষিকের টেনেছে। নিরাশ ও প্রতিক্রিয়াশীল মন দুই উত্তেজনার অর্জন তুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু উপায় কোথায়? অর্জন মোক্ষ অতি নেই। কিন্তু ভাল হচ্ছে না কেন? কিন্তু মনোভাবটা যেহেতু মূলত ঠাকুর নানাদের—রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ লেখকের পক্ষে বলতে পারি—সব অন্তরীন পরীক্ষা। তবুও, ফল অবশ্যই পাবো। প্রতীকার পক্ষে অর্থাৎ সমালোচক পাঠকের পক্ষে অবীর জিজ্ঞাসা নিয়ে বলতে পারি, আর কতদিন অপেক্ষা করব? এরমধ্যেই যে সবগুলি পালিয়ে গেল, পালিয়ে যাচ্ছে! তা' ছিল অবশ্য কয়েকটি নিয়ে আলোচনা যাচ্ছে। এই যে অজস্র টানে উপন্যাস কাঁটায় মুখোশ যাচ্ছে গল্পসাহিত্য, এই অবোসহিষ্ণুতা, গল্প-সাহিত্যের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু আশা করা অন্যায়। তবু চৈতন্যের মূল ঘরে অন্ধকার যখন আমাদের নাড়া দিতে পারছে তখন আশা করব বৈ কি!—"পরাধীন অভিজ্ঞতার দ্বারা পড়েছে মনের দর্পণে—মনের দর্পণে। এইরকম একটা জটিল প্রেক্ষিতে আর কল্পনা কি সাহিত্য আসে নি? না, এসেছে—উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ ছিলেছে। তবে কেন গল্প ও কবিতায় মেলাবেলে ও তার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নিরীক্ষা নেবে দেখব না।

একথা অবশ্য স্বীকার ক'রে নিতে হবেছে, গল্প ও কবিতার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়। "অনেক আশা আছিবে প্রায় ওজন করে এক-একটি গল্প লেখে কবিকে কবিতা লিখিতে হয়, গল্প লেখকের গল্প"—রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন। মূলাভিত্তিক ও মূলপ্রতিষ্ঠিত এই উক্তিটিকে তাঁকে আমরা পাই না। কিন্তু আমরা হিসেবে তাঁর একটা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী পাই, যখন তিনি বলছেন—"গল্প কবিতা হবে কিনা অবশ্য আমি যাবতে এটিতা অবান্তর মনে হয়।" ছোট গল্পসাহিত্যের ইতিহাস মেলোচনের দেখতে গেলে নিজেই হবে, বিশ্বাসের পরিমার্জনীয় ঐতিহ্যের উপায় হলো, বিশ্বাসকের ধারে ঐতিহ্যের

অবশ্যই, কোনো অবাস্তব প্রশ্ন নয়। এ অভিজ্ঞতা যদি অবশ্য হয় তবে দিব্যেন্দুবাবুর অভিমত পূরণীয় হলো না কেন? কেন অবাস্তবলোকে—তাঁকে বয়, যার অভিমতকে বাতিল করেছেন অন্যান্যেরা! বুঝতে পারছি, তাঁর প্রশ্ন পরই ওঠে Factor। বিভিন্ন তাই পছন্দ করেন—তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি আমাদের হচ্ছে যখনই, যখন একটি ধারণাকে উঁচিয়ে বা পুঁচিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্ধ বিশ্বাস নয়, বিচার দেখা দিল। তবে কি কোনো স্তরের ভাষা নেই? ছোট গল্প ও কবিতাকে নিয়ে, আজ যে একদলে ভাষাবাদ ও প্রয়োগ করবার পরীক্ষা চালানো হচ্ছে—কোনো Socialistic স্তরের কতকটি চরম না করেও বলতে পারি—অনাবশ্যক কৃত্রিম স্তরের আবিষ্ট চিত্রিয়ে যখন আন্তরালের অভিজ্ঞা করা হচ্ছে—তখন, তখনই প্রশ্ন হয় এই ক্ষেত্রে, কোনো সরল বিশ্বাসের জটিলতায়, তথাকথিত স্তরের পোষাকে আবৃত করার অন্তরোধ্য তত্ত্ব কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আর, পারেনা বলেই অনেকে সাদর প্রত্যাখ্যান করছেন। কেউ কেউ দিব্যেন্দু পালিতের মতন সাদর প্রত্যাখ্যান—অস্বীকার করছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত, গল্প ও কবিতায় সেখানে যে নিরক্ষ পুনরুক্তি আছে সর্বতোভাবে লালন করে কি লাভ? এঁরা আরো বলেছেন—সর্বনাশ হতে চলেছে। গল্পসাহিত্য যৌবনে পা দিতে-না-দিতেই এই অভিযোগ মুখে এসে পড়ল, তার সর্বনাশ পরিণামে থেকে আপনারা বাঁচান। একদের 'আপনারা' বলতে ভাষা—তা' আজও স্পষ্ট হচ্ছে না। অন্যথায়, পাঠক ও সমালোচক—উভয় মূলকেই ইঙ্গিত করে উভয় মূলের দরবারেই আপীল করা হচ্ছে। কিন্তু এই আপীলের মূল্য কতটুকু? ভালোবাসা কেবল 'মুখ দেখি' অভ্যাসের থাকে—তাই বিরক্তিকর আভিশয্যকে ক্ষমা করতে পারতে দিতে চান না। ফলে, একদেরও যারা পক্ষের ওকালতীনামায়, প্রতিবাদী পক্ষ অর্থাৎ গল্পসাহিত্য মুখাপেক্ষ তেমন আকর্ষণ দিচ্ছেন না। তার মানে এই নয় যে, এঁরা আত্মাহুসন্ধানী নন। গল্পের আত্মাহুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গল্পলেখকের মানসিকতা যদি আত্মসমালোচনা করতে না শেখে, তা হলে পরীক্ষিতার তাৎপর্য ঐ হয়ে যায়। এবং তাই হলেই লেখকের বিকলতা অবশ্যম্ভাবী। ছোট গল্পের জন্ম ইংলণ্ডে, যাঁদের কাছে তোমের ঋণি, তাঁরাও মুক্তাবিষ্টি অস্থির নয়, আমাদের অজানা অনেক কেলেঙ্কের এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তবু এই নিয়ম বলে—অর্থাৎ ভেবে হলের না। আরো দুঃখের কথা, উঁচুর দৌড়ার লেখক কানে তুলো গুঁজে, অন্যান্য দিকে, চক্ষু না খুলে লেখার ঝোঁকে মুক্তাবিষ্টি মুক্তাবার উঁকি মারছে বলে না! অন্তে বিরক্তি প্রকাশ করেন। অবশ্য, প্রকৃত শিল্পীমাত্রই প্রকৃত সহিষ্ণু। অবশ্য, অন্তরস্পর্শ বিচারক, বিশেষতঃ ছোট গল্প ও কবিতার নৈর্ব্যক্তিক ভাষার অধিকারী পাঠক ও অন্ধ সমালোচক ও নৈর্ব্যক্তিক অন্তর লেখককে বাতিল করে দেবার ভোরে তোর থাকা দরকার।

॥ ২ ॥

একটু চমকালেই বাড়িয়ে দেখলে বুঝতে পারব, দিন দিন পরিমণ্ডলেই ছোট গল্প ও কবিতার চলাফেরা। স্বভাবতই মনে হবে, উভয়কে নিয়ে তর্ক ও সমস্যাবিচারের অবসর কম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মতন ভাব ও রসের আদানপ্রদানের ফলে উঠলে, অভিজাতবোধের গভানুগতিক ধারণা কেটে যায়। এবং কেটে যাচ্ছে বলেই নোবুন রীতির প্রভাব অনুভব করছি। এই সূত্রে, ছোটগল্প ও কবিতার লাইসেন্স পরীক্ষা করতে বসতে জটিলতা যে বাড়বে তাই বয়,—কিন্তু আলোচনার অবসর মিলবে। সাধারণত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি উৎসাহ যা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—(ক) ছোট গল্প কবিতা (খ) কবিতার ছোট গল্পের ধরণ (গ) ছোট গল্প যেন এক-একটি কবিতা।

মজার কথা, যখনই আমরা ছোট গল্প প্রসঙ্গে কবিতার, বলিষ্ঠতা লক্ষ্য দিয়া আনি, তখন বিপরীত পক্ষে, কবিতার গল্প আধিবীর ঘুঘিয়ে সম্পর্কে সচেতন হইতে, অন্তত সচেতন হওয়া উচিত। বক্তব্যের যা দীর্ঘ কবিতায়

আমার প্রশ্নের একটিমাত্র আপনারা নজর করেছেন। অবশ্য, এখানে বিস্তারিত তার আলোচনার সুযোগ নিতান্তই কম। এই জন্যে বলা, গল্পপ্রসঙ্গে কবিতার তুলিতা তত্ত্বগতি তুলিপাতের—তাই বিচার। অর্থাৎ উপন্যাস হিসাবে বিষয়টি বলতে হলে অনেক থাকতে হবে, কথা আমাদের গল্পে কবিতার পরিমাণগত বা অভিমানগত উপস্থিতি। এই তুলিকলা থেকে একটা প্রশ্ন আসবে, কবিতার গল্পের রস নিয়ে যদি কথা না হয়, তবে গল্প আসলে এমন কি কথা? আমরা বোধ করেছি, যখন কোনো কোনো গল্প মহীরাহ হয়ে বিরাজমান—গল্প কবিতার চারিত্র্য প্রয়োগ তা অনুচিত, কেননা—তারা বিশ বছর বা পঞ্চাশের; যেমন বিশ বছর বা তেমন আর জন্মে। তা হলে আরো একটুকরো প্রশ্ন থাকে—গল্প যা কবিতা কোনো বা তৈল জাতীয় দ্রব্য বিশেষ?

গল্প কবিতা-ই নয়, তার জন্যেও নয়, আরো অনেক কিছু হয়ে থেকে পারে। জীবন ও জীবনবোধ অনন্ত। ফলে, যৌনাচারহীন ছোটো-ই এমনের তরুণ কথাশিল্পী অনেক গল্প লেখে বিরোধেন। সংসার পরিবেশনের ভঙ্গীতে, তেমন প্রকাশের বিন্যাসযোগ্যতায়, কখনো বা, কবিতার গল্প লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ এটুকু বুঝিয়ে দেয়া যায়, কবিতার রুচি ও গল্পের গভীর শেলেও গল্প লেখা যায়। এমনকি রবীন্দ্র সাহিত্যের পদ্ধতি-ও গল্প সুখের স্বীকৃতি দিয়ে রাখবার সৌকর্যে পারে। গল্পের বুনুনি ইসারা-ইঙ্গিতের বাঁকা ভাষণে সু-প্রণালিত। আসলে আর কিছুই নয়, অনেকজন লক্ষ্যভেদ করেছেন,—উপন্যাস-ভাবনা—"অন্তরেই যৌনাচারিণীর অভিনয়ের মূল রাজনীতির উপাদান। এবং সেই রাজনীতি যা কখনো কখনো ব্যাকরণ ধরন আর ভাষণ এঁদের অন্তর্মুখিতার প্রকাশক। এবং জীবনের পরিবর্তনের অন্তরণন আমরা খুঁজে পাবার অন্তর ছোট্ট। তাই রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে পদ্ধতি নিয়ে, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অমল নিয়ে, কি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় চিত্রকল্পের আবাহনের আমরা সবসময়ে জীবনের অন্তরালের অর্থ খুঁজবার প্রয়াস ও এঁদের অন্য বিষয় হয়। উপরে গল্পের আমরা পো-ফেলে বিরত হওয়ার বাধীর যখন না হোক, যৌবনী প্রথমতঃ আমরা কথাসাহিত্যিক যখনই নই।" সাম্প্রতিক ছোট গল্প প্রকৃত প্রস্তাবে, হওয়ার বাধীর যখন না হলেই তো অন্তর প্রকৃতিতে কবিতার ধর্ম—প্রয়াস পাইবের না হোক, অন্তত যন্ত্রের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারছে। এক পাতায় থাকতে থেকে একের প্রথার অন্তর কথা বিস্তৃতির হতে যাও পারে ঠিকই, কিন্তু পাতাতে পাত্র সুখের সম্পূর্ণ ভাষাদের উপযোগ প্রয়োজন সম্ভবের সম্ভাবনা ও যোগাযোগ—এই হচ্ছে অবশ্য এক সহজের পথে সহজের প্রথার প্রতিবন্ধিত বলে বিস্তরের কোনো কারণ নেই। যর সংসারে এরকম উপযোগী আমরা থাকার প্রথমন হয়েসাই থেকে। এর উত্তরে—গল্প ও কবিতার থেকেও কি এরকম হয় না—হতে পারে না? এমন কি, এরকম অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে—গল্প ও কবিতার অন্য দুই অর্থ এক। 'এক'-এর বহুরূপী প্রকাশই নিয়ে বৈচিত্র্য এনেছে,—সাহিত্যে-র মূল রসের উপযোগী অন্তরালা থেকে তুলে নিয়ে নিয়ে নানারূপ পরিচিতি হচ্ছে। তাই বলে আমরা এমন কোনো অবস্থান উপায় করব না, যা অন্যান্যদের কোঁচাটে রাখে নিয়ে যাবে, যেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই।

একই মাটি থেকে একই মৌল আকাশের নীচে, জল মূল অন্নাপাচক বৃক্ষটী পাখি মানুষ যাদুটী ঘাস-ফাল-পাতার ব্যবধানে থাকে যায়। চলতে চলতে ঘর থেকে ঘরান্তরে উত্তীর্ণের ইচ্ছা—এই যে বৈচিত্র্য এই যে আকাশের উপরের সকলের বিলম্বতীর্ণ রচনা এবং তার পরে মৃত্যুর উপায়ে পূর্ণ আকাশে একে একে ছিন্ন যাওয়া—এই ছিন্ন যাওয়ার মতন সাহিত্য গল্প ও কবিতার পার্থক্য কোন ছিন্নও কি উপরের সাধারণের বিষয় বস্তুমান উপযুক্তিকে আমিয়ে দেয়া যায় না? অবশ্যই যায়। আর যা হয় নি, আর যেন তা-ই হচ্ছে। ঘরের মতন সমাজের মতন আজকে গল্প হয়েছিল বলেই তো সাহিত্য হতে পারল যাকিপত্র। ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীন, লোকায়ত হয়েও অভিলৌকিক। এ রকমই আমাদের ঘরোয়ার ঘরের কাছে বাঁধা আমার। রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটি মনে পড়বে—"এঘরের যে কাহিনী ছিল ছবি

P29287

ইচ্ছা ও রুচি প্রকাশের অবকাশ, পরবর্তী কালে সেই রোমান্স কাহিনীই বিশেষভাবে বৃহত্তরীতি বহিরাকৃতিতে রূপই বিকাশ পেয়েছে।" এই যে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত, একে কি শিক্ষা পাচ্ছি? পাচ্ছি, ছন্দ আছে বলেই ছন্দের পদ্ধতি আছে। পদ্ধতি আছে বলে, পদ্ধতি ধরে ছন্দকে হয়। তবে গল্পের ছিল, আরো গল্প আছে। একদিন ছিল কাহিনী নির্ভর—আজ আর তা নয়—আজ সে কাব্যের দিকে ঝুঁকেছে। যন্ত্রক, ছন্দ বলায়, ছন্দের পদে নয়—গদ্যের অর্থে। ছন্দের পতনে যদি ঘটে থেকেছিল, আজও নয়। আজ আজা-তো বটেই, পাশাপাশি রীতিও বলে আছে। আগের যুগে ঈশ্বর ছিল সাহেবের, আজ ঈশ্বরের মুনসেফের যোগাযোগ ঘটা যাচ্ছে—বা ছোটগল্প, বা কবিতায়। 'বিদিতার রবীন্দ্রনাথের যে গল্প ও কবিতার যে গ্রন্থের প্রথম লক্ষ্য করা যায়, তারই শেষ বিকাশ পরবর্তীকালের, বিশেষত পাশ্চাত্যিক ভাবের গল্প রচয়িতাদের লেখায়—অবশ্যই বাংলা গল্পের লেখায়।

মনে পড়ছে, হাসী জেমসেপনের মাঝে মধ্যে গল্পোত্তরী একবা একটী ভূমিকায় উক্তি করেছিলেন। চমৎকার সেই মন্তব্যটির উক্তিটী হচ্ছে—"ছোট গল্পই এখন আমাদের একমাত্র 'আজা মার্কে' গাধা। কবিতাও। কবিতা ও ছোট গল্প আমি অর্থে অভিন্ন।" প্রকৃতপক্ষে, 'আমি অর্থে সাহিত্যের এই দুটী শাখা একইরূপ নয়, অভিন্ন অর্থনয়। কিন্তু কাজকর্মে ছন্দের ও ছন্দের—দুটী বিভিন্ন পথে এরা চলছিল। আমরা আলোচ্য যারা তাদের বিভিন্ন চৈতন্যের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন। ইতিপূর্বে আমরা একাধিক দৃষ্টান্তে দেখেছি, ছন্দের সঙ্গে মনও বদলায়। ছন্দমন্ত্র ব্যাপারটিও নব নব ব্যাখ্যারই নির্যাসকণ। যেমন, কাহিনী নির্ভর শ্রীযুক্ত মাইক, 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড'-পেছনে কারণ তাঁর ছন্দ শেষ প্রমিথিউস আনবাউন্ড-আমরা নিয়ে যাচ্ছে তাই ছন্দ শেলীর প্রমিথিউস বিলবাউন্ড। কিংবা, হোমার-ঘটিত অন্যান্যদের চরিত্র ইউলিসিসকে তবে কথন। টেনিসন ছন্দমন্ত্রের মাধ্যমে তাকে নিয়ে এলেন কবিতায়; যেমন অমেন আমেরই ছন্দ নিজের উপাদানে, প্রবীণকে যৌবনে। একটী ভাবমূহূর্তে বিভিন্ন হাতে বিভিন্ন আকৃতি নেন নাকিয়ে নেবার, মাকিয়ে নেবার প্রক্রিয়া থেকেই প্রকৃত দৃষ্টান্ত পেয়েছে। কিন্তু দুটী ছন্দের একটী দুরূহ বিস্তৃত উপন্যাসিক ব্যবহার নিয়েছেন কি মানুষের অবশ্য এর ব্যবহার পরিচয় দেয় না? যদি নিছের প্রয়োজনে ছোট গল্প ও কবিতার সমীকরণ ও সমীকরণ—তেমনি নিজের সাধনপথে দুজন পথের থেকে নিজের পথকে উঠে আসে, তাঁর ঐতিহাসিকতা যদি তাঁকে উত্তরণের সীমারেখে পৌঁছে দেয় বা পৌঁছে দিতে চায়—তবে আমরা যারা ভালো বাঁচতে পারিনা, পাশা ভালো দেখতে পারি—তারা কেন অযথা বিতিহীন অসন্তোষ ছড়িয়ে যাব? স্পষ্ট হয়ে হচ্ছে, কারা যৌক্তাকু কিছে কি লাভ? কালে না ওকালে যখন যখ দালানে পড়া যাবে না, আর উঠোন কাদায় বিকিয়ে দিলেও তো সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে—তখন আমার হয়ে ঘটতি উঠোনে না ফেলা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গল্প ও কবিতার মধ্যে যদি কোনো আঁচাচীন পদ্ধতির নীতি না মেনে যদি মনোমত সঙ্গে সাহিত্যিক সম্ভাবনাময়ের পাশুনি পাকাপোক্ত করবার দিকে মন দিতে চাই, তাও তো কিছু ভুল নয়। অন্তত এখন আমাদের ভেবে দেখবার সময় এসেছে বলে বিশ্বাস করি।

।৩।

অবশ্য যাদের কাছে ছোট গল্পের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাঁরা পরিবর্তে না তাকালে দুঃখ হবার কোনো কারণ নেই। তাঁরা যদি কিছু অন্য ইচ্ছে বিনিময় বলতে চান তাও তো আমরা শুনব না। শুনব না এই কারণেই যে আমরা একমত, মনে মনে এই আশা পোষণ করছি, ছোট গল্পের প্রয়োজন আছে এবং থাকবেও। তবে যাদের কাছে ছোট গল্প নিষ্প্রয়োজন মনে হচ্ছে—যেন মনে হচ্ছে—সেটা কারণ দুই জন্য শুনতে পারি, অন্য কিছু নয়। কৃত্তিবাস-কবিগোষ্ঠীর একজন পরিচিত কবি স্পষ্ট ভাষে জানিয়ে দিয়েছেন—"বিশুদ্ধরূপ হলো শিল্পরূপ বিশেষে ছোটগল্পের প্রয়োজন আমার কাছে ফুরিয়েছে। আমার বিশ্বাসের মানুষ যখন সর্বাধিকের অনন্তিম ছিন্ন তখনই

শিল্পরূপ হিসেবে ছোটগল্পের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানের কোনো মুহূর্তে মানুষকে আর ছোটগল্পের পরিধিতে ধরা যাচ্ছে না। এই পারিপার্শ্বিক রূপ বিশ্লেষণ পর থেকেই। এবং কবিতা আর উপন্যাস দুটো শিল্পরূপ হিসেবে আর কিছুই প্রয়োজন নেই সাহিত্যে। মানুষের বিশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের জন্যে হয় যা কবিতাই একমাত্র যোগ্য ক্ষেত্র।* কোনো কবি মহৎ লিখতে আরম্ভ করলে, নানা ধরনের বিশ্লেষণ ও আধারের বিশ্লেষণ হতে পারেন, তাই বলে একমাত্র ধরনা প্রধান অবলম্বন কেন? দেখা যাচ্ছে, যখনি থেকেই পাঠকের পরিমুক্তার অবসর নিয়ে এবং অসীম আকাঙ্ক্ষাকে বাধা পরিবেশন করা হচ্ছে। উপন্যাসের পাঠক সং ও গুরু রূপে পুরুষ রূপে উপস্থিত হতে চান না, লেখকের মনস্তত্ত্বকে খুব একটা আমো স্বীকৃতি দেবার আগেই বাতিল করে দিতে চান। ফলে গল্প নয়, কবিতাই মানুষের বিশ্লেষণ আর বিশ্লেষণের জন্যে একমাত্র যোগ্য ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করা, কোনো কবির পক্ষে যথার্থ মহত্ত্বের দুষ্টান্ত কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, একথা নিশ্চয়ই আমরা কেউই জোর দিয়ে বলি না যে ছোটগল্পের ও কবিতার সম্পর্ক সাপে-নেউলের সম্পর্ক। একজন কবির কাছে আমরা যে উন্নতির দাবী করি অনুরূপ, তারই পাশাপাশি অন্য একজন গল্পকারের কাছেও আমি —'ছোটগল্প আমাদের দিতে আসতে হবেই।' অর্থাৎ কবির বিরোধী ধরনা লেখক করেন গল্পকার। এঁদের ধারণা মাত্রিয়ে নিয়ে এরকমই পাওয়া যাবে—(ক) মানুষ যখন সব দিকে অবস্থিত ছিল তখনই শিল্পরূপ হিসেবে ছোট গল্পের প্রয়োজন ছিল। (খ) অভিজ্ঞতার ব্যাপকতার জন্যেই ছোট গল্পের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। অন্য ধারণা—'ক'-এর ভাষ্যকার পরশু মুখোপাধ্যায় এবং 'খ'-এর ভাষ্যকার অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ক-এর বিশ্লেষণ—কবিতায় শেষ পাদি, খ-এর বিশ্লেষণ—গল্পে শেষ হয়। এইবার প্রশ্ন উঠবে, এদি উভয়ের যোগাযোগের অন্যায় অধিক দুর্বিনা! ঠিক তা নয়,—আসলে, এরকম উক্তি উপলব্ধির আর থেকে উদ্ভূত, উপলব্ধি কর্ম থেকে উদ্ভাবিত নয়। তার মানে এই নয় যে, এঁদের অনুভূতি নেই। বরং, এঁরা personal bias-এর ওপরে অনেক। বিশ্লেষিত অর্থে, ব্যক্তিগত mode of experience-এর অনুভবমাত্র পরিচালিত হয়েছে। লেখক হিসেবে সার্থক নয়, কিন্তু যদি হিসাবে অনেকটা সার্থকতার দাবী করতে পারেন। ফলে গল্পোপাধ্যায় ছোট ও কবিতা রচনার সমর্থন হতে পারেন নি, সমালোচক হিসেবে অনেকটা সার্থক হতে পেরেছেন। একটি বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন প্রতিটি মানুষের ছোট সত্যকে অস্বীকার দিয়ে পরস্পরকে সম্যক করা যাচ্ছে না, তখনই 'এক্টিভেট' বা বলেই উক্ত লেখকের বক্তব্যে একাত্মতার জোর দুর্বিনাকে করা পড়েছে। অথচ দেখার স্পষ্ট পাচ্ছি কবিতার জন্য একটি বলয় গল্প বিচ্ছিন্নতার কাছ থেকে। বিষ্ণু দে কোনো অন্য লেখক এ অভিযোগ করে উঠেছিলেন—বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন—কবিতার যদি প্রয়োজন না ফুরোয়, যদি তার ভবিষ্যত থাকতে পারে, তবে গল্পের প্রয়োজন ফুরোবার কেন গল্পের ভবিষ্যত থাকবে না কেন? গল্পের বর্তমান আছে বলেই তো ভবিষ্যতের প্রশ্ন। যার ভবিষ্যত নেই, তার বর্তমান যে ইতিহাসের হয়ে যায়। অতএব, গল্পের যদি বর্তমান আছে বলে করি, অবশ্যই আছে—তবে তার ভবিষ্যতও আছে।

অর্থাৎ আমরা জেনে নিচ্ছি, যার বর্তমান আছে, সময় সূত্রে তার ভবিষ্যত সম্পর্কেও জানতে। এবং তাহলে দেখতে পাব, ছোট গল্পেও ভবিষ্যত আছে। এ সম্পর্কে বিষ্ণুবাবু আগে 'পরিচয়' নামে একটি সুপ্রাচীন ছোট গল্পের পত্রিকায় আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বলেছিলুম, ছোটগল্প আজ নয়, কিন্তু তার ভাষ্যকারী হয়ে যাবে নেই। বাংলা সাহিত্যে সুবীক্ষি চাটুজ্যে যাকে 'বিষয়ের ভাষ্যকার' বলে অভিহিত করেছেন, সেই অনুযোগের গল্পকেই যখন গল্প তা উদ্ভাসিত। আমরা 'ফুল ফুটুক বা ফুটুক আজ বলয়' বললে কবির বিষয়ে সমস্যারী করা চলে না। কিন্তু গল্পে ফুলকে ফোটাতে হবে, বলয়কেও ধরতে হবে। অর্থাৎ, গল্পে আমিক ও বস্তু বিশ্লেষণের অনুরূপ অনুরূপী সম্পর্ক হবে

চলবে না। এইসব দিক ভাবতে ভাবতে গল্প-প্রবাহ তীব্রতর হয়। প্রতিমুহূর্তে বর্তমান অতীত হচ্ছে, ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে উঠছে। ফলে গল্প ও কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলোর আগে ভবিষ্যৎ-চিন্তা ঐতিহ্যিক হলে দিব্যেন্দুপালিত কবির 'অবাস্তব' শব্দটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে—এমন কোনো কোনো শব্দের মূল্যহীনতা আমরা ভাবতে চাই না। বর্তমানের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ বর্তমানের কাছে। তাই, আজ যখন গল্প কবিতার ভাষাগত ও তার চাল অন্যান্যের মানসাত্মি ঐতিহ্যিক বিচার চলছে, তখন ভবিষ্যতের বিচার অপেক্ষের, এজাতীয় দুইএকটা উক্তি কি আমে যায়।

গল্প ও কবিতার বৈশিষ্ট্যের প্রশ্ন, উপস্থিত সমস্যা দূরে কি সরে, সেই প্রশ্ন যদি দিয়ে আসি, তাহলে বুঝতে পারব, গল্প বা কবিতায় কিছু কিছু বিষয় নিয়ে ভাববার জন্যে প্রচুর সময়ের আছে - কিন্তু তার ভবিষ্যৎ কেন্দ্রিক বর্তমান অবস্থায় বিশেষ সমাধানের ভাববার জন্যে তেমন কোনো সময়ই উপযোগ নয়। তাছাড়া, আমাদের আলোচ্য জিজ্ঞাসাটি নিয়ে অনেকে এগিয়ে যান, নিজস্ব যোগসূত্রের পরম্পরায় যাচিয়ে তেমে সাধন পান না। ফলে, অবলোচিত সূত্রগুলি সমস্যা জটিলতর হয়। এই সমস্যা মূলে দেখি, গল্প ও কবিতার প্রকৃতি-নির্ধারণে যে ক'জন তরুণ গল্পকারকে আমরা পাচ্ছি, তাঁদের অনেকেই খুব নির্ধারিত হয়েছেন। যথা, 'মাসপুত্র গল্পে'র তরুণতম লেখক অবলম্বন যা মনোযোগ যায়। অপেক্ষাকৃত বেশী প্যাডিমান চিত্র যোগান, অপোগণ্ডজীবন প্রক্রিয়ায় যা মূল্যবান দিয়াস, গ্রন্থ লেখা অথবা ইমানই কারণের অপোগ মূল্যায় লেখকগুলোকে ঠিক এই পর্যায়ে ফেলা চলেনা। এঁরা কাব্যধর্মী চিত্র গল্প ফুটিয়ে তুলতে পারেন কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। মনে হয়, চেষ্টা করেন না। হয়ত, জীবনদর্শনের সঙ্গে কবিতি নয় বলেই চেষ্টা করেন না। আবার, এমন দু-একজন লেখা খুব ভাল লাগে, যারা চাইলে গল্প বলতে পারেন—প্রেম-বিষয়ক, কিংবা পূর্ণচন্দ্রের ছবি, জ্যোৎস্নার মাত্রিক অবয়বটি বিচ্ছেদ ভাবে ফুটিয়ে দিতে পারেন—এঁরা কবি নন, কিন্তু অন্যবিধের কবি ভাবের অধিকারী—যথা, বীরেন্দ্র দত্ত, শচীন বিশ্বাস কিংবা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। বীরেন্দ্র দত্ত মূলত প্রেমের গল্প লেখক। অবশ্য আজকের আধুনিকতার সমাজের ভাবনার ঐতিহ্যে অথবা প্রেমের গল্পের যে আকাঙ্ক্ষা, যে ধরণের ভাবনার কথা, তা সবটা তাঁর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, বীরেন্দ্র দত্তের ভাবনের হচ্ছে না কেন, সে প্রশ্ন এখন নয়, এখানে কথা, তাঁর 'অধিক পরাগের গল্পগুলি কাব্যিক অনুভূতি-তে পরিপূর্ণ; তবে অধিকাংশ গল্পেরই শেষাংশে একটা বাস্ত 'দুঃ'—ক্লিষ্টোল-পরিবেশনা' একটি বাস্ত মুক্ত কাজ করায়, ভাবিলম্ব লাগে। তবে তাঁর 'অন্ধকার শোনিক' বাস্ত ও 'জীবাশ্ম' ধরণের গল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প কবিতার বৈভবাগে সমৃদ্ধ। বিশেষত সম্প্রতি প্রকাশিত, জীবাশ্ম ও জ্যোৎস্নায় দুটি প্রতিবেশী স্তরের যে বিপরীত ভাবনার, অনুভব বিধার কিংবা 'চন্দ্রর হাসির কথা দু' একটি জায়গায় ফুটিয়ে তুলেছেন—এমনকি অধিকাল জ্যোৎস্না ও জ্যোৎস্নাশ্রিত বীরিদ্যা ও প্রকৃতি'র রূপ-নির্মাণে অবতরণ তা সত্যসত্যই বীরেন্দ্র দত্তের নিজস্বই জ্যোৎস্না হয়ে ফুটেছে। তার চেয়েও গল্প ও কবিতে মিলিয়ে তরুতিষ্ঠিত রবীন্দ্র ও গল্পলেখক অনোনিবেশ করেন, বীরেন্দ্র দত্ত সেখানে জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্রীর কাছ থেকে বেরাই পান না। রবীন্দ্র ও গল্পে কবিতের কবিতের কাছ চিত্র চান—'আমার বসন্তের আকাশ' কিংবা 'বীন নিঃস্বাসে'—এই ধরণীরই প্রতিধ্বনি নয় কি? মূলত, রবীন্দ্র ভাবের সমস্যা, গল্প হেমনার পরিণাটি রূপ দেখার পূর্বমুহূর্তেই অমল আকাশ তথা ঈশ্বরের প্রতি কিংবা আমার অন্তরাল অনে ঈশ্বর কথার বর্ণালীতে—তাই গল্প কাব্যচিত্রা প্রধান পায়, কবিতা যেহেতু আবেগাত্মক নয় পাশেই, যেহেতু কিনি প্রকৃতি ভাবনার গল্পকে বিশ্বাস না রেখে পারেন না।

অবশ্যই এখন কথা বিশ্বাস আমিনা যে নানা ভাবে নানা রূপে গল্পের প্রতি অনোযোগী হয়ে উঠেছেন বলেই যেনো অস্বাভাবিক সমালোচনা দেখা যেতেনা। সমালোচনার সম্পর্কে কাজানাদুর সচেতন হাতে হবে।

ছোট গল্প কবিতা না হোক, কবিতার আত্মীয় হতে পারে। কিন্তু, হায়, এই আত্মীয় সকল দিনে যাওয়া কেন?

কবিতায় 'সদ্য ইটের মাথাখা' থেকে শিকিয়ে যেই যেই বলেছেন, Objective reality Social reality'র প্রতিচ্ছবি গল্প ও উপন্যাস স্পষ্ট। অথচ কবিতায় এসব সম্ভব নয়। কবিতা প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করে না। "আধুনিক গল্প উপন্যাসের একটা কথা আজ যে এসব কবিতায় আমাদানি এসেছে তার একটি কারণ অবশ্য এই যে অনেক গল্পকার ও ঔপন্যাসিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এবং সমাজ উন্নয়ন অনেক প্রশ্ন ও সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন না, যাদের লেখকের বিষয়বস্তু বলে ভাবতে পারছেন না।" এ চিন্তাধারা অবশ্য বেহিসাবিক। কবিতায় যেন গল্পের জো নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবগুলি তারিখ দিয়ে হবে। একটি ঐতিহাসিকতার পারিপ্রেক্ষিতে কবিতার আকৃতি হচ্ছে কিনা, তা না জানলেও চলে। কিন্তু গল্প যদি একটি মুহূর্তের না হোক, একটি দিনের মুহূর্তে যাওয়ার করতে চেয়ে কবিতা প্রতিম হয়ে ওঠে যায়, তবে সাহিত্যের এই কর্মিষ্ঠ প্রশাখার অবস্থানটা কোথায়? আজ সব কিছু যখন বেগা যাচ্ছে, এমন কি উপন্যাস খুবতী ও দুর্গম হয়, তখন গল্পের নিবিড় হয়ে বেগা-না-বেগার কিনার আলোচিত হবে কেন?

সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে, জটিলতর জীবনের মোকাবেলা আমাদের হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাবতীয় বাহ্যের ইতিবৃত্তি প্রয়োজন। কবিতাদের প্রয়োজনীয়তার দিকেও নজর রেখে এ উক্তি করা যায়। আমাদের হওয়ার পেছনে যাবতীয় সমৃদ্ধতি, প্রবাহাবরে, মনের গহনে দূর বেজাকেই ইঙ্গিত করছে। এ ইঙ্গিত কবিতার মনে ও ভাবের সহযোগিতায় হতে পারে। আমাদের দৃষ্টি আসে না, ছোঁয় পড়ে না জিজ্ঞাসায়। ফলে, ইহার ছোঁয় অনিচ্ছায় ছোঁয় এমন একটি মুহূর্ত আছে, যখন কবিতাকে গল্পের মন থেকে উঠার করা সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও উঠার করা উচিত নয়। গল্প কবিতার প্রভাব না হোক, ব্যবহার গল্পের কথা শরীর খুব কাছে এসে আসরা থাকলেও অবশ্য কিছু ঘটে না, তবে অবশ্য লেখকের এ পথে পা বাড়ানো অনুচিত। কবিতার মতে গল্প বলার এমন একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমের আছে, যা কবিতির গল্পকারের মনে ছোঁয়া না—যা ছোঁয়া বিশেষ করেও গল্প, তারো আগে কবি-প্রকাশের গল্পকারে। এর অর্থ, তবে কি শুধু কবিতার ভঙ্গি কথা না বলার গল্পের কথাকার বাহিত হবেন! কবিতার মতো, বহুরে ও কাব্যের, ইতিহাসকালের যে কত সুন্দর হতে পারে, সার্থক হতে পারে, তাহা বিশেষ মুখোপাধ্যায় বা সন্তোষ আসাদের গল্প পড়ে অনেকেরা, বুঝতে পারবেন। হয়ত আমাদের অনেকেরই শৈলেন্দুচিত 'দুপাদপাদির আত্মচরিত', 'ঔড়াচুরি' 'অবের পথ' কিংবা 'ছেলেরা উৎসবে' কিংবা 'বিজয় ছোঁয়' প্রভৃতি গল্পগুলি মনে ছোঁয়া যায় নি। বিশেষ অনেকেরই কাছে সেই অনন্ত গল্পকার মনে হয়েছে, যিনি গল্পে অবাধ পুরিয়ে মেন কাব্যাকারের আলিঙ্গনে এক কবিতার চিত্রকল্প ও কবিতার পুরিবীকে গাছিয়ে মেন গল্পের সংসারে। গল্প ও কবিতা পাশাপাশি থাকলে মেমন গায় ছন্দ বা বিশেষ নাও আসতে পারে, তার স্পষ্ট অবশ্য সাম্প্রতিক কুচে, বিশেষ উপন্যাসের সঙ্গে তাদের তুলনা করতে চেয়েছেন।

কৌতূহলী পাঠকের হয়ত মনে আছে গল্পের উপন্যাস আলো মেলার হাতী পেয়ারা' বা 'ধারালো নখর অন্ধকারে'-র কতকগুলি অনুচ্ছেদ—যা আপাতভাবে গদ্যিতে লিখে হলো আধুনিক কবিতা হতে পারে। আমরা বিশেষ নিশ্চয়ই গল্পের সঙ্গে কোনোপ্রকার তুলনা করতে চাইব না। তাহাতে তুলনার অবশ্য বিস্তর রয়েছে। তবু যদি আমাদেরকে গল্পের কারণ নাম করতে হয়, তবে গায় লক্ষে ছবি উল্লেখ করাই ভালো। সাধুক ও সাধুরা এক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্ত পারে। বিশেষ প্রায় প্রত্যেক গল্পের অনেকগুলি অনুচ্ছেদই মনে হবে নিটোল কবিতা। তাঁর গল্পের ধর্ম এর অতীত সমস্যা। বিশেষ এক-একটা মোটা শরীরটাই কবিতা দিয়ে কথনো আমাদো মনে হলেও আপনার কোনো কারণ নেই। এর ফলে, গল্প লেখার অবস্থা খুব হয়েছে, একথা অনুমান আমারও কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে অনুমান নিশ্চয়তার কথা যায়, কুশলী পাঠকমাত্রই কাছে বিশেষ বিচার লেখক অনুচ্ছ পাঠকমাত্রীর কাছে তিনি বীতশ্রদ্ধ থাকবেন।

গল্প ও কবিতা পাশাপাশি রেখে কত সহজে গল্পে কবিতার ব্যঞ্জনা কবিতায় গদ্যের syntax প্রয়োগ ইত্যাদি সাম্প্রতিক ছোট পত্র আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এবং এই সংযোজনের কৃতিত্ব বিনয়ী বিনেন্দু দাবী করতে পারেন। 'বিষয় থেকে' গল্পটির আংশিকের উল্লেখ করে বক্তব্যটি স্পষ্টতর করা যায়—

ওজনারি! ওজনারি যে আমার চৌদ্দি লাগল,
হারেবারি, জিনার!
জিনার দিনারেট; কাল দেখা হবে, ধরত! জিনার,
জেমসবন্ড, জিনার,
কাল দেখা হবে।

কাল আবার সেই এক জায়গায় দেখা হবে—সমুদ্রের তীরে, বিবিসি পরা ঐ মেয়েটির (কি যেন নাম পাপে।
ওজনারি যে আমার ফাগুনহরের ঘুড়ি
ওজনারি, যে আমার জানালার পাশে বকুল গাছ
জানালার বাইরে গভির আকাশ জিনার
এক নাবির মতো জিনার।

না, আর কিছুই হবেকার হবে না—ঐ তো দূর আকাশে ভরদিনের মতো,
সে আমাদের গভির ঘুমের লাস্যময়ী পার হয়ে এলো হাইড্রোজেনের জলে উপত্ত মাথা ঘুরি একাকার!
সে বোঝালের মতো লাফ দিয়ে
অনেক আচমকা পার হচ্ছে।
এখন সে সবুজ।

অথবা, আরো তীব্র উজ্জিত সেই উঁচু অংশটা—
আমি আমি ভাবনা চিন্তা করার সময় আর আছই আছে।
কালো এক নদীর মতো তুমি ঘুমের স্রোত ফুলে ফেঁপে কেঁপে উঠছে শাকো। তোমার ঘুম আমার হাতাকে
ভাসিয়ে নিয়ে গেল।
হারাহীন
আমি আকাশে বিনেন্দুর একা ভাসিয়ে দেখছি গভের তলায় অনুরে তোমার নিশ্চিন্ত নিবন্ধার ঘুমের
স্রোত।

বস্তুত, চারা লাইনগুলি, কেবল জেরে জেরে সাজিয়ে নিয়েছি। যুদ্ধির যে কোনোটিকে কবিতা পত্রিকায়, বিজ্ঞাপন কবিতা হিসেই ছাপানো যেতে পারে। খুব আমার আমে লেখক যে বিশ্লেষণের অবিমুখী যে অনিবার্য সত্যতা দেখিয়েছেন, এবে আমার বক্তব্যের ভূমিকা বলে অনুমান হবে না। বিনেন্দুর এ যাবত যত গল্প প্রকাশিত হয়েছে, তার কেবল 'অবর পর' অংশটুকু ছাড়া সেগুলি—অনুমান প্রতিটি সমালোচকই এই গল্পটিকে বাংলার গল্প বলবেন না; বিশেষত, গল্পের যে তিনটি ধারা খুব ঘিরে ঘুরে ঘিরে উদ্ভাসিত হয়েছে—"আমার ধারা নিয়েছিল বিদেশে, মোকদমা করতে যা নিয়েছিল পাহাড়ে পাতা ফুরোতে। কেউই আর ফিরিল না।" ঘুমের কথা ও কথকথা ও কথার কথা আরো যেভাবে অবাধ অবিরল হয়ে ধরা যেত এবং আমার অন্তরালে ধারা যায়, ঠিক অনুরূপ বিনেন্দুর 'অবর পর' বা 'বিষয় থেকে' ছাড়াও বহু গল্প ধারা যেতে পারে। বিনেন্দু-সমালোচনার একজন সমালোচক কোনো এক প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছিলেন—মোটামুটি কথাবিমুখি কথাসর্বস্বতা নয়। কথা যদি গল্পের অন্তর্ধারার ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে না পারে, তবে সে কথা বিদ্রূপ কথাই বলে হবে। বিনেন্দুর গল্পগুলি পাঠ করে আমরা জানি তাঁর গল্পে যে প্রতীতী জাগানো, একটি নিপুণ সুচারু ব্যঞ্জনাময়ী তৎপরতা, এগুলি গল্পকে কথাশিল্পের স্তরে পৌঁছে দিতে জানে। কিন্তু এ পর্যন্ত বলেই যদি বিনেন্দু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম, তা হলে সুখের হতো। সাহিত্য পাঠক হিসেবে আমাদের ক্ষুধার বাড়ছে না, বিনেন্দুর কিছু গল্প নিয়ে নিরিখে তর্ক প্রতিক্রিয়। মনে হচ্ছে পূর্বতন কিছু সুগঠিত গল্পের সাহায্যের সুযোগটুকু তিনি গ্রহণ করতে চাইছেন বলেই এ তর্কবিতর্ক। প্রথমত, তিনি আরম্ভে লেখক, দ্বিতীয়ত তাঁর গল্পে যাদু অভিনয়ের সূক্ষ্মতার প্রায়ুর্ণ। সামগ্রিক অর্থেই গল্পের বিষয় প্রয়োজনার হালেকিল প্রতিবেদিক সমস্যা ও দুরহ খবরা তাঁর গল্পকে মোটুন কোনো প্রাঙ্গণে বা লোকালয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। 'আমি ঘুমে' বা 'ঘিরে ঘুমের' প্রভৃতি অবশ্য পড়ে Sentimentএর নিকৃষ্টির গল্পের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। 'গল্প প্রবাহ'-ভারিকা বিনেন্দু অবের 'ঘুমাবে' এবে যে চরিত্রবৈচিত্র্য উপাদানের আবহাওয়া ও পরিবেশ মহিমা পাওয়া যায় তা' বিনেন্দুর নানা গল্পে (যথা, 'স্রোত' 'কার্তিকের' 'বিনোবিন্দু') তেমন খেন পাওয়া যায় না? প্রথমত, 'বিমল কর' বিনেন্দুকে নিশ্চিন্ত ভাবে আমার করে নেবেছেন,

দ্বিতীয়ত, অক্লিষ্ট জীবনরস ও যৌবনের সুস্থ যে পরিমাণ vitality থাকা দরকার—তা দ্বিজেন্দুর নেই, মনে হয়, এবিষয়ের অধীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেকেলে যুগের অধিকতর কবিরা দাবী করতে পারেন। 'চর্যাপদের হরিণী' বা 'অযোধ্যের যোদ্ধা' গল্পগ্রন্থ-রচয়িতা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভূতি বিলাস, প্রায়-পূর্ণ নিরসন হলেও উচ্চশিরে গ্রন্থ মুক্তিতে দ্বিজেন্দু অপেক্ষা উজ্জ্বলতর সফলতার মালিকানা দেখিয়েছেন - যা ভাষাজ্ঞান ও গল্পকথন ও গল্প বলার ক্রমে অন্যতম দ্রাক্ষিনের আকৃতি ধারণ করেছে। সেকেলে যার বা অধীন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনটুইশানাল এ্যাপিরিয়েন্সের ব্যবহার সহজেই গোপন রাখবার একলা উপক্রমণ করতে পারেছেন, কিন্তু হালফিলে দ্বিজেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ইদানীং কৌতুক, অন্যতম দুর্লক্ষণ। 'মেঘ দেখা' প্রসঙ্গে 'আওরঙ্গজেব ও প্রতাপীর ছায়া' শীর্ষক অধিকাংশীর গল্পের অনুজ দ্বিজেন্দু সত্তার আবেদনের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হয়েছেন। —"লেখার ব্যাপারে আমি নিজের মধ্যে vitality'র অভাব টের পাই। Vital হচ্ছে, সেই জন যে জন খুব বেশী কাজ করতে পারে এবং যে জীবনের কোনো অংশ থেকেই কিছু না কিছু আহরণ না করে ছাড়ে না।" কিন্তু এক্ষেত্রে অধীন বা সেকেলেবাবু বক্তব্যানি শক্তির আধারকারী হতে পারেন বা পারছেন না বলে ইদানীং তাঁর গল্পের গভীরতির কবোষ্ণ দৃষ্টিকে নিজের উত্তাপে পালিত করতে পারছে না। ফলে গল্প না হচ্ছে ভাষাকুল। যোগ্য প্রতীক, না হচ্ছে গল্পজনের মন প্রতিদ্বন্দ্ব। মনে হয় 'দুঃখলতা' অধীন উপন্যাসে যে পরিমাণ পরিমার্জন ও নিজ ভাষিত হয়েছে তার অনুপাতে সাফল্য নামমাত্র; দ্বিজেন্দুর ইদানীং প্রকাশিত গল্পের দার্ঢ্যতা সত্ত্বেও বলা যায়েই তিনি অধিকতর ফলী হতে পারবেন, আমার অনুযোগী না হওয়াই তার পক্ষে অভিপ্রেত।

দ্বিজেন্দু গল্প কবিতার চরিত্র ও মেজাজ পরিবেশনে উপায় বোধ করেন, ঠিক তেমনটি না হলেও শক্তিমান বন্দ্যোপাধ্যায় যে পথ সম্প্রতি কোনো একটি গল্পে অবলম্বন করেছেন, তা বহু দূরে উপক্রমণ করেছি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে। শক্তি'র গল্প দুরন্তরাগ নয়, মৃদুল কর্ষণ ও মার্জন। দুর্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পরীতিতে যে-প্রসাদ-আবহাওয়ার সর্বে নৈপুণ্যতা—শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গল্পরীতি ক্ষেত্রে বিরল লাবণ্য দিগন্তরাল। অন্যদিকে, শক্তিতে বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অধীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন যে সুস্থ মানবতা রয়েছে তা-ও শক্তির গল্পে নেই। তবু শক্তি চট্টোপাধ্যায় অনবদ্যকার কবি (ও সম্প্রতি বিবাহিত কবি) বলেই তাঁর চিত্রাবলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দাবী থাকে। দুই হাতের জল হাওয়াকে মুঠে লালন করেও অধীনের গল্পের মতন শক্তির কাছে হৃদয়ের স্পর্শ আছে—প্রকৃতি সম্পর্কে মুকুলেরই নিরবধির কাজলা নেই। তবে গল্প বলার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তেমন সাফল্য আসে না, তাঁর গল্পকে তিনি 'উপন্যাস চিত্রের কলম' রূপে ব্যবহার করেন। একথা তিনি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন। শক্তির বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্নি' ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'দুঃখলতার আরম্ভ'—গল্প দুটিতেই আঙ্গিকগত কলকৌশল কেউই মনোযোগ দেন নি। শক্তি'র 'উটের গ্রীবা' বা 'অবন্তিসেনাবী'-তে কবি সুলভ বিচিত্র অনুভূতি প্রয়োগের ক্ষেত্র পেলেও সার্থ, কিন্তু জীবন-ঘনায় কোনোপ্রকার—'দুঃখলতার আরম্ভের' মতন কোনো আস্থি ভাব নেই। গল্পের প্রয়োজনে, এখানে যে কবিতাটি তিনি ব্যবহার করেছেন, তা গল্পকে হারিয়ে দেয়, কবিতার অনুভব সুখ ভাবৌদ্রি ও অন্ধকার মিলে মিশে গল্পকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। গল্পের সঙ্গে কবিতাটি অন্তরঙ্গতা রক্ষিয়ে থাকা সত্ত্বেও এই বিশেষ গল্পকে মাটি করে দিয়েছে। শুধু কবিতাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কবিতাটি পরবর্তীকালে কোনো কবি কর্তৃক সম্পাদিত একটি গদ্য সংকলনে স্থান পাওয়ায় 'তার সম্পূর্ণ পদ্যটি ব্যবহার করা ভুল হয়েছে' মনে করছি। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্নি' গল্পে কবিতার টুকরো টুকরো কথায় পরিবেশন গল্পে জমাট বিভিন্ন জায়গায়, সমস্তোচ্চারণে ব্যবহৃত হোয়ার। 'অগ্নি' গল্পে গল্প ও কাব্য পাশাপাশি উপন্যাসের প্রয়োগ সহজ গল্প অগ্নি আছে মনে হলেও, মনে হয়নি গল্প প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে ছোটগল্পের কবিতার মৌমাছিকে, নিতান্তই ইয়াকি'র মাঝখান। অথচ 'জীবনানন্দ জীবনাবলী'র গল্পে দক্ষিণেশ চট্টোপাধ্যায় জীবনানন্দ রাগের কবিতাগুলি উদ্ধার করলেও তাঁর গল্প একবারি বিচ্ছিন্ন হোয়া করে নি। "আকৃতি" নামক কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'দুঃখলতা

আজকের 'সমীক্ষা' গল্প সাধনা'কে প্রথম প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কবিতাটি অনেকের কাছে কবিতিত নয় বলেই উদ্ধৃত করছি —

মহীনের ঘোড়াগুলি মহিনের ঘরে ফেরে নাই
উহারা ফেরার পার্শ্বে চরিতেছে, লাল ফেরারে
ঘোড়াগুলি অন্ধকার উহাদের নক্ষত্রে ছুটিছে।
কালের ঘটনা মতো ঐ ঘোড়াগুলি ফেরাগুলি
অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে কালপুরী সূর্যের মতন
চলিয়া বেড়ায় ওরা, কথা কয়, কী কথা কে জানে?
মানুষের কাছে আর ফিরিবে না, এরো মনে হয়
এমনও হয় কথা মনে হয়, তবু প্রকাশে পারি না।
ঘাইগুলি ফেরা কি তবে ফেরা নয়; সমুদ্র পক্ষীও
হতে পারে এই ঘোর সাদৃশ্যিক জ্যোৎস্নার ফেরারে
মানুষের বিষয়তা বহে নেয় ওরি নাসিকেত
ওরি চলচ্ছবিগুলি লাখোরে লাখোরে চলে,—
ওরি মহীনের ঘোড়া? ওরি ফেরা নয় আকাশের?
অলৌকিকতার কাছে সকলেই আকৃতি করে দান।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবনকে যে বিশ্বয়ের মুখোমুখি দেখতে চেয়েছেন, সেই সন্ধানটি লক্ষণীয় বিষয়; কিন্তু যখনই তিনি এই প্রশ্ন করেছেন - কে বলবে? কে ফেরাগুলি? কে ঘোড়াগুলি? তখনই অমনি সব ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তবুও; ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রবন্ধেরই আর অপরিহার্য নয়, তা তিনি গল্পটি লেখার সময় ভুলে গেছেন। ফলে, তাঁর মনে হয়েছে—"বিজ্ঞান কথা বিশদ করেই বোঝা যেতে থাকল না।" আমরা তার মনে হয়েছে, ওই ঘোড়াগুলি ফেরাগুলি মহীনের না; আমাদের মনে হয়েছে, এসবই জীবানন্দ দাসের - যেন তাঁর বলবার জো, তাঁর অনন্ত নক্ষত্র যাঁদি। জীবানন্দের প্রভাব সত্ত্বেও শক্তির কবিতা-গল্পের, গল্পকার শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে গভীর ভাবে না, অতে মুগ্ধিল হয়। একজন গল্পকার বলেছেন - "কাঁটাতারের আলাদা আলাদা গল্প নিয়ে গল্প লেখা যায় না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখলে বরং পড়তে রাজী আছি, গল্পটল্প নেব।" আর, গল্প ও কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের তাঁর পাঠক হওয়া যে আমাদের কালের আত্মবাসিক ব্যাপার।

৪৫৪

গল্প লেখকের সততা গল্পকারের মাঝিয়ে সর্বাংশে না এর কিছুটা যেন কিছু মাত্রিয়ন্ত্রে ও কর্মব্যস্ততে থাকা উচিত বলেই মনে করি। স্বচ্ছতি ও বলবোধসম্পন্ন পাঠকই বুঝতে পারবেন, লেখকের ভোজনে মাত্র লেখার কাজ করছে কিনা। সন্ধ্যা নাম বিনে লেখার সুযোগ আত্মপ্রত্যয়হীন লেখকের কাছে দোহাই চেয়ে যাওয়া। এজাতীয় লেখা গল্পকারের আত্মজন মৃত্যু হলেই পাঠকের স্মরণীয় না হয়ে চলে না।

অবশ্য, গল্প ও কবিতার বিধিবদ্ধ সূচি, সূত্রিসঙ্গত নয়। যাঁরা এই আলোকপাতে হাত বেলাতে চান, তাঁরা অবশ্যই এগিয়ে আসবেন. তাঁদের ব্যাখ্যাকে attitude-কে মনে পালন করা উচিত কি? অবশ্যাভাবী সমস্যাকে বিচার করতে করতে যাঁরা আপন আলোয় শিল্পিতাকে শিল্পকর্মকে উজ্জ্বলিত ও উদ্ভাসিত করে তুলতে চান, তাঁদের মনে রাখা উচিত, তাত্ত্বিকতা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কী হবার হইলেই হবার মতো হওয়া।

গল্প-কবিতা বা গল্প কবিতার মধ্যে ঢুকিয়ে তুল দেবার কালে আলোচনা অনেকই হয়েছে। আলোচ্য বক্তব্য স্মরণে রেখেই আমরা জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করছি না যে, আজকের গল্প-পাঠের গল্প-কবিতার ভাবনা একদিকে সমস্যাসঙ্কুল হলেও অন্যদিকে এই প্রকরণকে আনন্দদায়ক। এর ফলে, এক ধরণের বিশিষ্ট শিল্পসুষমা সম্পন্ন গল্পের প্রবলতা চোখে পড়ে। ছোট গল্প ও কবিতার আন্তরিকতা সম্পর্কে আমরা সচেতন ও তার প্রতি কোন প্রতিশ্রুতিরও বিধিক ঘটিয়া সম্পর্কে বিমাত্র নই। তবু আজো গল্প দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন ওঠে; যা কবিতার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই সমস্যা রূপ ধারণ করেছে; আমাদের এই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে এটুকুই বলা যায় যেখানেও প্রশ্নটা অন্যভাবে করা যায়। গল্প কবিতার আবির্ভাবে কবিতের প্রশ্নটাই দুর্বোধ্যতার মূল সূত্র। এবং গল্প ও কবিতার যেন বলবে যাঁরা বলা, তাঁরাই নাকি গল্পকেত্রে একমাত্র দায়ী। এজাতীয় ভিত্তিহীন মন্তব্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও অপপ্রচারে উৎসাহিত হওয়া মুস্কিল, তাঁদের বক্তব্য এখানে দর্শাতে পারছেন না। এবং পারবেনও না, তাদের অতীত ধারণায় ফোনো যুক্তি

যাবে না। অবশ্য এ পরীক্ষায় যা এই বিশেষ বছরে শিল্প-সম্পদে কি কোনো অবদান পরিলক্ষিত হয়েছে না? হয়েছে, সে কথা তো পূর্বেই বিশেষ করা হয়েছে। অনেকটা প্রয়োগমূলক পরীক্ষা অনেকে করতে চেয়েছেন, তাই মার্জনা হয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস হলে একটি বিষয়ে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে। সেটি হলো ঐ উচ্চশিক্ষিত প্রয়োগমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরীক্ষাগার দিক প্রয়োগ ও প্রকাশ বিষয়ে পারলে গল্প ও কবিতার বৈচিত্র্য আমাদের সার্থক গবেষণা ও চর্চা করা সম্ভব হবে। বিশিষ্ট গ্রাফ গল্পকার যেমন যার এই আলোচনা পড়লেন আমরা। যা ভুলিয়ে ভুলতে হবে, তাতে শিল্প প্রয়োগ থাকা চাই—এটাই তার ধর্ম ও সাধনা। অবশ্য সাধারণের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যেমন আমরা তো গল্প ও আখ্যান কত বস্তু সম্ভার সাজিয়ে বিষয়ে তাকে ভিন্নে অনুপম করে তুলেছেন।

মানুষের বোধ যত বাড়ছে, ভুলা তত বাড়ছে। ঈশ্বরের মূল্যবোধও তাতে তাতে নোতুন রূপ পাচ্ছে, নোতুন রূপকল্পের মূলমন্ত্রে রূপায়িত হয়ে উঠছে। মানুষের 'ঈশ্বর' তেমন রূপ পাচ্ছে মানবিক ঐশ্বর্যে, আত্মার প্রকাশ আত্মবত ও আত্মীয়তার সংযোগের সর্বজনীনতায় হয়ে নোতুন অর্থের দাবী করছে। গল্প সাহিত্যে বিশেষত গল্প ও কবিতার বৈচিত্র্যিক পর্যালোচনায় যেমন এবার একটি গল্প 'পায়ে পায়ে' মূল্যায়ন ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে—

"বিকেলের আলোয় হঠাৎ তার মন বলল
'উড়তে পারো?'
'কি?'
'তার পাখনা।'
'তার?'

যাকে তুমি আর আমি সৃষ্টি করেছি, সেই মোটা আর বাহুটার, সে বজ্রবিদ্যুৎ বাড়ি বাঁশিয়ে আসছে যো—আমরা ঈশ্বর-ঈশ্বরী, সেও ঈশ্বর হবে—আমাদের সেই বাহুটা ঈশ্বর হবে, ঈশ্বর হবে, ঈশ্বর হবে।"

এই প্রকার প্রয়োগের সূত্রে অর্জন করা যেতে পারে। যারা অর্জন করতে পারেন নি, অবশ্য প্রেরণা করেছেন, তাঁদের প্রেরণাটুকু তো বহুত প্রশংসনীয়। অবশ্য অভিজ্ঞান থেকে অনেক সময়ই শিল্প রচিত হতে পারে। শিল্প-পরিমণ্ডলে অবশ্যই সম্ভব। তবে এ বিষয়ে সচেতন থাকতেই হবে, ছোট গল্প ও কবিতার বৈচিত্র্যিক যেহেতু এটি নিশ্চয়ই দীর্ঘ পথ, যেহেতু প্রয়োগের ছাঁচ তাতে পারে।

"আধ্যাত্মিকতা"

বিমলাশ ভট্টাচার্য্য
এম এস, অর্থনীতির বিভাগ।

আধ্যাত্মিকতার যুগ। যৌবন প্রত্যুষে সব কিছু ঘিরে—সমাজ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে, সৃষ্টি সম্পর্কে। যা কিছু 'যুক্তির আওতায় পড়বে না' তা বাতিল করতে দ্বিধা সংকোচ। আমাদের বেলায় হবে "বৈজ্ঞানিক", তাঁর হবে "অবিশ্বিকতা"। "আধ্যাত্মিকতা" অতি ব্যবহৃত পচা একটা প্রত্যয়। এ নিয়ে কোন কথাই আজ উঠতে পারে না। উচিত-ই নয়।

কিন্তু সত্যি কথা প্রায়ই অপ্রিয় হয়। আমরা "আধ্যাত্মিকতা"র প্রসঙ্গ উঠলে যে ভাবে বৈজ্ঞানিক মেজাজের "ওজনদার" কিছুকে খাটো করে দেখার কথায় "বৈজ্ঞানিক"-মেজাজ-টিকে সরে বসতে বলি। এর কারণ কি? কারণ আধ্যাত্মিক মতাদর্শ যে, আমাদের সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা দেয়, "আধ্যাত্ম" বিষয় বিশ্বাস হতে উপলব্ধি দেয়; আর বাস্তব ধারণা দেয় মোটেই সুবিধার নয়! এও এক ধরণের "Individual Pragmatism"। "ব্যক্তিগত প্রয়োগবাদ।"

হ'তে পারে' আধ্যাত্মিক মতাদর্শের শিক্ষণে যে দর্শন আছে তা সার' কিন্তু "মতাদর্শটি কি "দৈনন্দিন জীবন-আদর্শের সঙ্গে "সমাধানবান" নয়? এর উত্তরে পারে—যে "আদর্শের শিক্ষণে আছে "আজ যুক্তি" যে আদর্শ তত্ত্বটা বিশ্লেষণের, করটা ব্যবহার।

কিন্তু আমার মনে হয় এখানেই আমাদের ভুল রয়েছে। যুক্তিবিচার করে কখনও কিছু গড়া যায় না। "অনুভূতি"-ই জন্ম দেয়। "অনুভূতি" "Intuition" অর্থে ব্যবহার করছি। যুক্তি বিচার করে আমরা জীবন সম্পর্কে কিছু "অপারেশনাল থাউট" আনতে পারি কিন্তু বোধির মাধ্যমেই জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারি।

বাঁরি বের্গসন (কোন-ও কোন-ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভলতেয়ার বের্গসন-ই উপযুক্ত হবেন।) যা বের্গসন বলেছেন—

"There are two profoundly different ways of knowing a thing. The first one implies that we move round the object; the second that we enter into it." (Bergson, An introduction to Metaphysics; Trans. T. E. Hulme) এই বিভীষ পদ্ধতি হ'ল "প্রজ্ঞা"। [১]

কিংবা অস্তিত্ববাদীদের (Existentialist) মত বলা যায় "মানুষ"-কে কখনও পুরোপুরিভাবে যুক্তির কাঠামোয় সাজানো যায় না; তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে', যে "মানুষ" "তথা"-কে যৌক্তিক প্রত্যয়গুলোর কাঠামোয়ভুক্ত মুক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছিনা' তা আমাদের ব্যবহৃত যৌক্তিক প্রত্যয়গুলির সঙ্গে বিরোধী!' কিন্তু কথা উঠতে পারে যে সব কথা ঐ "প্রত্যয় যোজিত" কথা কোন কোনটির সঙ্গে অসঙ্গতি প্রদর্শন করছে তখন ঐ কথা-কে কি বাতিল করব? কিংবা ব্যাপকতর প্রত্যয় যোজিত (System of Concepts) সন্ধান করব? দ্বিতীয় পথই গ্রহণযোগ্য; তবে ঐ বিভিন্ন কথা সম্পর্কে যৌক্তিক পর্যালোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করার পর।

আমি প্রথমে বের্গসনের উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি যে বের্গসনের কথা উল্লেখ করায় বাস্তবপন্থীরা এবং তাঁরা নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivists) তাঁরা হাসবেন।

কিন্তু এখন প্রশ্নটি আমার একটি কথা মনে পড়ছে।

ভক্ত যেন প্রতিমাকে দিয়ে "অলঙ্ক মেয়ে" আনিয়ে

আছেন। তাঁর চোখ দিয়ে "দূরদৃষ্টি" ঝরে পড়ছে। মানবিক ভাবনের ভবিষ্যৎটিকে দিশা দিতে হবে। তিনি প্রতিষ্ঠাটি ভাবলেন এবং ভবিষ্যৎ বেশাদের 'এই বেশ' বা বেশ তুমি বিমুগ্ধ হ'য়ে নিরীক্ষণে থাক অথবা শুধু আছে মাটি, তাই আর বড় 'আর হয়'। ভক্ত বলবের তাই চোখের শুধু ইন্দ্রিয়-ই আছে; অন্তর্দৃষ্টি থাকলে শুধু মাটি আর বড় দেখতে না' প্রাণেরও স্পর্শ পেতে।

এবার "ধর্ম" বা "অধ্যাত্মিকতা" অনেকেরই কাছে ভোগ ব'লে মনে হবে। কিন্তু এবার "ধর্ম" তার নিজেই চলবে যতদিন মানুষ "Intellectual Security" বা "মৌলিক নিরাপত্তা" পাচ্ছে। কিংবা' যতদিন না তারা বুঝতে পারছে—পুরো ব্যাপারটাই (নিরাপত্তা বোধ) "অর্থহীন"।

লাইফ-ইন্সুরেন্সটাই প্রাথমিক। তার থেকেই এসেছে এই আপেক্ষিক নিরাপত্তা বোধ।

এবার একটা ছোট কিন্তু প্রাথমিক প্রশ্ন তুলে আলোচনা শেষ করব। আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানবিক বিকৃতি থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা "আধ্যাত্মিকতা"কে বর্জন করতে চাই?

এর কারণ কি' আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে "অধ্যাত্মবাদে"র অনিবার্য অস্তিত্ব—যা বিনা "বৈজ্ঞানিক মেজাজ" গড়ে তোলার পরিপন্থী।

কিংবা "আধ্যাত্মিকতা" রাখতে গেলে একজন বৈজ্ঞানিক পুরোপুরি মানুষ আর একজন প্রয়োজন?

"অধ্যাত্মবাদ" বা "ভাববাদ" "ঈশ্বরাদ ব্যবস্থায়" প্রভৃতি থেকে এসেছে। একথা আজকের দিনে অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তথা হ'ল মানবিক গুণ অর্জনে উপর কোনও উপায়ে "আধ্যাত্মিক ছাপ" পড়ে গিয়ে ব্যাপারটা জটিল হয়ে গিয়েছে। তার উপর আমাদের বেলায় এখন-ও "Authoritarian", তাতেই ধর্মীয় মেজাজের মানবিক গুণ অর্জনে তাঁদের ধর্মীয়-সাধনার কল হিসেবেই (যেমন তাঁরা প্রায়ই বলেছেন) না হয়ে পারে না।

বৈজ্ঞানিক চেতনার সাধুতা কি এরাই প্রয়োজন। এ প্রশ্ন "ভাববাদীরা"ই বেশি বেশি উঠিয়ে থাকেন। তাতেই এ প্রশ্ন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ'ল—"যাঁরা বৈজ্ঞানিক মেজাজের সাধক' তাঁরা কি আমাদের মতই ঈশ্বর-চিন্তিত হন? বিশ্বের মত "অতি-মাত্র বস্তু" সমস্ত জেনে সবই বিশ্লেষে নিতে পারেন কি? তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান এখন অনেক সম্পূর্ণ, সেটি সম্পর্কে যে ব্যাপক সিদ্ধান্ত তা খুব নিশ্চিত নয়। "বিশ্বিত" প্রবাদটি মত অর্থহীনই প্রমাণ করা হ'ক না কেন' বিশ্বিত হবার আজি কখনও যাবে না।

কিন্তু "অধ্যাত্ম-সাধক" যাঁরা তাঁদের কাছেই মানুষ "নিরাপত্তার" আশ্বাস পায়, সে নিরাপত্তা তাদের "মানসিক জীবনে।"

কথা হ'ল—বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে "সর্বজনীন"-এর মূল্য অবশ্যই; কিন্তু সমাজ-এ যেদিন 'বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার হবে' সেদিন "সর্বজনীনের সে মাহাত্ম্য কি থাকবে? মনে হয় থাকবে না।

কিন্তু তখন কি "আধ্যাত্মিকতা" বা সংশ্লিষ্ট মানবিক মূল্যবোধ-গুলো নিয়ে বৈধী, থাকবে না? আমার মনে হয়—থাকবে। তবে বৈজ্ঞানিক সমাজ-ব্যবস্থায় "প্রতিটি মানুষই হবে কম-বেশী ঈশ্বরবিশ্বের কথায়, "আধ্যাত্মিক"। আর জীবন-বোধ যেখানে খুব বেশিরে "Intellectual Security"-ও থাকবে। অন্তত: আমরা আশাবাদী হ'তে পারি।

দুর্মুখের অপলাপ

শেখ সাদের জালি
এম এ—বাংলা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত বৃটেন ইংরেজ কবি এলান্ সুইন অধিবেশন সংসদের বাড়ী দিনে একবার হওয়া করেছিলেন : সমাজের চেহারায় বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কথা বহু অনেক। সে বক্তব্যের বোধহয়ই আজো সেটি অপরিমান। সুতরাং আলোচ্যমান বক্তব্যে দু'চারটে বেরিয়ে করা যদি হলেও মেলি পাঠক-পাঠিকারা নিজ গুণে মার্জনা করে নেবেন আশা করছি।

অতঃ কথারম্ভ। সে ছিল এক দেশ। নিজ অধিবাসীদের তার নামটা বলা বোধ করি, নিষ্প্রয়োজন। অনেক আজ আর অভিজিৎদের বিনিময়ে লাল চামড়া ওয়ালাদের হাত থেকে সে দেশের স্বাধীনতা এক রকম এলো; কিন্তু স্বরাজলাভে অমায়ুষ হয়ে তাঁর প্রবক্তা প্রায় দুই যুগ পরেও নিজের উঠলো না। রাজনৈতিক মানে 'পোড়া মার্কিন' হজমাদের কপালে ঘুটন ঘটে, কিন্তু ইতিহাস আর ঘার্থবুদ্ধির সঙ্গে পাঁরিচয়টা গভীর গভীর ছিল বলে 'ডভিনেটের আতঙ্ক' আর বিচল না। অর্থাৎ সত্যাগ্রহ স্বাধীনতা যারা অধিকারে এরেই বেহ। অথচ আমাদের 'যখন কি' দেখিকে না তাকিয়ে অথবা 'কি হয়ে ছাড়বো' সেই ধ্যান নিয়েই গণপতির তারাও দেশ-বিদেশে এগার বাড়ি বাজালেন। এ যেন সেই 'এঁড়ে গরু, না টেনে দো'-র মতোগোল। গণপতির শ্রী কেবাতে মানে শ্রী যোগমার্গে এলো সমাজতন্ত্র, সমাজবাদ সাম্যবাদ এবং আরো কত তন্ত্র আর বাদের সাম্যোপাধ্যায়। কিন্তু হায় হায়, এরো ভরেও হাসে পানি পাওয়া যেল না। কারবারে আসীন গাছীর মুসলীমা বিশ বাইশ বছর ধরে প্রতিকৃতি হওয়ার যে বাসনা মোহনের তাকে তালে তখন যে কতটুকু দিচ্ছে বিশ্বকর্মের একথা বলবার প্রয়োজন আর বাকি না। অন্যদিকে গরীবদের ঘর-বাড়ি ধরে যারা কবির মানে স্বরাজের বিরোধী দলগুলির অবস্থাও ভালো ভালো করে দেখুন যেনোর মার কাছে, আর যেনোর না ধরে' —ইত্যাদির মতো। এদের হাল-চা ছোড়ার যখন আর বক্তব্যের ওলরাবি নেই 'সে যদি বিদায় নিয়া যে ঘরে বিদায়' বাস তখনকার এই প্রবাদবাক্যটি বারেবার মনে পড়ে যায়। 'দেশের লাটি এদের বোঝা' এই আপ্তবাক্য অক্ষরশঃ ফলে ফাঁসির রশায় লটকে মরতে হবে গণপতির লাবিধানে আর যাই থাক অন্তত এমন কথা লেখা ছিল না। কিন্তু বাস্তবীভবনা এই বিশ বছর ধরে এত হজমা যেমন যেমন সেই আপ্তবাক্যের ইতো বেরুবে চলবার জন্য বিপুর বাইরে গেছেছে। ফলে, অতি বড় সংখ্যাতত্ত্ববিদরাও গণপতির রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ঠিক ঠাক গুণে উঠতে পারবেন কিনা তে জানে। এ ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দিয়ে রেখেছে বোধ হয় বঙ্গী-বিহারের লোক যারা আলো মানে না তারাই। ও ঝিঁকে মেরে, ওর সঙ্গে চলবে না—অবশ্য এরা হত। কিংবা ও অমুকার ধরম, ওর সঙ্গে মেল পটে না · সুতরাং আমো ধরম হত। সকলের মাঝে এই ধরনা ধরম ফতোয়াবি সইবে সে বিচারের ভাষায় মাঝে মুক্তো কাঁটা। ধর্মনিরপেক্ষ পুকুর আর ধাম, আজনতো লাগাও। আলো রাজনৈতিক বিষয়। ওদাও দিক-বিদিকে হজাক বিশাব। মাজাও

'মুহঃ মেহিঁয়া আড়া আবাদা। হুয়ে যাব এস্যাব, না হয় ওস্যাব। ঘরজের এইসব কথা শুনে নরম আমারা অমনি মো পেয়ে যায়, মনে ভোটে বাড়ি যাং করার পরেই : শুনলেন, শুনলেন মো মুসলের কথা। আমাদের নিজের টুকুরো অবশ্য, এইসব ধরণ বাটোয়ের পরবে যেন পড়বেন না। বিয়ে-সাদিতে ওরা ওস্তাদ ; কিন্তু বাকিরাই জানে আছে খটকা। এই যেমন 'হুঁ' দিয়ে ভেট যদি ধরণের ব্যাপারে মোসলমান মৌলবী ধরিয়ে পারেন তবেতো তাঁর নবীদের চাকা বেমালুম ঘুরে যেন। আর কেউ যদি 'জি জি' করে বসেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর কপালে আছে ভোগা। আবুল কালামের 'আপনারের' ব্যাপারে কিছুটা পাটে বলি :

স্টালিনের ভেতাদের সঙ্গে তার যে যোগাযোগ সেই তাঁরাই প্রথম কি ভোটা বাইনের ভোটা প্রভুরা না পেয়ে যানে পানি —

তবেই অবিশ্য —তাঁদের পাকা ধানের ভেতে যদি এলো বুদ্ধি ; তাদেই পাটের পর যে আসছে —

যার জন্য তাঁরা মুক্তকণ্ঠে তাঁদেই বলেন অমের ও সাথী—

এরকম হয় অপরাধে যে অপরাধী।

সাহজন্য রোল : বরঞ্চ ওরম মুজনাইই আরাবটা রোল অনেকখানি বাড়ুনা আছে। নইলে আমের গুরিয়ে বেরবে লক্ষ আরও একত্রিত কম না। অনের সঙ্গে দেশ-সেবার ভেবারের অধিকাংশ লক্ষ থাকলে ভোর ইজ্জতের হাত দিয়েই বুদ্ধি আনা যায় না। যে মুক্ত নয়, সে আবার মুক্তি আনবে কি ? হা-ঘরে, হা-ভেতে মানুষের মুখ ভেবনার ব্যাপারে যায় বিশ্ব কাছে না সে এরকম রাজনীতির ঘটা, কিন্তু ভেলকর্মী নৈরেক নৈরেক। তাই বলছিলাম নরম ধরণের এই যে নিজের ভাষে ভরসা এ কিন্তু আত্মসম্ভবেরই সহায় যায়। যাদের মন ভেতে দুর্বলতা তখনই ধরণ যে নিজের অধিকারে আসল হাতে নিজেরই ভরণ ভোকে। বাইবেলে, যাদের তাদ ব্যাপারের জন্য বলা হয়েছিল 'ওঠ, তুমি কোন বিয়ে' মানো লক্ষ্যরে জাতে অমের অথবা 'ভেতে যে যা কেঁদে বাঁচিয় মরা। তাত-কাপড়ের ব্যাপারে ভেবা আছেই, সেই সঙ্গে কৃষির পক্ষনের মতো ব্যাপারে ইচ্ছে ভোগে নিকারে, ভেবারের আন্তর্দিকতার, সাম্প্রদায়িকতার এবং রাজিকতার সমস্যা। তাই তাদের সব ব্যাপার কথা যায় কি। ব্যাপ্ত দিয়ে আবার সমস্যে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানের চিরকর জিনারের 'অবিয়াত না অর বাম' তাদ লর্ডি। অন্তরেই আর চাইবেন, সোজা অন্তরিক্ষ হুঁ' ভরসেই। প্রথমদিন চাতারা প্রাণে সাম্যালাদি অবস্থায় দীর্ঘ দিন বাস করেও হিন্দু ব্যবসায়ীকে আপন করে নেওয়ার বদলে তাদের মুঠো পাকিয়ে ভয় দিয়ে তাদ করেই আছে। আর ঘ সংস্কৃতির কথা উঁচুলো চাতাদের অনেকেরই মন পশ্চিমা বাতাসের ছয় করে সোজা ছুটে চলে আমেরিকার পানে। এবং ভরসা বলতে : কথাটা লজ্জার বদলে নির্ঘৃণ মনে হয়) হয়তো আলী চৌধুরীর মতের ভরসা 'অবিয়াসের' কথা মনে অমেরিকা মোলাদাদ করে। হায়ের ভরসার সাধনা ! ঐ শায়রদাদি লোকটা যাই হোক তার একটা কথা কিন্তু এ দুর্দিনের ঘর মনে করে : I have the misfortune to belong to the Muhamadan Community. এখন স্থলে অপ্র বেন এ সিদ্ধান্ত না বেন যে, প্রথমদিন হিন্দুরা ভোগা সুলভী পাত্তা। দু'জন পাশাপাশি বীরদিন থাকলে পরস্পরকে জানতে হয়,চিনতে হয়, কিছুটা মাদ এবং মাদ দুইয়ে ভরোয় ভোটেতে আসে টানতে হয়। কিন্তু আকস্ত পরিস্থিতেনা। মুসলিম মানস এবং মুসলমানদের ভেবাধোধ আর অভ্যাসের সমস্ত হিন্দু ও ইনটালেকচুয়াল মানেরাও যে খুব বেশী এগিয়ে,-ছাস এমনতো মনে হয় না। পরিমাদে তাই 'পক্ষাতে ভেলেছে মাদে সে ভোমারে পক্ষাতে টানিছে।'

অন্তরের প্রথমদিন আরেক মহাদাবী সেক্যুলারি-জমের মদান শুরু করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে ধর্মটির মূল্যপ্রতিপক্ষ এবং মাবহারিক অর্থ যাই ভোক, আলোচ্য ভেশে হয়েছে ধর্মের আড়ালে আবডালে বাঁচুনী করার ইচ্ছেটাকে অবাধ ছুটি দেওয়া। ভেক, অটোক্রেসী। অবশ্যের 'হায় ভোমের—হায় ভেলের' সমস্যাদের সাধারণ জীবন যাত্রার ধারা ছিঁড়ে যায় ভো যাউক, যানবাহন চলাচল ভেঙে ভেল ভো ভেঙেই ভেল। এরো বাদ,

যোড়াসুড়ি দাস বীল খুব ঝরঝরে নেই খুব সরোয়া। সন্দেহের আর ঘটে কিনা। অন্দিকে আবার ছই পুরুষ কিংবা যা হুদ্‌বিধ প্রতি ছবি আমার সন্তানদের পাঠকা থাকিবে, বলনাচের বৈ-ঘরোয়ে অথবা নাইর শ্লীলতার হিশীবাদের আবলাবিতে যে লক্ষণ থাকটা হচ্ছে সেটাই বা কি এমন অভিনব! লেছলাবিজ্ঞানের আর কথা উঠা থাকের এগারো থাকে কি আমু হাবেনা ঘোষাই ঘোষা। সুতরাং উক্ত অবলম্বাটির উদ্দেশ্য সমাজ নিরোধনার্থে হিন্দুর বজিশ আনা হিন্দু হওয়া এবং মুসলমানের চৌষট্টি আনা মুসলমান হওয়া চাই ই চাই। সমাজে অন্তত: আট আনা রকমের মানুষ হওয়া যে একান্ত দরকার এ কথা যাঁরা করেন তাঁরা নিশ্চয় মানে নিশ্চয় যাবে। আর পঞ্চপতির আইনের কথা তুলে লাভ নেই। গ্রীক Sophists-দের দৃষ্টিতে এ সত্য স্পষ্ট হয়েছিল যে, আইন দুর্বল জনগোষ্ঠিকে তাঁরে ফেলার উপায় মাত্র। পঞ্চপতীতে যে সংবাদ আছায় হয়েছে এমন কথা যে ভাবে সে সরলা নয়নের আহাম্মক। ……এতো গেল পঞ্চপতির রাজনীতির আর কিছুটা সমাজনীতির কথা। আর নতুন সাহারের বন্ধন আইনে আছ যাদের ঘর পুঁথি সেই শিল্পী সাহিত্যিকদের সমাধানে কি? সেদিকেও হাতড়া ছবিদের নয়। একজন বলেছেন: Art is merely beauty এবং সে Beauty হচ্ছিবে আছে সবখানে। আরেক জন সমাজনেই অবশ্য খুশি খাঁচড়ে বলে যাচ্ছেন: The value of art is not beauty, but right action· হেসে যদি আর কি। চিত্রাবিদদের একজনের অবে ঐক্তিক উদ্ভাবিকার সূত্রে পাওয়া। অন্তএব চেয়ে চরিত্র আইনের ব্যাপার। অন্য চিত্রাবিদ এলিয়টের কথায় প্রতিধ্বনি করে যাওয়ায়: Tradition can not be inherited at all and if you want it you must obtain it only by great labour. দাও সাধনার ঠাঁয়া। যার মন খুশি থাকবে।… ……না খুব হয়েছে। অসম্ভিত বিস্তারের। পঞ্চপতির লক্ষ্য যে অনেক সে কথা বোঝা গেল। কিন্তু সমাধানের পথ কি? পঞ্চপতির প্রবীনরা অবশ্য বলেন: বীজ হলে বীজ। বিশ বছরটা কি এতোই দীর্ঘ সময়। মুখে ওষধ আর খুব হাসি মাখো – দেখবে ইঙ্গিতের ধাক্কা খেয়েই কেলেঙ্কারী সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু পঞ্চপতির দ্বিতীয়ের সমিতির নিবেদন: যারা ঔঁর মূলো পাওয়েই ফেলা যায়। সাত মুটো থাকলে তেল, ঘন, দুধ, ঘি যাই ঢালোনা কেন সব বরবাদ হয়ে যাবে। আর সমস্যার দ্বিতীয় সমাধানের মানা বুঝি এমনেই—এ মুটো নাম বিবাহের কাজ। যার চরিত্র লক্ষণ নেই তার বিয়ের মন্ত্র যতো পড়াই হোক না কিনো সে যে মানে যে মানেই ঘোমটা দিক না তাতে ঘোলা জল কেবল ঘুলিয়েই উঠবে মাত্র। যার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই সে যোদ্ধাই নয়, নিশিরাম সর্দারই। যাদবিক দুর্ঘটনা যেখানে বিপরীত, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা যেখানে সমস্যা নিয়া যেখানে ব্যাহারা, সংসার যেখানে নেকেলে ব্যাপার, প্রজাদের হৈর যেখানে লাভিক বিকল্পের বহিতে দগ্ধ, বিবাহ যেখানে আজ অহরিবারই ব্যাপার সেখানে যে কেহই বলো কেন অন্তরে আছে মতুনোত্তা কিংবা বাঁচবলা। অতএব পঞ্চপতির মতুন, রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়ে তাই এমন বেশী সহজ সাংস্কৃতিক বিপ্লব। পলিটিক্যাল নীতার হওয়ার চেয়ে 'হিউম্যান হৈয়ো' হওয়ার যাকটা বোধ হয় এখন আর নয়। শুধু ধার পা ছুঁচে গলাবাজি করলেই চলে না, মনের আবালা দরজাও খোলা রাখা চাই। সেবার বুদ্ধির সাহায্যে কলা যো খুব বোল, এবার সংবুদ্ধির সেক ধরেই একটু চাই সাধনা। যে পঞ্চপতির ভাইবোনেরা, ইথোনেশিয়ার লোহাই পেড়ে যখন রাজনৈত নির্বাচন। বিবেকানন্দের কথা ভেবে খুশিলাক্, যাদবেও বোধ হয় এমন কিছু যাদাবুদি নেই। Human values কে কোন্, কেমন করে আধেবিকার হাল আমলের চেরাগ দেখেছো তো? সেখানে পথ আর ফুরোয় না, উৎকট পথ উঁচুয়ে। আব্রাহাম লিংকনের চিহ্ন মুছে ফেলে। সেদিন মার্টিন লুথার কিংবেরও গেল। রীতিমতো পড়ন আর কি, বীট্‌বিদ্বেষের অবাধ মুক্তি, অলখা অবৈধ সন্তানের উৎপত্তি, প্রকাশ্যেই sexual crime-এর প্রাচুর্য এবং সেই পাপেরই পরিচয়, যাকে চোখ ঠারারই বাকম কলাকল। যাদাজিটী নেই বলে পার্লামেন্টারী আইনও হয়েছে 'যেমন তাকি তেমন সাধ।

ছড়া'। তবে তফাৎটুকু হলো : আমেরিকার পাঠকদের ছেলে ছোরা একজনের বিবাহপূর্ব জীবনে অবৈধ গর্ভ হয়ে থাকে, কিন্তু পার্লামেন্টারী আইনে সে ব্যাপারে নীরব। অথচ বিশ্বে শুধু আমাদের সন্তানেরা জন্মেছে। দেবোদিনীর ঘরে হওয়ায় ছেলে উঁচি যাবার জন্য তার হয় তিন বছরের কারাদণ্ড। আমেরিকার পাশে আমাদের উঁচি যাওয়ার যায় যাই হোক নিশ্চয়ই তার ঘর হয় না। কিন্তু সারা জীবনের মানুষের আইন বুঝি আমাদের দাদা কি। Human right-এর এ অনুভূতি আমাদের।...শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মূল্যবোধ, চলাবিধা ভেদাভেদাতিত, সোনার ছবিটির মত দেশের আমেরিকার এই পতনের বীজ ছড়াচ্ছে। তোমাদের দেশেও সে বীজ ছড়িয়েছে কিনা বা ছোঁয়াচ লাগা আমরা। কিন্তু সাবধান। দুনিয়ার এই ব্যাপারে দেখে শুনে বড়পক্ষির মানবিকতের আমেরা যদি জন্তুর না হয়ে যাই তাহলে মানবিক মূল্যবোধ আর বাকি চরিত্রের কথা ভাবো। মনুষ্য 'পূর্ব ইটে আসে সেদি নতুন আসে' এ কথা তোমাদের মনেই থেকে যাবে। এবার বটে যাওয়া মুক্তোর গল্প আমার ফুরোলো। বল হরি—হরি বোল।

• অ্যাবসার্ড নাটক বলতে স্পষ্টত কি বোঝায়? কোন্ বিশেষ পরিপ্রেক্ষি থেকে এই শ্রেণীর নাটকের জন্ম?

: পর্যালোচনা :

এদেশে অ্যাবসার্ড নাটক প্রায় হাল পিরিয়ড পর্যন্ত টিকিয়ে রিখিতে পেরেছে। অথচ আশ্চর্য, এ সময় এ জাতীয় নাটকের কোন সমগ্র আলোচনা কিংবা ফরিদিই সাজা সমালোচনা লিখেছিলো হয়নি। এমনকি এই বিশেষ ধরনের নাটকের অ্যাবসার্ড নামকরণের লেখকদেরই যথাযথ গ্রহণ করা হয়নি। সেটি এর বাংলা 'বিউবিল্' 'অবিজ্' ইত্যাদি পদটি যেমন সমালোচক-মহলের উপহার, অ্যাবসার্ডের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। আমে ফ্রেঞ্চের স্বর-বিয়োজিত মেনিকেস্টোর মতো কোন অ্যাবসার্ডিস্ট মেনিফেস্টো প্রচারিত নেই। প্রতিটি অ্যাবসার্ড নাটক এবং প্রত্যেক নাট্যকারের উপস্থাপনা, ভাবনা ও স্বভাবের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ঐক্যের অস্তি আছে। তাহলেও বিভিন্নতার মধ্যেও অবশ্যই একটি সাধারণ ধর্ম বর্তমান এবং এই ঐক্য-কেন্দ্রকে স্পর্শ করে অ্যাবসার্ড নাটকের পরিচয়পত্র রচনা করার প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে। এই সূত্রে আলোচ্য প্রসঙ্গে ইউনেস্কোর আলোচনার একটি ছক ব্যবহার করা কার্যকরী হবে বলে মনে হয়— "Absurd is that which has no purpose, or goal, or objective". জীবনের অভিপ্রায়ে লক্ষ্য হারে হয়ে আমাদের পরিচিত পৃথিবী এই নাটকে এক দুঃসহ 'আইডেন্টিটি' আনিয়ে তোলে। এলিয়েনেশন, প্রাণহীনতা এবং নৈরাজ্যবিচ্ছিন্নতা, ইতিহাসহীনতা এবং নঞ্জর্থকের সম্বন্ধে আক্রমণে অ্যাবসার্ড নাটকের গতিক ও দর্শন এক বিচিত্র ও বিশেষ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। বর্তমান পৃথিবীর পুনরায় বীক্ষিত এবং মূল্যায়ন করে সমাজ চর্চিত এই নাট্যকার-সমাজ আমাদের সোচ্চারে জানায় পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম পোকায় কেটেছে, বিশ্বাস এবং অর্থহীন ভালোবাসার মানুষ পরস্পরের এক মৃত এবং অসহায় অস্তিত্ব—আমরাই তার নিয়তি, চলমান বুরাকার সংসারেই তার সমাধি রচনা, বিভিন্নতাই তার একমাত্র বাস্তবিক। বিবেকে বিশ্বাস হারানো একজন অসহায় আইডেন্টিটির দ্বারা দ্বারা অ্যাবসার্ড নাটকের চরিত্র অন্য পরিচিতের দেখতে পাবেনা। বিশ্বাসের এ জাতীয় মানসিকতা বিপজ্জনক এবং অন্তঃ আমাদের এর উৎস যে বিশেষ এক রাজনৈতিক সামাজিকবোধ থেকেই আসছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইউরোপ-মুরোপে দুটি মহাযুদ্ধের বৈনাশিক ধ্বংসাত্মক যে চরাচর বিধ্বস্তার উপাদান তৈরি হয়েছে, তার বেশী ছুঁইয়ে বজ্রের ধারা চারদিকে পড়ছে……পরিচিত আকাশের নোংরা সোপিজ-লিপ্ত রাতের ঘাস অনুভব করছে। তার ও মুখর - মানুষের আবিষ্কৃত এই দুটি ভয়াবহ সব বিধ্বংস মুহূর্তগুলিতে সভ্যতি মুখর আজ নৈরাজ্যের মতো সমাজ, সম্বন্ধ নেই। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই ব্যাধি ও বীভৎসতে উৎসর্গ ভাবে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের নাটকও এই মানবিকবোধের জন্মবিপত্তিকে প্রকাশে উন্মুখ। তবে বলা,

---

• উপরোক্ত আলোচনাটি একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র অনন্তির কবি-সমালোচক কামনাটা চক্রিয়া শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তুলনামূলক সাহিত্যের' ছাত্র শ্রীদেবু কন্দুরী।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্য সাহিত্যে প্রায় যাদুর মতোই এবং এই জন্য আরো অনেক কারণ প্রতিভাবানের সিদ্ধান্ত এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অ্যাবসার্ড নাট্যকার সমাজ পৃথিবীর এই ঐতিহাসিক ও ঘনীভূত অবস্থার বিরুদ্ধ ভঙ্গিতে প্রকাশ করে সমাজের একটা বিশেষ সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে একথা নিঃসন্দেহ এবং এই উদ্ঘাটন ক্রিয়ার মধ্যে একপ্রকার সমাজচেতনাও আছে। কিন্তু এই সমাজচেতনা কেবল অস্তিত্বের এবং দৃষ্টান্ত সম্পর্কেই সচেতন; এর বিরুদ্ধে তাঁদের কোন বিরোধী মনোভাব তীব্র নয়। কখনো কখনো কোন কোন নাট্যকার হতাশাকে আর্টনামের জন্য বিষে প্রকাশ করে একপ্রকার প্রতিবাদের ছদ্ম-চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এঁদের আর্টনামের ভাষা ও পরিবেশন এত আঙ্গিকসর্বস্ব হয়ে এবং এত বিষাদ ভঙ্গিতে ধ্বনিত হয়ে প্রকাশ পাইলের মনও কখন নিস্তেজ ও হিমঘন হয়ে নিজের অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ নাট্যকারের মতোই অবশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা যদি হতাশাকে পরম সত্য বলে তাদের পাইলকে হতাশাতেই বিশ্বাস করিয়ে মুগ্ধ করে তুলতে সক্ষম হন। সুতরাং এঁদের সমাজচেতনা জীবনের অস্বাভাবিক ও বৈকল্পিক দিকে খুব কেরামতি আছে। সংসারী মানব-সভ্যতার দলাটে-মিশি পাকে থাকা সাহিত্যিকেরা এরা নন, বর্তমানের সঙ্কটময় ভবিষ্যৎ দৃষ্টান্ত রূপ যখন ক'রে জীবনের মূলত অর্থ খুঁজেছেন। ঘরে-আসা-নাটকে একটা ছোট কথাকে অবলম্বন করে ইবসেন যেমন ভবিষ্যৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে আর্টবিনে ফুটে গিয়েছেন। পৃথিবীকে এক ক্যালিবানের মানব করবার জন্য এঁরা সেই উদ্ভট দেশের বাসিন্দাকে নিয়েছেন। ঈশ্বর আলো দিয়ে পুতুল করেন—সেখানে দিয়ে আর আলো দুই-ই থাকে। ঈশ্বর যদি কেরামতির অক্ষমতার দিয়ে পুতুল করতে চান তাহলে শিল্প হবে কথাবাদে থাকে কিন্তু আলোর মৃত্যু ঘটেছে এবং আলো ঈশ্বরের পরিবর্তন হয়েছে বলব। হতাশা এবং বিষয় বিভিন্নতার অক্ষমতার দিয়ে কথাবাদে অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের এই যে বিশ্বজনক লীলা তা আধুনিক মুগ্ধ মানবিকসমাজে কখনই উজ্জিবনের কারণ। ইউজেনোস্কো অবশ্য প্রথমের সঙ্গেই এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধি দিয়েছে মত করেছেন। New York Times-এ ইউজেনো লিখেছিলেন—"I have no wish to save humanity —to wish to save it is to kill it—and there are no solution. To realise that is the only healthy solution." তাঁর 'রাইনোসেরাস' নাটকে মহত্ত্বাদীরা কখন মতাবে বলে মনে হয়েছে। মানব কেরামতির প্রতি অন্ধবিশ্বাস তেমী করেও মতাবে পরিচয় মেলে। ক্যালিবানের পরিণামী ও মানবের দিন পরিবর্তন করলে মানুষের মুক্তিমান আত্মসমর্পণ এ-নাটকে একটি রাজনৈতিক সত্যকে প্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সমাজচেতনা ক্যালিবানের মতো শক্তির মধ্যে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধি ও অন্যায় ভবিষ্যৎবাণী আমাদের চেতনা দেয় যায়। অর্থাৎ ইউজেনো তাঁর সামাজিক-বোধকে ইতিহাই দেউড় পারে নিয়েছেন ক'রে ক্যারিকেচার—মানবসভ্যতার পতন ও সমাজকে ভবিষ্যৎ হিসেবে ঘোষণা করে নিজেকে মুক্ত ও পাঠককে প্রভাবিত করার বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছেন। জঁ-জেনের নাটকের মুক্তি ওঠা মানুষের 'রাইনোসেরাস' সম্পর্কে কোন দ্বিধা নিরাকরণ অভাব। মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে মুখোশ থেকে মুখোশে আত্মগোপনকারী এক অর্থ হীন স্পষ্ট-চরিত্র-বিচ্যুত অস্তিত্ব। তাঁর নাটকে পোষাকের খোলা ঝাকানোর মতোই কখন মানুষকে মুছতে থাকলে পুতুল পৌঁছে যেতে হবে। প্রবল প্রতিভা, কবির মুগ্ধ দার্শনিকতা এবং সমাজবিদের প্রতিভা বিশ্লেষিত করবার জেনে অনায়াসে পাঠককে তাঁর দর্শনে বিশ্বাসী করে তুলতে পারেন—তা এখানে। যেমেটের নাট্য-সংসারে প্রবেশ করলে মৃত্যুময় জীবনের এক-ঘেয়েমি, আইডেন্টিটির অস্তিত্বহীনতা, অন্ধকারের দিকে অস্তিত্বে যাবার আর্তনাদ এক বৈরাগ্যের পরিচয় দেয়। অ্যাবসার্ড ভাষাই অনুবন্ধ বিশ্বি ছবি মৃত্যু একটা চেতনাকে মানুষের জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখায়। মানুষের বৈলক্ষ্য, নির্বুদ্ধিতার ঘোর এবং নিরাকারিতার উদ্ভাস চিত্র-উপলব্ধের বিশেষ কথাবার্তা প্রকাশ করা এঁরা বিশিষ্টের বিষয়-পরাজয় মুছতেন। এঁরা শক্তিমান অনেকেরো ভয়।

অ্যাবসার্ড নাটক কি পূর্ব ঐতিহ্য বর্জিত কোনো আকস্মিক ঘটনা-প্রসূত?

অ্যাবসার্ড নাটক সাম্প্রতিক কালের বিষয় হলেও এর জন্য ঔপন্যাসের পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঐতিহ্য ইতিহাসগতভাবে অনুসন্ধেয় অবশ্যই। এই ধরণ নাটকের চরিত্র ও গঠনে পূর্বসূরীদের ছায়া নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। আলফ্রে 'Ubu Roi' অ্যাবসার্ড নাটকের প্রথম এক উপন্যাসিক (১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রচীন চিরকল্পের ভগ্ন স্তূপের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের মূর্খ লোভ ও বিকৃতি এখানে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আলফ্রে নাটকের বহুপূর্ব থেকেই এ-জাতীয় নাটকের উপকরণ ও ভাবনার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। মাইকি ও চাইকিন-এর যে উপন্যাসের সাম্প্রতিক অ্যাবসার্ড নাটকে দেখতে পাই, তার পূর্বসূত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মাইমসে, রেনেসাঁসের ইতালীয় Commedia dell arte-তে, ফ্রিটেরের বিভিন্নমুখী হলের অবতারণা ও বৃত্তাকারের পাশ্চাত্য থেকে পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন রঙ্গমঞ্চে সোয়ার্ট, ফার্স এবং বাইটেরেরের আঙ্গিকগত এর অনুসৃত হয়েছে। আলফ্রে ব্যারিকি-তে, স্পেনদেশীয় Auto-sacramental-এর ধর্ম-সাংকেতিক উপকরণ অ্যাবসার্ড নাটকের উপাদান ও ভাবসংকেতকে সমৃদ্ধ করেছে। সুরুলো নাটকের বিমূর্ত চরিত্র, পাশ্চাত্যের 'ওয়ার্ল্ড অব ক্যারাক্টার্স' অনেক ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ড নাটকে উপযোগিতা সৃষ্টি করেছে। বিশ্বাসের অবলম্বন, ভয়ও দুঃখ, ব্যক্তি-তার বিচ্ছিন্নতা এবং, হতাশের ইতিনিহিত্যের অর্থহীন আত্মধ্বনিতা, রেসিবিয়াল ও ক্লারি, মিথ্যা আশা, নিয়ম আলোকোরের, অ্যাকেজ ক্লারি ইত্যাদির ধারাইসী ও সুরলিয়ালিস্টিক চিত্রাবলী। অস্তিত্ববাদী দর্শন, আধুনিক চিত্রকলার চলচ্চিত্র-চিত্রা ইত্যাদিও অ্যাবসার্ড নাটকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

অ্যাবসার্ড নাটকের আঙ্গিক প্রথাসিদ্ধ নাটকের সঙ্গে কি পরিমাণ পার্থক্য নির্দেশ করে?

অ্যাবসার্ড নাটকের ধ্বনাত্মক বাচক পরিমাপকে যদি শুধু ও বস্তুর দিকে পরিচালিত করা যায় তাহলে বিদ্ধ এই ধরণের নাটকের তার থেকে মূলধারণ কিছু পিছা নিতে পারে। এই নাটকের মধ্যে পূর্বতন প্রথাসিদ্ধ নাটকের বিরুদ্ধে যে আঙ্গিকগত বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে তার অভিব্যক্তি হয়ত করে আমাদের ক্ষেত্রগুলো উপযোগী হোলো পেতে পারি। আদি অন্ত ও অঙ্কের বিভক্ত সুষমাময় আঙ্গিকী প্রথার এক পরিণতি ঘটে ওয়েলিং, মার্শিয়ান ধরনে ঘটির নাটককে এরা ছোটছোট খণ্ড বিখণ্ড ক'রে বৃহত্তর ঘাত উপহার দিয়েছেন। এঁরা নাটককে এলোমেলো ভাবে উপস্থাপন ক'রে কিংবদন্তী ঐক্যমত অনুত 'ইতিহাস' সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ ঐ সূত্রটি সন্ধান ক'রে নিলেই নাটকটি বুঝিয়ে নেন। অনেক অর্থগত দিক নাটকের একজন সহকর্মী হয়ে ওঠেন। এখানে নাটকের পারম্পর্যী বুদ্ধিগ্রাহ্যতার ভালো বিচলনীল এবং আচার আচরণ এবং সংলাপ আপাত অর্থহীন। 'লাফেসবিয়ালিটি'তে অস্বীকার ক'রে ইয়োর রিয়ালিটিকে, বিশ্বাসের মধ্য থেকে চিত্রায় একটি স্বার্থ বৃদ্ধির অবস্থানে এ-জাতীয় নাটক ওঠে। জীবনের প্রচলিত বৃক্ষরূপ পুরো সমাজে প্রকাশ করেন এর অবলম্বনে যে 'আকাঙ্ক্ষিত আর্টিফাইমেন্সান টুল' এবং অভীপ্সার তাগিদ হয়েছে, এই আঙ্গিক তারেই বুদ্ধিতে বুঝতে চায়। জীবনের অবাস্তবতা প্রকাশ করার জন্যই এদের বিষয় ও আঙ্গিক অর্থহীন ও অবাস্তবের উপস্থাপনা। তাই বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবনই নাট্যাভাসের দাবী—'Emotional identification with the characters is replaced by a puzzled, critical attention.' 'আগোনেস' এবং 'পস্' সৃষ্টি ক'রে অ্যাবসার্ড নাটক আমাদের বহুকালের লালিত ক্যাথলিসিসের উপর নতুন ভাবনার আঘাত সৃষ্টি করে। তবির এই জেনর নাটকে একটি বিশেষ শক্তি ও ভাব উপহার দেয়।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষি ও মানসিকতা অ্যাবসার্ড নাটককে স্বীকরণে কি বিজাতির দিকেই অনুসরণ হবে?

একথা ঠিক পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সঙ্গে আমাদের পরিপ্রেক্ষি ও মানসিকতার অমিল রয়েছে। যে-কারণে এদেশ যেন

আবহমান নাটক যেমন হচ্ছে সেইসব নাটকেই আমাদের দেখা শুরু হয়নি। বিদেশী চিত্রের আমরা যথেষ্ট প্রভাবিত, তার ফলন ও মূলন দুই আছে। তবে যে নাটক বিদেশী প্রভাবে ঘাড়ানো ,হয়ে গড়ে উঠে তার উপর নূতন করে কোন বিদেশী প্রভাব দেখলেই ঘাবড়ে ওঠার কারণ আমি খুঁজে পাইনা. আমাদের নিজস্ব এবং আচার-বিচারের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা বজায় রেখে বিদেশী চিন্তা ভাবনা যদি আমাদের প্রাত্যহিক প্রেরণা দেয় তবে তাকে বিদেশী বলেই তাকে বরণ করা আত্মঘাতী। বিদেশী নাটকের কর্ম কৌশলকে ঘরে এনেছি আমরা; এই কথাটি এই মুহূর্তে মনেও করা সম্ভব হয়। কথা যখন চিন্তার রাজ্যে আমাদের ভাবনা চিন্তা সব ও আত্মস্থ হয়ে গেছে। নাটকের কর্ম যদি একান্তে ভাবনার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে, বর্তমানের জন্য আঙ্গিকও নিশ্চয়ই নতুন দেশীয় চিন্তার বিষয়কে ঘিরিয়ে নিতে পারবে। 'আপনেই বিসার্জি' থেকে আমরাও নাটক যে একটা নতুন 'ডাইমেনশন' সৃষ্টি করেছে তাকে দেখে নাটা ভাবনার তার পরীক্ষা হতে আপত্তি কি? ব্যক্তিগত ভাবে আমি আবহমান নাটকের মূলধারাকে বিন্দুমাত্র আঘাত করি নই। তবে এ-নাটকের আঙ্গিকের মধ্যে যদি ও বিষয়ের আবহমান ও তার হারানোরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ করে তোলার যে পরিশ্রম পরীক্ষা করেছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যাকে আমি মনে করি। আপনেই বিসার্জি থেকে নতুন 'ডাইমেনশন' সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যেও রয়েছে। রাজস্থানের গম্ভীরা নাট্যাঙ্গনে এ আঙ্গিকের পরীক্ষা যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের মনসা, পুরাণ যাত্রাগানের মধ্যে উহাদের বিপুল সম্ভাবনা থাকে তার জন্য থেকে গভীরভাবে আবিষ্কার করতে। আমাদের লোকসাহিত্যের মূর্তি ভঞ্জনার আলাদা বাস্তবতাকে সামনে রেখে অভীতের ঘরের আমাদের কাছে অত্যন্ত সার্থক ভাবে অর্থময় করতুলা হবে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ত্রিভুবন মোহন এঁদের প্রত্যেকটি কলকাতার আমাদের উপলব্ধি মধ্যে স্পষ্ট ও বিস্তার। অর্থাৎ আমার মনে হয়, দেশে আপনেই বিসার্জি থেকে নতুন আঙ্গিকের নাটক উপস্থিত করতে চাইলে, তা বিস্তার করে তোলার মানসিক চিন্তাভূমি তৈরি হয়ে গেছে সেই সুদূর ভেতরাদের কখন তৈরি করে তুলবে এই ধর্মের নাটক এবং এর সময় সাধুতা আমাদের আনন্দ মনে করিবা। এই ঐতিহ্যের কোন নাটক দর্শকের মনে আঘাত করার ক্ষমতা অবশ্যই নাটকারের। তবে কোন আঙ্গিকের অর্থে ঐতিহ্যকে আঘাত করতে হলে 'কনটেন্টকে' ঘিরে থেকেও আঙ্গিকে হবার প্রয়োজন করেছে। আজকের বিশেষ ধ্বনি-প্রতিধ্বনির যদি আমাদের নিজস্ব চিন্তের আঘাতে ধরা যায় তাহলেই এই আঙ্গিকের পরীক্ষা সার্থক হবে। আমাদের প্রচেষ্টা সেদিকেই অগ্রসর হোক। ভীষণকে ভীষণ করে যে-কোন আঙ্গিকই সার্থক ভাবে প্রযুক্ত হবে তা প্রতীত—এখানে দেশী-বিদেশীর প্রশ্ন অবান্তর, যদি তা বিদেশী হয় তাহলেও সত্য ও প্রয়োজনের আঙ্গিকেই সেটি হয়ে উঠবে।

গোর্কির সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

উৎপল চৌধুরী
প্রথম বর্ষ, ইংরাজী

(১) মার্ক্সিস্টরা প্রথমত পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন ; এখন প্রয়োজন এই পৃথিবীকে পরিবর্তন করা। (২) ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন সমস্ত তাত্ত্বিক আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়।

—কার্ল মার্ক্স : ফয়েরবাখ সম্বন্ধীয় মন্তব্যাবলী

ঊনবিংশ এবং প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যে যে ৪টি মূলে বৈশিষ্ট্য গোর্কি লক্ষ্য করেছিলেন তা হল একদিকে অসম্পূর্ণ বাস্তবতা, আর একদিকে ব্যক্তিগত রোমান্টিকতা। ঔপন্যাসিক বাস্তবতার পুরোধা ফিল্ডিং ঔপন্যাসের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন এই সাহিত্যরূপের মহাকাব্যিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্র। মানুষকে ঘটনার সম্বন্ধের মধ্যে নিয়ে না গেলে তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখানো হয় না. ফিল্ডিং মনে করতেন। এবং এখনও বলতে দ্বিধা করা হয় না যে Tom Jones এর মধ্যে এই মানবিক চরিত্রগত গতিশীলতা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যিক বাস্তবতা সম্বন্ধে ফিল্ডিং-এর তাত্ত্বিক ধারণা কত গভীর ছিল, বিশেষ করে সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে Tom Jones এর ভূমিকায়। ফিল্ডিং-এর মতে ঔপন্যাসের জন্য বাস্তবতার প্রতিফলন থাকলেই ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিকের মধ্যে কোনোক্রমেই পার্থক্য হতে পারে না। ঔপন্যাসিক তার সৃষ্টির জন্য সেই ধরণের লেখকের শৈলী এবং প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন "যারা যেন যেন বৈজ্ঞানিক ঘটনাকে প্রকাশ করে বলে লাভী করে।" এর মধ্যে অর্থ ঔপন্যাসিক মানিক পরিবর্তনের মধ্যে বিশ্লেষণ করবেন ; যার এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি সামাজিক ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনার সম্বন্ধ তাঁর চিন্তায় বিশ্লেষিত হবে। শুধুমাত্র মানুষের বর্ণনা এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নয়। Tom Jones-এর মধ্যে আমরা ঔপন্যাসিকের মানিক সম্বন্ধে ফিল্ডিং-এর আর একটি মূল্যবান মন্তব্য পাই। তাঁর মতে ঔপন্যাসিকের সেই ধরণের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া উচিত যার ফলে তিনি সমস্ত বিষয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারবেন এবং যে বিষয়গুলি তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহের মধ্যে হবে তাদের গতিশীল বিবর্তন এবং পারস্পরিক পার্থক্য বুঝতে পারবেন। ঔপন্যাস তথা সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ফিল্ডিং-এর ধারণা এবং বিশ্বাস খুবই পরিষ্কার ছিল। ফিল্ডিং যে সাহিত্যধারা প্রবর্তন করেছিলেন তা যদি সঠিকভাবে অনুসরণ হতো তাহলে আমরা বাস্তবতার এক নতুন রূপ দেখতে পেতাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্য এই ধারা অনুসরণ করেনি।

যদিও গোর্কি এই সাহিত্যের অন্য অনেকগুলি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং একমুখীনতার উল্লেখ করতে ভোলেননি। এই সাহিত্যের শক্তি ছিল। সামাজিক রোমান্টিকের নির্ভরযোগ্য মূলে রয়েছে এই সাহিত্যে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তবে ব্যবহার্য কোনো নীতি ছিল না। ছিল মানুষের অন্তরে যারা উৎসাহ জাগাতে পারে এবং সংশোধন ছিল না

জোলা সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শ। এই সাহিত্য জোলি বুদ্ধিমান মনে করেছেন কারণ এর মধ্যে বাস্তবতার প্রতি সমালোচনামূলক ভাব ছিল। কিন্তু জোলা নূতন পথের দিশারী হননি। সবকিছুতেই সমালোচনা করেছে; দৃষ্টান্ত বলেনি কিছু। পক্ষিমে ইউরোপীয় সাহিত্যে এরই পরিবর্তে নিরপেক্ষিতা লক্ষ্য করেছিলেন জোলি। এই বিশ্লেষণের প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতিবাদের (naturalism) মধ্যে। বালজাক, জোলা এবং জোইন (Balzac, Zola, Taine) এই সাহিত্যিক প্রবণতার প্রতিনিধি। প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে জোলিকে অভিযুক্ত করতে হয়েছে। প্রকৃতিবাদী সাহিত্যকে তিনি বলেছেন ঘটনার সাহিত্য (literature of facts) এবং তথ্য-পর্যবেক্ষণী (empiric) বলে অভিহিত করেছেন। মার্কীয় কবি-সাহিত্যিক এবং চিন্তানায়কদের কাছে তথ্যপর্যবেক্ষণ ঔতিহ্যপূর্ণ মতবাদ। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য বর্তমান শতাব্দীর প্রবণতাকে লেনিনকে পর্যন্ত এক বিরাট রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নে ঘটনা সমূহের ইতিহাস রাষ্ট্রনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার এই মতবাদ খণ্ডন করার জন্য। এই সাহিত্যের মধ্যে একরকমের চাঞ্চল্যকর অনুভূতি। এই ভাষিকেরা বিশ্বাস করতেন মানুষ তার পরিবেশের অধীন। পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করলে তার পক্ষে তুলনায় অল্পবয়সী ইতর-ভদ্র পশুর বিভিন্নরূপ এবং মূলের মতোন হয়ে যাওয়া। মানুষ যান্ত্রিক প্রয়োজনের দাস। জোলি মনে করেছেন জোলা এবং মানবমনস্ক শেষ এবং জোইন প্রবর্তিত সাহিত্যে যে জীবনদর্শন, মানে আর্থজের ভাষায় philosophy of life, প্রকাশ পেয়েছে তা আর কিছু নয়, এক রকমের বৈষয়িক মতবাদ। এই সাহিত্য-বর্ণিত চরিত্রেরা সামাজিক পরিবেশচালিত যন্ত্রমাত্র। ব্যক্তিগত ইচ্ছা নেই, মূল্যপ্রসারী দৃষ্টি নেই, নেই নেই নৈতিক তেজস্বিতা যা দিয়ে মানুষ ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করতে পারে। এক কথায়, এই সাহিত্যে বাস্তবতার প্রাচুর্য আছে, কিন্তু বেশি পরিমাণে, বিশেষ করে বালজাক্-এর La Comedie Humaine-এর মধ্যে, কিন্তু কবিত্বপূর্ণতা নেই, উদ্দীপনা নেই, নেই সেই রকমের ইঙ্গিত যা পাই মহত্তরাভিমুখী মনে, যখন বাস্তবনিরপেক্ষ, লোবিয়ার যা অঙ্কিত করে বলে: "আমি শুধু তোমাকেই প্রণাম জানাচ্ছি না সোনিয়া, তোমার মধ্যে দিয়ে লাঞ্ছিত দুঃখক্লিষ্ট মানবতাকে প্রণাম করছি।" (I do not bow down to you personally Sonia, but to the suffering humanity in your person:—Crime and punishment)

উনবিংশ শতাব্দীর তোমাকিক প্রবণতার মধ্যেও জোলি বিশেষ লক্ষ্য করেছিলেন। তার মতে তোমাকিকতা যার চরম প্রকাশ হয়েছে আর্থার সাহিত্যিক ত্রয়ী বিক্টর, বোদলিয়ার এবং তেফেলের মধ্যে সাহিত্যের স্বাভাবিক বিবর্তনকে প্রতিহত করেছে। কাণ্টের ইন্দ্রিয়রাজ্য (phenomenal) জগৎকে মায়াময় বলে অস্বীকার এবং এই ইন্দ্রিয়রাজ্য জগতের বাইরে নৈর্ব্যক্তিরাজ্য noumenal জগতের প্রাপ্য তোমাকিক কবি ও চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করেছিল। ফল হয়েছিল বাস্তবতার থেকে অপসারণ এবং ব্যক্তি আত্মার বৈবিক্ত। ব্যক্তি-আত্মার বৈবিক্ত। ব্যক্তি-আত্মার সন্তোষসাধনের জন্য এই কবি ও সাহিত্যিকদ্বয় কিনা করেছে। Mademoiselle le Maupin-এর নায়ক ব্যক্তিগত প্রেমবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কি চাতুরালে মেতে। কি দুঃখজনক-ভাবে সে জীবনের সঙ্গে সমস্ত যোগ হারিয়ে ফেলেছে। ইংরেজ তোমাকিক কবি কোলরিজ—তাঁর উপর আর্থার আর্থার এবং কর্ণেলের প্রভাব অপরিসীম—তাঁর এক কবিতায় বলেছেন, প্রকৃতির থেকে আমরা যেই জিনিসই গ্রহণ করি না আমাদের মন দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এই রকমের সমাজ থেকে দূরে সরে থাকা তোমাকিক অহংবোধের (egoism) প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক, জোলির মতে, বালজাক, ফ্লোবেয়ারকে এবং গঁকোর। জোলির সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার এই হলো ইউরোপীয় পটভূমিকা।

উনবিংশশতাব্দীর এই সাহিত্যের বিবর্তনের ধারা ছিল ভিন্ন। অন্তত জোলি তাই বিশ্বাস করতেন। জোলির এই বিশ্বাস তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এই বিশ্বাস তার উত্তরজীবনের সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করেছে। জোলি আরো মনে করতেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব-শালী লেখকগোষ্ঠি এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন।

রুশ সাহিত্যিক উচিত হওয়ার আর হওয়া উচিত ছিল এই ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধিকভাবে রক্ষিত করা। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। মোক্ষির উপর সবচে বাধি পড়েছিল। এই সবচের রুশ সাহিত্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে কবিতার আবেগদীপ্তির মাধ্যমে। শেষ জীবনে মোক্ষি লিখেছেন: রুশ বুদ্ধিজীবীদের গর্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তারা বহুমুখী কর্মধারার পরিচয় দিয়েছে। তাদের সাহসিক চেষ্টার ফলেই যা-কিছু সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়েছে। রুশ প্রাক্তনের সাহিত্যিকেরা তাদের প্রতিভার মৌলিকত্ব এবং শক্তির দ্বারা এক নূতন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল যা সামাজিক সাধিত ফুলে যায়নি। এই সাহিত্য বিবেকের সচ্ছতা এবং সামাজিক ন্যায়ের সচ্ছতা নির্ধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল।" তলস্তয়, দুর্গেনেভ, দস্তয়েভস্কি, নেক্রাসভ—সকলেই লেখক হিসাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথা চিন্তা করেছেন এবং লেখার মাধ্যমে তা যথাসাধ্য পরিবর্তন করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। যে প্রশ্নগুলি তাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল তা হল: আমাদের কি কর্তব্য? অবস্থা কি করে ভালো করা যায়? এবং এই অবস্থার জন্য দায়ী কারা? তাঁরা কৃষিদাসপ্রথার আক্রমণ করেছেন এবং প্রজার অত্যাচারী জার (Tsar) শাসনকে ফাঁস করাই হবে রুশ সমাজের ঐতিহাসিক সাহিত্যের পরিপূরক।

সাহিত্য-জগতে মোক্ষির আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে রুশ সাহিত্যে অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দিয়েছিল। আগেই বলেছি মোক্ষি যখন কবিতা লিখতে সুরু করেছিলেন তাদের তখন অনুকরণী বলা হত। অবশ্য যাদের মধ্যে যাঁদের নাম রুশ দেশের বাইরেও পাঠকেরা স্মরণ করে তাঁরা দেরেক্‌ভোক্‌ভি এবং আলেক্সন্দ্রভ ছোক। এই মোক্ষির সঙ্গে খোলেমোর ও মাকারের এবং ইজরেল ফ্রাইবর্গ ও অন্যান্য ওয়াইস্‌কের আত্মিক সংযোগ স্পষ্ট। এরা বিশ্বাস করতেন না যে সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব আছে। পুশ্‌কিনকে এরা শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু পুশ্‌কিনের বিশ্বাস করিতা সম্বন্ধিতে (And long shall I be cherished by the people because I stirred good feelings with my lyre) তাঁরা সাহিত্য সম্বন্ধিতে অনাবশ্যক সমাজনীতি মনে করতেন। লারমন্টভের কবিতার অবজ্ঞার সৌন্দর্য সৃষ্টি করার কথাকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু লারমন্টভের উক্তি (Chagrined do I observe the present generation) কোনো কোনো অনুরাগী লেখক রুশ একাডেমির কথা স্মরণ আনিয়ে আপত্তি করেছেন। দেরেক্‌ভোক্‌ভি তাঁর এককালীন ভূমিকায় লিখেছেন: "যখন তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি প্রথমটি লিখিলায় আমি তখন রুশ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি স্মরণীয় পরিবর্তন আনে দেখিলায় কিংবা দেখবার ইচ্ছা করেছিলায়। এই বিশ্বাস আমার হয়েছিল তারপর আমি এর সঙ্গে রুশ স্মরণীয় বিশ্বাসের সাযোগ লক্ষ্য করেছিলায়।"

এই ছিল সাহিত্যিক আবহাওয়া এবং সামাজিক পরিবেশ। মোক্ষিকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠার হতে সুরু করতে হয়েছে। বাস্তবজীবনে আর্থিক দিকে থাকবার জন্য কম সংগ্রাম করতে হয়নি। রুশ মাতার বিশাল বিস্তারের উপর ঘুরে বেড়িয়েছেন। জীবনকে দেখেছেন এবং এটা এমন কিছু সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মোক্ষির দেখা জীবন প্রস্তুত-এর চুরিকের জীবন নয় কিংবা হেমরি জেম্‌সের। তাঁর জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প "চেলকাশ"। বিষয়বস্তু এই সবচের বিতীয়ার্ধের পাঠকের কাছে অপরিণত এবং রোমান্টিক মনে হতে পারে। চেখভ-এর কাছে বিষয়বস্তু রোমান্টিক এবং লেখকোচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু মোক্ষির লেখার টেক্‌নিক নিয়ে আলোচনা বর্তমানে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এবং মোক্ষি সম্বন্ধে আলোচনায় টেক্‌নিক্ আমাদের চিন্তার মৌল বিষয় হওয়া উচিতও নয়। যা বিশেষভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন তা হল মোক্ষির লেখা রুশ বিষয়বস্তু কতখানি এবং কি ভাবে সাধারণ করেছে। "চেলকাশ"

গরকির অন্যদের মতোই নীচুতলার মানুষের আত্মিক উন্নয়ন এবং ইতিহাসকে পরিচালনা করার ক্ষমতায় তাঁরও যে বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে তাই স্বাভাবিক বিলি এবং বাস্তবের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর পরের শেষ উপন্যাস "ফোমা গর্দেয়েভ্"। ফোমা উনি কোনো সময়ের একটি ব্যবসায়ী পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখা। বিত্তি ব্যবসায়িক এবং ঐতিহ্যের এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব—এই প্রবীণ লেখকের চিন্তা। লেখা এই পরিবেশ ঠিক ধরে রাখতে পারে না। যুগোপযোগী সমাজের অভাবই হোক বলে যে জীবনের অধিকার আমরা তাকে দেখতে চাই। প্রতিবাদের সুরই বড়। তবু বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই উপন্যাসে লেখার সক্রিয় সামাজিক সত্তার নেই। পার্শ্বচরী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রতিফলন। ১৯০৮-এ সাধারণ হয় প্রথম বড় বিপ্লব ঠিক আট বছর আগে লেখা লেখার একটি কবিতা। নাম "অন্ধকার পাখি" (The Stormy Petrel)। শেষ অংশ পড়ছিতে আমাদের বিপ্লবের পূর্বাভাস করছে :

আর সেই পাখি, পরাজয়ে এবং পাখি, যারা-ভোলা
অন্ধকার পাখি, ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়ায়, বিদ্যুৎ-চমকের
মতো দ্রুত
বজ্রের, গর্জনের, উল্লাস তরঙ্গায়িত সাগরে ঝটিকা—
প্রতিধ্বনিত
তার পক্ষপুটের ছায়, মেঘ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী……
ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝা আরও—
প্রবল প্রকোপে তার বিপুল আবেগ।

(অনুবাদ : নিখিলেশ সেন)

গোর্কি এই সময় থেকেই প্রচুর সম্মানিত হতে আরম্ভ করেছেন সাহিত্যকৃতির জন্য। এখন আর সাহিত্যচর্চার অন্যান্যের কথা নয় বলতে হবেনি। বোলশেভিকের সাহিত্যাদর্শে তিনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু বোলশেভিকের বৈজ্ঞানিকচিন্তা—আর্থিক ভূমিকাকেই উন্নত হয়—এবং তার কিছুটা প্রতিফলন তিনি লক্ষ্যকরেছিলেন তাঁর লেখেছিলেন গোর্কির সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠেছে। সমাজের উচ্চ শিক্ষার উন্নীত হলেও সাহিত্যের সামাজিক এবং বৈপ্লবিক শক্তির সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। এসময়ে সাহিত্যরীতি ও তার ব্যবহারিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি আরো সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। নাটকের মাধ্যমে মুক্তির অন্বেষণের মধ্যে বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য এই সময়ের নাটকের "নীচুর তলা" (The Lower Depths)। নাটক রচনা এবং তা পরিবেশনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা আছে। চেখভ্-এর বৈশিষ্ট্য হলো যে এক অদ্ভুত এবং অনিবার্য বৈশিষ্ট আছে তা গোর্কির নাটকে দূরত্ব হয়ে উঠেছে ঘটনা এবং ভাষার চলনবাচনে। ১৯০৭ সালে, প্রথম বড় বিপ্লবের মুহূর্ত পরে, গোর্কির মূলধারার রচনা "মা" (Mother)। বইটি আজ সাহিত্যক্লাসিকে পরিচিত। লন্ডনে যখন মেক্সিমের সঙ্গে গোর্কির সাক্ষাৎকার হয় তখন মেক্সিম বলেছিলেন যে এই ধরনের বই-ই বর্তমান সমাজের দরকার। অবশ্য সাহিত্যের এটা প্রচার উপন্যাস। লেখক ঘটনা উপন্যাসে মহিমা হয়েছে তা ঘটেছিল ১৯০১ সালে, সাভিনভ্ (Savinov) লেখায়। এবং উপন্যাসের দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র—ব্যাসভ্, এবং তার মিথ্যা মা—গোর্কির ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে গোর্কি লেখিয়েছেন এই সাভিনভ্ লেখার শিল্পপতিদের নীচুতলার জীবন—তাদের মদ্যপান, তাদের ভাষা, তাদের উৎসব বিবাহ এবং নিজেদের অবসাদগ্রস্থে বোধহীনতা। কিন্তু ধীরে ধীরে মুক্তির মূলধারার তাদের জীবনে লেখা দেয়। উপন্যাসে এই মূলধারার কোনরকমই ত্রুটি ঘটেই থাকেনি। এরা ব্যবহারিক স্তরে নিম্ন এসেছেন বৈপ্লবিক কার্যধারার সঙ্গে যুক্ত করে। বিপ্লবিক উপন্যাসের মধ্যে যা লেখতে চেয়েছিলেন—social dynamism—তা উপন্যাসে এই রচনায়। "মা"-এর পরবর্তী রচনা "সাভিনভ্-দের ব্যবসা" (The Artamov Business) এবং এর পরবর্তী রচনা "ক্লিম সামগিনের জীবন" (The Life of Klim Samgin)। প্রথম উপন্যাসটির বিষয়বস্তু মূলধারা ব্যবসায়িক জীবন। এর আত্মিক অসুবিধা এবং অবক্ষয় এবং এই অবস্থায় পরিবর্তনের যে তারে বিপ্লবের

প্রয়োজন। "ডক্টর জিভাগো" বলা যায়, পোস্টের মহাকাব্যিক উপন্যাস। চার খণ্ডে সমাপ্য (চতুর্থ খণ্ড অসমাপ্ত) এই গ্রন্থে রুশ বুদ্ধিজীবীদের অর্ধশতাব্দীব্যাপী ইতিহাস—তাদের উৎপত্তি, তাদের ঘরোয়া-বৈঠকী এবং তাদের অন্তিম পরিণতি। পোস্টে দেখিয়েছেন কেন রুশ বুদ্ধিজীবী সমাজ বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছিল। এই অক্ষমতার জন্য পোস্টের কোন সহানুভূতি ছিল না এই সমাজের প্রতি। কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্য ছিল সাধারণ। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। ডক্টর সাধারণের ব্যক্তিগত ট্রাজেডি সামগ্রিক রুশ বুদ্ধিজীবী সমাজের ট্রাজেডি যেমন পোস্টে সাহিত্য রচনার চাইস-চরিত্রে আঁকা যায়নের। রুশ বিপ্লবের ফলে বুদ্ধিজীবীদের সামগ্রিক ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ট্রাজেডির পরিচয় পাওয়া যায় পাস্তেরনাক্-এর উপন্যাসে—বিতর্কমূলক উপন্যাস Dr. Zhivago।

পোস্টে কবি ছিলেন না, যে কয়েকটি কবিতা লিখে ছিলেন তা অঙ্গুলি গণনায় শেষ করা যায়। তার অর্থ এই নয় যে পোস্টের কবিতা উৎকৃষ্ট। বৈষয়িক জীবনার্জনে সাধ্যে রুশ ফেরার বাসির গ্রন্থ করেছিলেন "মায়াকোভস্কি" ও আরো অন্যান্য অনেকে। কিন্তু যে বিশ্বাস তাঁর রচনায় অনুপস্থিত তা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যে "সৌন্দর্য বস্তুটির বিদায় করে গেছেন :

আমি যাবো পথ দিয়ে করে যাবে কাজ,
যেখায় আসাতে সেবা সাহায্যের পেয়েছো দাবী।
আমি তার সঙ্গহারী সেবা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখা যাব চিহ্ন রাখিবে না।
পর পর সাধারণের জন্মপথ-'পরে
ধরা কাজ করে। (ধরা কাজ করে)

পরাধীন বিতীয় বন্ধনে পোস্টে যন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক রূপ দেখে যে সাহিত্য রচনা করা তা উনবিংশশতকীয় ধারায় বাস্তবধর্মী সাহিত্য হবে না। সোভিয়েত সাহিত্য হবে ভাবময়, আশাবাদী, ভবিষ্যৎবিশ্বাসী। সাহিত্যে ফিরে আসবে আবার মহাকাব্যিক চরিত্র এবং অবিচ্ছেদ মানবিকতা। ইলিয়ট যুরোপা পরিবেশে "দোহরা জমিন" (The Waste Land) রচে যাঁদের সোভিয়েত সাহিত্য শোনাবে উৎসবের আহ্বান। পোস্টের আশা কতখানি ফলবতী হয়েছে তা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে মহৎ দুই আশে উনি ঘালিয়েন এবং আজু সিনোভিয়ের বিচার এবং আমাদেরগুলো প্রমাণিত অন্য পোস্টের আশা সম্পূর্ণ হয়নি - সেলোকভের কথা ঠিক। তবে - আমরা সেই কালান্তরের কবির আগমনবার্তার জন্য অপেক্ষমান।

—বিশ্ব মানবতা—

❀ আলবেয়ার কামু ❀

সুস্মিতা ভট্টাচার্য্য
প্রথম বর্ষ—রাজনীতি

১৯৫০ সালে নোবেল কমিটির সভা যখন স্থির করে আলবেয়ার কামু The Plague উপন্যাসের জন্যে নোবেল পুরস্কার দান। বিশ্বের সমালোচক মহলে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত এই ঔপন্যাসিকের জন্ম ১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর—উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়াতে। এক গরীবতিয়া ছাত্র পরিবেশে তাঁর শৈশব কেটেছিল। সেখানকার তখন মরুপ্রায় প্রান্তর, নিসর্গবিচিত্র দৃশ্যাবলী পরে এবং প্রচণ্ড সূর্যতাপে উত্তপ্ত ধূলিধূসর রাঁর চিত্র এবং আচরণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে কামু একজন আদর্শ আলজিরিয়ান যুবকের মতো ধীরাধরনহীন বোহেমিয়ান জীবন যাপন করেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ থেকে আরম্ভ করে দারিদ্র্য, সাংসারিক অশান্তি, রোগ প্রভৃতি তাঁর এই বেপরোয়া জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কখনও অন্যান্য সহজ মানুষদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। প্রথম যৌবনে ফুটবলকে ভালোবেসে ছিলেন। আলজিয়ার্স শহরের একজন খেলোয়াড় হয়ে সে ভালোবাসার মর্যাদা রেখেছিলেন পরিপূর্ণভাবে। পরবর্তীকালে জীবিকার সন্ধানে একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। সেখানেই তাঁর লেখনী চর্চার সূত্রপাত হলেও বিপ্লবিদের জন্য এক ফেরেবীর অনুরোধে সে চাকরী ছেড়ে দেন এবং ফ্রান্সে গিয়ে একটি ছোট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানকার শান্ত নির্জন পরিবেশে প্রচুর সাহিত্য চর্চা শুরু।

কামু অস্তিত্ববাদী কিনা প্রশ্ন করা হলে আধুনিক দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে একদা বলেছিলেন "আমি কামুকে অস্তিত্ববাদী বলে মনে করি না।" সার্ত্রের মতো একজন অস্তিত্ববাদীর মুখ থেকে এ ধরণের মন্তব্য অনেকের মনেই কামুর চিন্তাধারা সম্পর্কে বিভ্রান্তি জাগাতে পারে। কিন্তু যদিও সার্ত্রে কামুর সমালোচক এবং দুজনের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল, তা সত্ত্বেও সার্ত্রে মতবাদকে স্বীকার করে অনেক সমালোচকই বিশ্লেষণে কামুকে অস্তিত্ববাদী বলে মেনে নিতে পেরেছেন। ব্যক্তির সত্তাতার প্রশ্নে যেভাবে বিশে শতাব্দীর ঐতিহাসীয় সমাজজীবনে এবং মানবিক মূল্যবোধকে বিপন্নির করেছিল তার অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ একদল দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। আক্ষরিক অর্থে ঔপেক্ষে Classical Pessimist আখ্যা দিলেও এঁদের জীবন সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক মূল প্রেরণা প্রবল মানবতাবোধ। জগৎ ও জীবন নিয়ে এদের অনেক আশা ভঙ্গ যাতনাময় আঘাতে অতলান্তে দুর্ভ। ফ্রান্সের সার্ত্রে অথবা জার্মানীর কাফ্‌কার মতো আলবেয়ার কামুকেও মোটামুটিভাবে এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। যদিও দার্শনিকের কোনো বিশেষ শ্রেণীবিভুক্ত করে তাদের অকৃত্রিমতার পরিচয় দেয় তবুও এক নজরে দেখলে কামুর মানবিকতা ও গভীরতর স্তরে উত্তরণের চিন্তার অন্তর্নিহিত অস্তিত্ববাদী Classical Pessimist-দের থেকে ভিন্ন বলেই মনে হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গীকরা কারুর কোনো ব্যবহার জন্য পরিলক্ষিত না। শুধু ছুটে আসে সঙ্গীর নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা। মানুষের সর্বপ্রকার সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের অসারতা তাঁর চোখে ধরা পড়ে তাদের কাছে বিশেষ। যে সহানুভূতি মানব সমাজের মূল বন্ধন কারুর কাছে তাই ব্যর্থতার মূলোপ মুক্তিতা বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ যুক্তিজালের আঘাতে মূলোপ খুলে পড়ে। প্রতিটি মানুষের 'আলাদা আলাদা বিশ্বের মাঝ.....বিচ্ছিন্ন অন্তরালে চাকা বিবরকোষে..... মাঝ একের সঙ্গে অন্যের কোনো মূলগত যোগাযোগ নেই। এমনকি মনের মূল অনুভূতি - ক্ষুধা প্রেম, সুখ, দুঃখ এগুলোও তাঁর সর্বগ্রাসী বিশ্লেষণের কবলে পড়ে হয়েছে অর্থহীন, বিবর্ণিকর এবং হাস্যাস্পদ। এর কারণ জীবনের কোনো সার্থকতাই তিনি খুঁজে পাননি। এমন কোনো অবলম্বন তিনি না যার ওপরে তাঁর বিশ্বের অস্তিত্ব কল্পিলের মতো চিরন্তন স্পর্শ রেখে যেতে পারে।

আধুনিক বস্তুগ্রাসী ঔপন্যাসিকদের মতো কারুর রচনার মধ্যেও নীতির। প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা Caligula নাটক ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর পর L. Etrange (১৯৪১) প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আলোড়নকারী লেখকের হিসেবে তাঁর নাম intellectual মহলে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর একাদিক্রমে বেরোয় Le Myth de syophe (১৯৪২), La Peste (১৯৪৭), Les Justes, (১৯৪৯), L. Homme Revolte (১৯৫১) এবং La Chute (১৯৫৬)।

কারুর প্রথম সাড়া জাগানো উপন্যাস L. Etrange (The Outsider)-এর নায়ক Meursult এর আশ্চর্য মানুষ। আলজিয়ার্স শহরের আর পাঁচজন অফিস কর্মচারীর মতোই তার দৈনন্দিন জীবন। বন্ধু, আত্মীয়, অফিস, প্রেমী ইত্যাদি নিয়ে তার সময় কাটে। বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সম্পর্কের তার চেয়ে কিছু ভালো লাগে। কিন্তু কোনো কিছুই তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। বিশ্বের কিছুতেই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পারায় সদা সে মনে মনে নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে। আসলে সব কিছুই তার কাছে অর্থ-পরিচিত। তাই হোকবার কারণবারের অথবা কোনো বেশে অপরিচিত আবরণ কেন মনে হয় নিজেকে। উপন্যাসটির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের মূলগত অসারতা কারুর লেখনীতে পড়ে করুণ রসে রূপায়িত হয়েছে। Meursult-এর মা মারা যেতে মৃত মায়ের পরিচয়ের পাশে বসে তার এক কাপ কফি খেতে ইচ্ছে করে বিশ্রিত পড়া মনকে চাঙ্গা করে নেবার জন্যে। অথচ পাশেই মায়ের বান্ধবীরা কান্নাকাটি চোখের জল ফেলছে। তাদের মনে হচ্ছে এ সময়ে তার কাঁদা উচিত। কাঁদা পাচ্ছে না দেখে অবাক লাগছে। কিন্তু মুখে যে দুঃখের এটার একান্তভাবে সত্য। অথচ পৃথিবীতে তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। আর এক জায়গায় প্রথমটির সে অস্বীকারের কথা জানায়। কিন্তু ভালোবাসার কথা উঠলে আশ্চর্যভাবে হেসে ওঠে। ফাঁসীর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও তার মনের প্রশান্তি মুছে যায় না, সরীসৃপে।

The outsider-এ মানবজীবনের অসারতা এবং নিঃসঙ্গতা নিঃসংকোচে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণভাবে আমরা যে মানুষটির জীবনের সার্থকতা খুঁজতে চাই তা যে আসলে সত্যের ছাড়া আর কিছুই নয়, মূল অনুভূতিগুলোও যে এক-একজনের মানসিক বিকৃতি। The Outsider-এর প্রতিটি লেখকের মনে এ ধারণা জন্মে যায়। বক্তব্য অতি সহজ, জিজ্ঞাসীন এবং অসাধারণ যুক্তিনির্ভর ভাবে উপন্যাসিক করে কারু কোনো পাঠকের পাঠিয়ে যাবার অবকাশ রেখে নি। আসলে Meursult-কে অস্বীকার করা যায় না। অন্তত: লেখকের মতে যায় না। সত্য পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হ'লে তা যে কত ভয়ঙ্কর এবং কত অস্বস্তির কারণ হয়, The outsider-এর মূল পরিবিতে তার মধ্যে প্রকাশ আছে।

'Lechute' (The Fall) আলিকের বিচারে উপন্যাস কিনা সে বিষয়েই মনে সন্দেহ জেগে যায়। এর কাহিনী একটি বারের তার বিবরণ পাঠক পায় এক বারের অসারতা প্রকাশের মাধ্যমে। Jean Baptiste Clamence প্রথম যৌবনে প্যারী শহরের

নায়কের ব্যক্তিত্বে। শুধু অর্থ উপার্জনেই না—শিক্ষায়, আচরণে, সামাজিকতায় তাকে একজন চরিত্রবান মানুষ বলে সকলেই অভিহিত করা যায়। স্নায়ু এবং সংবেদনশীল দিকের সে পরিচিত বন্ধুদের যেন সুবাস পেয়ে থাকে। কোর্টে যাবার পথে অপরিচিত পথচারিদের মাঝেমধ্যে ফুলে দিয়ে যাচ্ছে অথবা দুঃস্থ পথচারীকে ডাকা গাড়ি করে দিয়ে যাচ্ছে যেন আমাদেরই হয়। কোর্টে মামলা চলার সময়ে তার অভিন্ন সেই যার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করেছে সেই ব্যক্তি Jean Baptiste-র কাছে ঋণী ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বিচার মহাশয়ের একলা বেড়াবার সময়ে রহস্যময় একটি হাসির শব্দ তার কানে আসে। আশ্চর্যান্বিত মনে হয় এ হাসি যেন তাকেই ব্যঙ্গ করে। হাসির কারণ অনুসন্ধানে ব্যারিস্টারকে বলতে হয় আত্ম বিশ্লেষণ। তোষে পড়ে যে মানসিকতায় তার দয়া প্রকাশ পেয়েছিল তা আসলে আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকদেখানো, অপরের উপকার করা আসলে আত্মতৃপ্তিরই একটি বিশেষ উপায়। এ সত্য কিন্তু ঢাকা পড়েনি। ব্যারিস্টার সে সাধারণ মানুষ, তারা যেমন ভেবে থাকে।—অন্তত Sean-এর তাই বিশ্বাস। মধ্যাহ্নের হাসি যেন তাদের সকলের মনের প্রতীক।

এই চিন্তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে Jean Baptiste-র মনে আসে সমগ্র জীবনের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা। ফলশ্রুতি আত্মকেন্দ্রিক একটি মানুষ হিসেবে সে চায় তার জিজ্ঞাস বাকি সময়কে চিরস্থায়ী করে রাখতে, অর্থ মানুষের বেঁচে থাকাই যার একমাত্র উপায়। কিন্তু বিচারক হিসেবেও তাকে সে সুযোগ দেয় না। নৈরাশ্যকে ভোলবার জন্যে একদিনের চরিত্রবান ব্যারিস্টার শেষ অবধারে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগমন ইঙ্গিতে শুরু ১৯৩৯ সালে। কামু তখন জার্নাল Combat নামে এক পত্রিকার সম্পাদক। জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণে প্রতিরোধী জাতি তখন বিপর্যস্ত। অধিকাংশ নরনারী সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসে সমবেত হয়েছে জাতীয় পতাকার তলায়। নির্বিকারচিত্ত কামুও সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। ১৯৪০ সালের বিদ্যাতে দেশব্যাপী Resistance movement-এ সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

এই সময়েই রচিত হয় কালজয়ী উপন্যাস L. Peste (The Plague)। পুস্তকাকারে এর প্রকাশ অবশ্য অনেক পরে—১৯৪৭ সালে। কামুর অন্যান্য অনেক অনুরাগী ব্যক্তিদের মতো আমিও এই উপন্যাসটিকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে স্বীকার করে থাকি। Oran শহরে প্লেগ এর আক্রমণ এবং মহামারী রূপে প্রকাশ এই উপন্যাসের বিষয় বস্তু। প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণের সামনে অসহায় বিপর্যস্ত মানবজীবনের আর্তি পাঠকদের সিহরিত করে। মহামারীর বিভীষিকা বর্ণনায় এমন ধরণের বাস্তবতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যে পাঠক বই ফেলে সহজে উঠতে পারেন না। বইয়ের প্রতিটি পাতা যেন উঠকে ফেলে ধরে থাকে। চূড়ান্ত বিভীষিকার আমরা কিন্তু Oran-এর একদল বেহায়াদেরও প্রাণ বুদ্ধ করে তাদের মেনে পড়ে। মানুষের মেরাই তাদের একমাত্র ধর্ম। এদের মেরুর মেন শহরের প্রধানতম চিকিৎসক Rieux। তবে অন্যান্য স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার অনীম সাহসের সঙ্গে মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যান। বিপর্যয়ের মধ্যে কিছু কিছু লোক বিজয়ী হয়ে বসে থাকে। তাদের মধ্যে মহামারী অভিশাপের শক্তি। পাদ্রী Penela এদের অন্যতম। কিন্তু বিশাল আক্রমণে মৃত্যু তাঁর আক্রমণে সংসারে আঘাত হানে। তাঁর মনে কোনো দ্বিধা নেই—পাদ্রী হিসেবে ঈশ্বরের আঘাতের পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তাঁকে তাদের মানুষেই হবে। সে অসহায়। আর যখন Penela নিজেই হঁসেন আক্রান্ত তাঁর শেষ আশ্রয় তখন Rieux-এর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সমস্ত বিশ্বাস হয়ে যায় বিস্মৃতি।

মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়ই যে সংগ্রামের এই সত্যটি কামু উপলব্ধি করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। Oran শহরের প্লেগ যে আসলে নাৎসী বাহিনীরই রূপক সহজ প্রতীক তা মুখে বিশেষ করেছেন বলে মনে হয়। এতদিন যে কামু ব্যক্তি মানুষের অন্তর্জীবন সম্পর্কে নিরুপায় ছিলেন, সমাজের মধ্যে সক্রিয়ভাবে

সংগ্রামে তিনি বাঁচার নতুন প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন। সত্যের জন্যে মানবতার জন্যে এক ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহকে তিনি বিফল মনে করেন নি। The plague-এ এসে তাঁর অভিজ্ঞতায় সার্বজনীন মানবচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্ন থেকে যায়; The plague এ আশাবাদ কামুর শেষ কথা ছিল। যদিও একথা অধিক সত্য যে এ উপন্যাসে কামুর সম্পূর্ণ জীবনদর্শন একটা নতুন রূপ গ্রহণ করেছে, তবুও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে classical pessimism-এর কবল থেকে কামু পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেন নি। না হলে ১৯৫৬ সনে The Fall-এর সৃষ্টি হতো না। The Outsider এ যে বাণী নিয়ে কামু জীবনযাত্রা সুরু করেন The Fall (কামুর শেষ রচনা)-এ তারই পরিণতি। মানুষ অবশ্যই বহু বিচিত্র আশার আলো এসে পড়লেও শেষ পর্যন্ত মানুষের আস্তিত্বিক চিন্তা কামুকে সান্ত্বনা দেয়নি। মানবতার আদর্শ যদি সমাজে অন্যায়ীদের পর্যায় থেকে অন্তরীণ নিতে পারে, কিন্তু কামুর আত্মজা চিরস্থায়ীদের প্রতি। সেখানে সমাজ, জাতীয়তাবোধ, আদর্শ, বিশ্বমানবতা কিছুর প্রতি মোহ নেই। শুধু আছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কামুস আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা কামুর অপূর্ণই রয়ে গেছে।

কাব্যে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা
ও
লোকচরিত্র বিশ্লেষণ

—শ্রীবীণাপাণি দেবী

কালিদাসের মেঘদূত বলিলেই একটি মনোরম ছন্দোময় চিত্র মনের মধ্যে ভাসিয়া ওঠে।

কিন্তু এই প্রেমাবলীর মধ্যে মধ্যে অনেকটি শ্লোকে যে অন্য ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অল্প।

উদাহরণ স্বরূপ একাধিক শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

"ধূমঃ জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ,
সন্দেশার্থাঃ ক পটু করণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।"

(পূর্ব মেঘ - ৫)

ধূম, মেঘ, জল ও বায়ু যে মেঘের উপাদান তাহার উল্লেখে কবির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের ভাবধারায় মগ্ন কবি শুধু মেঘকে একটি অচেতন পদার্থ বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতেন তাহা না বলিয়া তাহার উপাদান গুলি পটু করিয়া বর্ণনা করায় বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগিয়াছে। চেতন ও জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্যও প্রস্ফুট হইয়াছে।

"কর্তুঃ জন্ম প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং,
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।"

(পূর্ব মেঘ - ১১)

মেঘের গর্জন শিলীন্ধ্র উৎপন্নের কারণ, শিলীন্ধ্র যে ছত্রাক দ্বারা বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা ভূমিকে উর্বর করিয়া শস্যোৎপাদনের সহায়তা করায়।

ইহাও কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নহে?

এই দুই উদাহরণ হইতেই জানা যায় যে প্রকৃত কবি প্রকৃত সত্য সন্ধানী, শুধু কাব্যালোকে ভ্রান্তিয়া থাকেন না, সত্যকে প্রকাশ করেন।

মেঘের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন "যাতা মেঘা অবশ্যিতমে নাথবে লঙ্ঘয়ন্তা।"

হীন ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা মহৎ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা বিফল হওয়া শ্রেয়। ইহা অপূর্ব নীতি উপদেশ ও লোকচরিত্র বিশ্লেষণ। আমরা দেখি কোন নীচ ব্যক্তির যদি সহায়তা গ্রহণ করি সে সেই সহায়তার সুযোগ লইয়া বহুরূপে অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে, আবার সে সহায়তা প্রত্যাহারে দুঃখ মনে করে এবং নীচ চরিত্রের যে বিশ্লেষণ দুঃখের প্রতি অবজ্ঞায় তাহা প্রকটিত হয়।

তাই কালিদাস বলিলেন "নাথবে লঙ্ঘয়ন্তা"।

"প্রকৃতি পরিণতা ন খলু ক্ষতি র্যান্তি নিষ্ফলো মেঘঃ।
নীচো বক্তি ন মুঞ্চতে ন ক্ষতি মুজনঃ করোত্যেব"।

উক্ত মেঘের ৪৩ শ্লোকের ইহা তাৎপর্য। অপরোক্ষ মেঘে ইহা উদ্ধৃত হইল না। ইহা লোকচরিত্রের আর একটি দৃষ্টান্ত। পরোপকারে মেঘের গর্জন সার, বর্ষণ মেঘ নীরবে বর্ষণ করে। নীচ ব্যক্তির যৌথিক ভদ্রতা সার মুজনের কার্যে প্রকাশ।

ইহা ব্যতীত মেঘের গতিপথ বর্ণনায় কবির ভৌগোলিক জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি কালিদাস শুধু উপমার অনুপম নহেন, তাঁহার কাব্যের অন্তরাল কবির অন্য এই সকল অনুপম ভাবধারাও অনবদ্য হইয়াছে।

বরাসিত্রী শ্লেসীয়ার ২৫ দিন

—উমেশ মুখোপাধ্যায়
২য় বর্ষ, বাণিজ্য

অবশ্য মীরবস্তা। প্রভাত হতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে। পূর্বে থেকে রোদ্দালাইটা বেরুচ্ছিল। হাতঘড়িতে হাতঘড়িতে রোদ্দালাইটাও পাল্লা দেয়। বাবে এক ঘিরি ঘিরি শব্দ। পুলকিত হ'লাম, তবের আয়োজন হচ্ছে। রোদ্দালাইটা জেগে তবে তবেই তাবরুকের আবহাওয়া পোষাক পরীক্ষার সঙ্গে এটে নিলাম। Two men rope- পার্শ্ববর্তী সঙ্গীও তৈরী। বাইরে আসতেই একটা হৈমন্ত প্রবাহ সারা শরীরটাকে যেন ছড়িয়ে নিয়ে গেল। আর ঘন্টার মধ্যে সবাই প্রস্তুত। দলটি ছুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে অজানা পথে যত্ন আবাধিত আয়োজনের অন্তর মৃদু মৃদুগামীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু হল। সূর্যদেব তখন পূর্বাকাশে উদিত হননি। কিন্তু পাহাড়ের একটা নিজস্ব আলো আছে, আর চারদিকের আলো আবারী বিভিন্ন বিচিত্রতার ছটাগুলি যেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সেদিন আবহাওয়া ছিল অনুকূল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা কম। তাই বিছানা আমাই যেন আমাদের উদ্যমকে বাড়িয়ে দিল। পায়ে ভারী বুট, পরিধিত পোষাকেরও বেশ ওজন আছে। পৌঁছে যাবার এক আবহাওয়ার ট্রিটিকাকি ঝিলিয়ে যোগাই অনুভাব। প্রত্যেকের কোমরে দড়ি বাধা। কখনও ছাড়ু অবধি আবার কখনও কোমর অবধি ডুবিয়ে চলে যাচ্ছি। বরফ ছিদ্রের অন্যত্র যাবে সবল অন্তরবাস ছিদ্রে গেছে। বুটের তলার লাগানো ক্রাম্পন এবং হাতের চুপার দুটার এর সাহায্যে বরফের মধ্যে ধাপ কেটে কেটে কোন রকমে অগ্রসর হতে লাগলাম। শরীর ঘামে ভরে, আসছে। প্রতিসপ্তাহে বিশ্রাম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এত পরিশ্রম করেও আমাদের উদ্যম একটুও দমে পড়েনি। আমরা এগিয়ে চললাম। পরিশ্রম লাঘবের জন্য গান ধরলাম 'চল্ চল্ চল্……।' হঠাৎ গতি হল স্তব্ধ। সামনে দেখলা এক খাড়া ঢাল Ice axe টুকু করে দেখালেন আমাদের অন্তর পুরু 'মৃদুগামী', আর অন্যেরা ছুটি টুকু। সূর্যের আভায় বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আড়াল থেকে তার উষ্ণতা তখনও প্রকাশ হয়নি।

আমার ঘড়িতে এখন ৯টা (তারিখ 24. 7. 67), উচ্চতা মাপক যন্ত্র তখন ১১০০০ ফুটের কিছু বেশী উচ্চতা নির্দেশ করছে। আড়াল থেকে প্রকাশিত হয়ে সূর্যদেব আমাদের প্রথম স্বাগত জানালেন। তৃতীয়বার মৃদুগামীর পুরু বরফ পর্বতে অভিত হল। অপূর্ব শিহরণের বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের সবো প্রবাহিত হল। আমরা সফল হয়েছি।

আমাদের অভিযান ছিল ৪০ দিনের। ১লা জুলাই তারিখে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আমরা যাত্রীরা এসে মিলি হ'লাম Himalayan Institute of Mountaineering, হিমাচল প্রদেশের মানালীতে। উচ্চতা ৬০০০ ফুট। ছোট সহর এই মানালী। পাইন, ওক, দেবদারু গাছের ফাকে ফাকে গ্রাম, বাজার। আবহাওয়া নিয়ে প্রথম পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে বিশাখা। কোন ভীতি নেই। একই এক ধারে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ফুলের বাগান সমন্বিত আপেল গাছে পরিবেষ্টিত অনেকখানি কালো আকৃতির বাড়ী নিয়ে আমাদের Institution.

৯ই তারিখ প্রাতরাশ সেরে Pack lunch সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম acclimatizing march করতে। ৯০ ডিগ্রি চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে বিকালের দিকে আমরা

নিয়মিত। Afternoon tea নিয়ে বাজারে এসে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জানলাম এখানে ঠিকাদারী এবং সাহায্যকারী সংখ্যাই বেশী। ফলতঃ এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, উপজীবিকা দিন মজুর খাটা। কিছু কিছু লোকে বাবসা এবং চাষবাসও করে থাকে। এরা তিব্বতী বা পাহাড়ী ভাষায় কথা বলে, তবে হিন্দী বুঝতে এবং বলতেও পারে। এদের মেয়েদের মধ্যে মেয়েসাহেবীর সংখ্যা কম নয়। সকালের পরিষ্কার রোদে সন্তানদের সুরারী (Rice Beer) খেতে দেয় থাকে। পুরুষের স্বভাব ভীরু হলেও সময়ে সময়ে স্বার্থের জন্য খুন জখমও করে থাকে। পুরুষ এবং মেয়েরা উভয়েই অত্যন্ত পরিশ্রমী, কিন্তু আমের সেই বিলাসী ভাব প্রায় আদৌ নেই। জীবন সংগ্রামে এরা কোন বাধাকেই অগ্রাহ্য না করে কিছু কিছু রিলিফ্ দিয়ে থাকেন।

পরের দিন Medical test হল। Medical officer পাহাড়ের স্বাভাবিক অসুখ অর্থাৎ Headache, dysentery, fever and cold, heart palpitation, sleeplessness, vomiting tendency, shock, lonely feelings, sun burn, snow blindness প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্কতা ও এদের প্রতিকার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এরপর Institution-এর আমরা আমাদের সকলে কাজে আর কথা বললেন।

৪ তারিখ আমরা পাহাড়ে চলবার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি যেমন Rock climbing, Rappling, River crossing, Rope knot প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলাম।

৫ তারিখ Food এবং Ration প্রভৃতির সমস্ত জোগাড় যন্ত্র করে আমাদিগকে তৈরী হয়ে থাকতে বলা হল। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে চাল, ডাল, আটা, সুজি, তেল, ঘি, লবণ, মসলা প্রভৃতি নিলাম। এ ছাড়া সঙ্গে নিলাম টিনে প্যাক করা বিবিধ খাদ্যদ্রব্য—চকোলেট, বিস্কুট, Hot drinks, মাখন প্রভৃতি। এদের সঙ্গে চলল কয়েকটা ঘোড়া, খেচ্চরনি এবং বেশ কয়েক গাদা কেরোসিন তেল এবং কেরোসিন স্টোভ।

'আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু'। Ration, Equipments প্রভৃতি আগে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা ৬-৩০ মিনিটে ৭ তারিখ সুপারভাইজার Mountaineering সোসাইটি। সঙ্গে নিলাম ৩ জন কুলি এবং দুইজন পাচক। সেখানে ৭-৩০ মিনিটে বেলা ১১টা নাগাদ এসে পৌঁছালাম ৮ মাইল দূরবর্তী 'থাংলুতে (উচ্চতা ৮৮০০ ফুট)। এখানে Break first করে বাকলাম বাকীদের জন্য ১০ খানা খচ্চর (Mule) ভাড়া করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। ৩ মাইল রাস্তা চড়াই ভিঙিয়ে দুপুর বেলা এসে পৌঁছালাম লোটাকলাম (১০৫৪০ ফুট)। সেখানকার ডাকবাংলোয় মানুষ উঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে থাকে। স্নানাহারাদির পর শুয়ে শুয়ে গল্প করলাম। এবার শুরু হল উৎরাই। ৭ মাইল উৎরাই ভিঙিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমরা এসে পৌঁছালাম 'গ্রুবুতে (উচ্চতা ১০,১০০ ফুট)। এখানে একটা অস্থায়ীর ডিসপেন্সারি খুলে বসলাম ... তিব্বতীদের বিনে প্রতিকার চেষ্টা নিজে হা। ইতিমধ্যে আমি ইন্ডিয়ান স্টোভে খেলবার জীবন অভ্যস্ত। এখানে আমি ছাড়া একজন ডাক্তার থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সঙ্গে কোন ডাক্তার ছিল না। মাইনাস সন্ধ্যাবেলার আমাকে ১২ খানা বিভিন্ন চ্যারেক্টার ও একজাক ইনজিকশন দাইয়ে একটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল। এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জীবনে প্রথম খচ্চরের পিঠে চাপলাম। পাহাড়ের উপর দিয়ে খচ্চর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। অদূরে পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে পাথরের চাই প্রবল গর্জনে নেমে আসছে খাদ সেই গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খচ্চরটির নাচানাচি লাগল। উপরে আমার দুর্বল শরীরের অবস্থা না বলাই ভাল। হঠাৎ আমার চোখে ধাঁধিয়ে গেল। এবং মূর্ছা গেলাম। খচ্চরের উপর সূর্যের রশ্মি পড়ে সমস্তটা বিদ্যুতিত হচ্ছে। প্রত্যেকের চোখে খুব ধাঁধিন লাগা। কয়েকটা বেখাপ্পা রকমের বড় বড় পিঠে একজন আরোহীর পক্ষে আমার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই এইভাবে চন্দ্রভাগা নদীর ধার দিয়ে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করে ৯ তারিখ আমরা 'মেরোলাগ্রা' (উচ্চতা ১১,৩০০ ফুট) এসে চন্দ্রভাগার তীরে অবতরণ করলাম। পথে একটা বড় 'হ্রদ' দেখিয়ে বলেছিল

ছিলাম। এখান থেকেই বরফ বাহিবীদের বিদায়, ৫০ জন কুলি জড়ো করলাম। তারপর তাদের সাহায্যে ফুলে ফুলে সজ্জিত নদী অতিক্রম করে কখন উঁচু, কখন নীচু, কখন বা বালির মরুভূমি ও মাইল পথ পেরিয়ে পৃথিবীর অন্যতম দূরে যাত্রীদের শ্রেণীভার পাদদেশে বিশাল বেলা পৌঁছালাম। এখানকার উচ্চতা ১৩,১০০ ফুট। কুলিরা আর বেশী উঁচুতে রাজী না হওয়ে ফিরে গেল। সঙ্গে রইল দুই জন শেরপা ও ছয় জন কুলি (high altitude porter)। সবাই মিলে জটলা বসলাম। পেরপা তথা গাইড পরিহাস ছলে তুলিয়ে দিলেন জটলা ফুলে যাবা ভাল, যদি কেউ ফিরে না আসি। এখানেই আমাদের Base Camp স্থাপন করা হল। আমি ছিলাম Equipment incharge; তাঁবু, দড়ি, সিলিং, পিটন, ক্যারাবিনা, হাতুড়ি, আগুন, উনান ইত্যাদি যাবতীয় যন্ত্র, জন্তুর প্রভৃতি পাহাড়ে উঠার যাবতীয় সরঞ্জাম ঠিক আছে কিনা দেখে নিলাম। একটা ছোট্ট সেবা হয়েছিল। রাতে সেটা ছোট্ট বেলা ভোজ করা গেল। মুসকিল হয়েছিল এখানে কোন গাছপালা না থাকায়। তাইতো সন্ধ্যা-বেলায় Father Jacket পরে তাঁবুর বাইরে আগুন পোহানো আর গানের কণ্ঠে গান করবার আয়োজন. টুকু ত্যাগ করতে হ'ল। পরের দিন আমরা ১ মাইল দূরবর্তী Camp No. 1-এ আমাদের কিছু কিছু মাল ফেলে আসার ফিরে এলাম। রাত্রাসের মোটামুটি একটা ঘাস তৈরী করে আমরা ১০ তারিখ এসে হাজির হ'লাম Camp No. 1-এ, উচ্চতা ১৬,৮০০ ফুট নীচে।

আমার সঙ্গে বিভিন্নদেশের পাখী আমাদের খুবই আকর্ষণ করেছিল। পরিচিতের মধ্যে চড়াই, শালিক, হাঁস, কাক এবং এছাড়া নানা রঙের পাইড বেলনার হয় আমা নদীর ধারে লাল এবং কালো রং বিশিষ্ট সুন্দর ছোট ছোট পাখীর উল্লেখ করা যায়। অন্যান্য অন্য বিশেষ কিছু না দেখলেও চিতা, ভুষার সিংহ, ভুষার ভালুক প্রভৃতি থাকে। তবে আমাদের চোখে পড়েছিল লম্বা শিংওয়ালা বন্য ভেড়া যারা হল সমুদ্রের ৯০০ পর্যন্ত আরোহনকারী। আমাদের এই লাহোল অঞ্চলে গাছপালা প্রায় নিশ্চিহ্ন। তবে পাহাড়ের নানাস্থানে উচ্চতা, তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত অনুযায়ে পাইন, ওক, আখরোট, পপ্লার, দেবদারু, চন্দন, জোনিপার, বন্যজেন্দ্রাম, আপেল, আখুলতা প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন রঙের নানা রকম ফুল ফুটে থাকে। নানা রকম বনস্পতিগুলো পাহাড় বেয়ে থাকে মাথার সাথে। এইসব নানারঙ নানা ধারার ফোর অতিক্রম যেতে হলে পাহাড়কে আনুভূমিক এবং প্রকৃতিকে হিসাবে বিভিন্ন নাম এবং মানচিত্র সঙ্গে সঙ্গে জানা থাকা প্রয়োজন।

একদল Camp No. 2 (১৮০০০ ফুট) এবং একদিন বিশ্রাম করে পরদিন এসে হাজির হ'লাম ১৯৮০০ ফুট উঁচু Advance Base Camp No. 1-এ। আর একটি অভিজ্ঞতা, বিকালে যার হাতে কিছু ভালুবাদাম আর গ্রামের খেলা নিয়ে বসেছি। তখ হ'ল আকাশে। পাহাড়ে কারা যেন খেলাধুলী উৎসবে মেতেছে। হঠাৎ একটা প্রবল আওয়াজে চমকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমরা যে তথাকথি তাঁবু ফেলেছি ঠিক তার উল্টা দিকে ৯ ইঞ্চি চওড়া এক বীভৎস ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। চমকিত হয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে এক মাইল দূরবর্তী স্থানে ফেললাম। এবারে কোন উৎপাতের সম্মুখীন হতে হয়নি।

পরের দিন 17- 7. 67. তারিখে ভোর চারটের সময়ে আমরা তিনটী দলে বিভক্ত হয়ে তিনটি ভিন্ন পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। প্রত্যেকের কোমরে দড়ি বাঁধা। সতর্কতার অন্ত নেই। উচ্চতার বিভিন্ন পাহাড় স্পর্শ বিরাট যায়। একটি আয়ত ক্ষেত্রে হয় যখন এদের মুখ ঢুকাবে ঢাকা থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে ছুঁচার দিয়ে দেখে নিচ্ছি বরফী বেহের ভার বইবে সক্ষম কিনা। এক সময়ে লাহোলের দলের মাঝের একজন বেদি হয়ে বলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে ঢুকে গেল। তখন লাহোল দেহকে দুই ব্যক্তির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা দিল। তাড়াতাড়ি আমার একটী দড়ি মাঝিরেলির মাঝে টেনে ফোলা হ'ল। কিন্তু আচমকা পতনে তার বা পাটি হড়কে যাওয়ায়, একজন কুলির সঙ্গে তাকে তাঁবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। বিশ্রামের জন্যেই আমরা তিনটী ভিন্ন যাত্রা বেলায়। ছোট ঘাসগুলি আমাদের লাহিয়েই

দেখাচ্ছে ছবির। যদিও একটি তিন দুয়ারী বিশালাকার। একবার পড়ে গেলে বেরুবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু মাঝে-মাঝেই বাঁধা দুই অভিযাত্রী যাত্রা বন্ধকের বেলাগুলি, যেখানে বন্ধকের মেয়াদ যায় বেড়ে ওঠা ছাড়া উপায় কিছু না বা অত্যন্ত কষ্টকর। এইভাবে চলতে চলতে একসময় পথ ভুল করে আমাদের অতিরিক্ত ৩ মাইল পথ পুরুষ হ'ল। আর ১০০ ফুটের মত বাকি আছে। এমন সময় মাতাদোরের একটি ছেলে যদি কাছের ডাক করল। এই অবস্থায় ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে না করে একটা লম্বমান দড়ির আর তুলা। দুটো একটা কার্টনের মধ্যে ভরে ঘড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলে আমরা আমার অগ্রসর হ'লাম। বেলা ২টার সময় ১১০০০ ফুট উঁচু দুর আমাদের সামের কাছে যাত্রা বোধায়। এইখানে ১০৩০ মিনিটে ১২,৫০০ ফুট উঁচু এবং ১১০৩০ মিনিটে ১৮০০০ ফুট উঁচু আরও দুটি দুর যাত্রা করল। বিশ্রামবেলা সবাই মিলে ফিরে এলাম ঘাঁটিতে। এই অনাবিষ্ট তিনটি দুরের নাম রাখলাম যথাক্রমে 'মাতাদোরা পীক', 'ব্যাস পীক' এবং ৩নং পীক। পরবর্তিতে আমাদের লক্ষ্য বস্তু হয়ে ওঠে ৩নং পীক। মাইল দুয়েকের পথ। কিন্তু আমাদের যাত্রা করতে হ'ল বিভিন্ন ধরনের। সন্ধ্যাবেলা ৬০ হ'ল প্রবল তুষারপাত। তার তার দেখলাম তাবু ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে। সুতরাং বিছানা সমস্ত তাবু থেকে তুলা সরিয়ে ফেলতে হচ্ছিল। এইভাবে কেটে গেল পুরো রাতটা। যাত্রা স্থগিত। সকালবেলা দুটো দুটো তুষার নিয়ে ছোড়াছুড়ি খেলতে লাগলাম। ১৪ তারিখ আমরা সমস্তবলে ঠিলাম সেই তুষারে আবৃত বীল ডাকের দুরের দিকে। প্রচুর পরিশ্রম করে বেলা ১১০৩০ মিনিটে আমরা ১২,৫০০ ফুট উঁচু এই বীলাভাভি দুরে এসে পৌছালাম। ডাকের বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন এই দুরের নাম রাখলাম 'বীলদুর'। ফেরবার সময় আমাদের বিজয়স্মৃতি হিসাবে একটা কাগজে প্রত্যেকের নাম লিখে রেখে এলাম, আর রাখলাম ডাকের ভিতর থেকে একটা ছবি তুলে।

১০ তারিখ আমরা রেখে এলাম Camp No. 2. রে। এখানে একদিন বিশ্রাম দিয়ে আমরা Camp. 2 থেকে ৭ মাইল পার্বত্য Camp. No. 1 রে এসে পৌছালাম। আমার আমাদের যাত্রা শুরু এবার ১৮০০০ ফুট Advance Base Camp. No. 2 রে। উঠেছি ১,৮০০ ফুট (Camp No. 3 থেকে পার্বত্য)। এই আসার পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও পিচ্ছিল। ফুটো ওলার লাগানো ক্রাম্পন এবং হাতে তুষার কুঠার থাকা সত্ত্বেও বরফের মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে হাতের ও পায়ের ছাল তুলতে হয়েছে। মাইলোক এসে তো পৌছালাম। আমার উপর একখানি বীল আকাশ, চারিদিকে তুষার মধ্যে দুরমালা আর পায়ের তলায় তুষার সমুদ্র। কোথাও একফোটা তৃণের সন্ধান নেই। বরফ, বরফ আর বরফ। এই জায়গায় যেন হকদের যান অবে করে চলবার ফেক বলা হল, আর এই জন্যই হল আমাদের জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল।

পরের দিন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দুটি বিকটবর্তী অনাবিষ্ট দুরারোহণে যাত্রা করলাম। যাত্রাই পাহাড়। খাড়া পরিষ্কার যাত্রা। আমরা হাতাহাতি দিয়ে চলতে লাগলাম। হাতে লাঠির মতোন আমার পাহাড়ের দুটি থাকা সত্ত্বেও তাতার যেন বন্ধকের মধ্যে ফেলে রাখিলাম। কোথাও আবার ডাকের আড়াআড়ি ভাবে পড়ে থাকা পাথর, যেখানে তুষার আবার স্থান নেই। আমরা বরিন লাহায্যে তুলে তুলে সেগুলি পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এইভাবে ১০ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠেছি, অবস্থান আরো ৫০০ ফুটের মত বাকি আছে, এমন সময় কোথা থেকে একরাশ মেঘ এসে পাহাড়ের আকাশটা ঢেকে দিল, আর প্রবল হাওয়ায় সেই মেঘগুলি নীচের দিকে নামতে লাগল। শিলু হইতে যাত্রা হলায়। নেমে আসছি। আমরা কয়েকজন আছে একটা দড়িতে বাঁধা আর পেছনে তিনজন সহীদরের আর একটা দড়িতে বাঁধা। হঠাৎ পেছনের একজন পা পিছলে পড়ে গেল আর তার দড়ির টানে সামনের দুজনও পড়ল। বিভিন্নের মধ্যে তারা প্রায় ৮০০ ফুট নীচে চলে গেল। আমরা নেমে এসে দেখলাম তারা হতভম্বের মত বসে আছে,

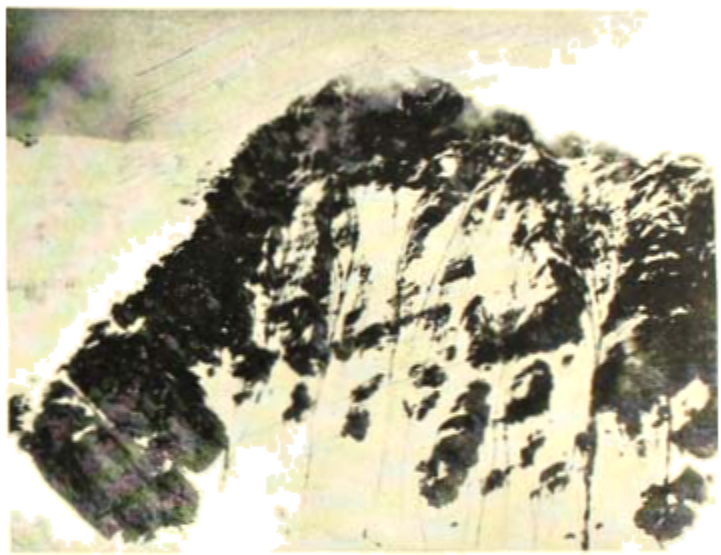

এ্যাডভান্স বেস্ ক্যাম্প থেকে
শৃঙ্গ 'মুলু পাম্বরী'
ধবনী উজ্জ্বল গাঙ্গুলী।

The poetic Study of inner Self.

Chandi Mondal
(Ist. yr- Bengali)

বিশেষ জোরে আঘাতপ্রাপ্ত হয় নি। তবে একজনের দু হাত পা ছড়েছে, একজনের মাথা ফেটেছে আর অপর একজনের হাতের হুটো আঙুল অবশ হয়ে গেছে। কোনক্রমে বিবাদ বেলা টাঙুতে ফিরলাম। (প্রত্যেক দিনই Pack lunch আমাদের সঙ্গে থাকত)। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দলটি এসে পৌঁছাল। তখনকার তাপাঙ্ক ১১৮০০ ফুট পর্যন্ত উঠে অন্তত ৪০০ ফুট বালি জেদে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তখনকার জেদবোর দলের তাদের বিপত্তি ঘটেছিল। আমাদেরও একটা জেদে আসুন যখন গড়গড়িয়ে বেশ কিছুটা চলে এসেছিল। ৪টি বালেই যার হওয়ায় আমরা পরের দিন জেদে এলাম Camp No 3. তে।

রাতে ভাল ঘুমি, ঘুম আসছে না। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম; দেখলাম দিগন্ত বিস্তৃত তুষার সমুদ্র জোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে আছে। চোখে পড়ল দূরে পাহাড়ের কোলে ঘুমন্ত মেঘের মত একটা কিছু পড়ে রয়েছে। রাত্রি তখন ২টা। পকেট রাডে দিয়ে দেখলাম ঘড়িটা ঠিক আছে। কয়েক পা এগিয়ে গেলেই মুহূর্তে অন্তর্ধান করবার লোভ তুষার ডাকছে। ওখান থেকেই নেমে Sleeping Bag-এ আশ্রয় (বিশেষ ধরনের পালকের লেপ)। কয়েকবার হাওয়াবন্ধ ঘড়ির উপর আড়াআড়ি করে এবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল ৮টা নাগাদ সব এসে পৌঁছানোর পর এখানে একদিন অপেক্ষা করতে হল।

এইবার আমরা যাত্রা করলাম আমাদের মূল লক্ষ্য মূল 'বরফপাহাড়ী' উদ্দেশ্যে। পরের দিন আমরা উঠে এলাম 17100 ফুট Advance Base Camp No. 3. তে; 23. 7. 67 তারিখে এসে পৌঁছালাম Assult Camp No. 1. 18700 ফুট উঁচু। Assult Camp-এ জেদে হল.....।

বিজয় উল্লাসে Base Camp-এ ফিরে চাঁচর আড্ডায় মাতল আর টিনে প্যাক করা বেশী বিয়েশী খাদ্য সম্ভার দিয়ে পূর্ণিমায় ছুইবিন ভরিয়ে করেক দিনের অপেক্ষা দিয়ে এলাম রসুকে। এখানে সন্ধ্যায় সময় আর অল্প তুষার হচ্ছিল। পরেরদিন জেদে উঠে বেশি চাপিবিক তুষারাচ্ছন্ন। পাইন গাছের পাতায় পাতায় তুষার জমে রয়েছে। আর রাতের আলো পড়ে সেগুলি যেন অসংখ্য পান্নার মত জেগে পুরো বৃষ্টি করে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমাদের এই সাফল্যের স্বীকৃতি দিলাম।

অমিকাশ্রেণী, যুবসমাজ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

—পাভিয়ানো কাভিয়ো।

লেখক স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি। সারা পৃথিবী জুড়ে যুব ও ছাত্র আন্দোলনের যে ব্যাপক বিস্তৃতি দেখা যাচ্ছে তা আধুনিক যুগের এক বিশেষ লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। তবে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তির ছাত্র-যুব আন্দোলনকে লক্ষ্য করে যেসব যুদ্ধ হয়ে গেছে তাদের সেসব ছাত্র ও যুব আন্দোলন এবং তাদের ব্যাপক জনতার বিকাশ এই ক্ষেত্রেও আলোকপাত করতে সেগুলি সক্ষম।

অনুবাদক : দেবপ্রসাদ কর্মকার ও সুধীর মিত্র

এটা হলো আমাদের আলোচনার মূল। এর আগে আর কোনদিন মহাদেশ বিশ্বের এত ভীষণ দুর্গতি। আমরা কমিউনিস্টরা কোনদিনই এমন দাবী করিনি যে অনশন ও ভীষণ থেকে মুক্তির সমস্ত পথের উত্তর আমরা দিয়েছি। আমরা যদি তা করতাম তা হলে আমাদের নয়া স্যাবিল সমাজতন্ত্রী দেশের কথা বলতে হয়। যিনি ১৯৩৯ সালের বিশ্বের আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে ভবিষ্যৎটা কী হবে এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন আমাদের ইতিমধ্যেই মনে হয়েছিল যে কিনা ১৯৩৮ সালেই ধরে নেয়া হয়েছিল। বর্তমান জীবনের এবং সংগ্রামের জটিলতার সমাধানে উত্তরণের আমাদের একটি নির্ভরযোগ্য দিশারী আছে, তা হলো মার্কসবাদ লেনিনবাদ—তবু একটি দিশারী মাত্র সব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান নয়।

এটা স্বীকার করতে হবে যে, অমিকশ্রেণী বা আমাদের অভ্যাস ছিল। ফলতঃ আমরা এমন প্রতিক্রিয়ার যাত এবং মুর্তোয়ারা আমাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সন্ত্রাস চালাবার সুযোগ পেয়েছে।

বহুবৎসর যাবৎ আমরা ক্রমাগত চিন্তায় যে ধনতান্ত্রিক সমাজ এমন একটা সমৃদ্ধশালী সমাজ যেখানে শ্রেণী বৈষম্য এবং শ্রেণী দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ দূরে সরে আসছে। বর্তমানে আমরা শ্রমিক শ্রেণী 'সাধারণ' হয়ে এবং এক "সামাজিক সাধারণ" ঘটতে চলেছে। আমাদের বলা হতো নয়া ধনতন্ত্র অর্থনীতি সমাজ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের কথা ভাবে। বৈজ্ঞানিক সংকট এবং বিপ্লবের উপাদান আর দেখা চলবে না। সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হবে। এইরূপ বিপ্লব যাদের, এখেলস, লেনিন কেউই দেখে যেতে পারেন নি।

আমাদের তথাকথিত বিশেষ কর্মীদের মধ্যে এর প্রভাব অত্যন্তিপূর্ণ পড়েছে। কিছু অংশ বলে পড়েছে এবং কিছু অংশ সংশয়াকুল, বিশেষ করে সেই সব দেশে যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি খুব দুর্বল অথবা জনসমর্থন অথবা তার প্রভাব অল্প।

যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতোই "আমেরিকান জীবনধারা"র বিশ্বাসী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত যে এবং চলু বছরে ফ্রান্সে যে বিপুল গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল বহুলাংশে তা ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রেও এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ফলে প্রতিবাদ আন্দোলন সফলতা অর্জনও করেছে।

সারা পশ্চিম ইউরোপব্যাপী ক্রমবিস্তৃত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কায় ইতালীতে বার-বার সংকট বিধানের সমাজতন্ত্রীদের পরাজয় এবং কমিউনিস্টদের ভোট ও আসন শ্রেণী ও ভাতৃত্বের প্রবল প্রভাবে লক্ষ্য হয়েছে।

তবিও বলব তবু পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিক এবং ছাত্রদের সোস্যালিস্ট এবং পথে ইতিহ করে।

মার্ক্সের আন্তর্জাতিকের বেশকিছু এবং বিশেষ করে উহার ধনবাদী বেশকিছু একই ধরণের বিপ্লবের প্রজন্ম পাচ্ছে।

এই আন্দোলনগুলি ধনবাদ্রিক সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মূল ধরে নাড়া দিচ্ছে। সাম্প্রতিক-কালে, তা ধনবাদী সভ্যতার ক্ষমতাধিকার, তার লোকের বিশ্বাসই পরিচালিত হচ্ছে। তাদের শেষ লক্ষ্য সমাজতন্ত্র —তা আজকের ধনবাদ্রিক বিশ্বে উদ্ভবোত্তর অবস্থাবাদী হয়ে পড়ছে।

মার্ক্সবাদীদের কাছে এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, এই আন্দোলনগুলির অনেক ক্ষেত্রে বৈরাজ্যবাদী ধরণের ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের কথা নিয়ে আমরা পারিপ্রেক্ষিত ধরণগুলি প্রায়শিক ব্যাপারগুলিকে নির্দিষ্ট করেছি।

এই ধারণা নিঃসন্দেহে খুব বিলম্বে বিপ্লব "মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী ছাঁচে ঢালা" পথে চলবে এবং সংগঠন ও অনুশাসন সব সময় সঠিক পথে পরিচালনা করে চলবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় পার্টির কর্মসূচী মাফিক কিনা তাহিকের অপেক্ষা এবং কর্মযোগ্যতা আশায় করে দেওয়া আছে। তবুই বৈপ্লবিক সংকট ঘনিয়ে আসবে কলত সমাজের বিভিন্ন স্তরে হবে প্রচণ্ড সংঘাত, তবুই মার্ক্সবাদ শক্তিগুলি আশা বৈচিত্র্য না এসে পারে না—সাম্প্রতিক ভাবে তা সম্ভব, সংখ্যাধিক, এমনকি সর্বসম্মত হতে পারে। এটা আশা করা যায় না যে, ছোট এবং ব্যাপারী দলগুলি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী ধারণা নিয়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই সব দলের সমাজের অংশগুলি যুবকেরা ও পারিপ্রেক্ষিত বিপ্লবী ধারণায় আকৃষ্ট আছে। সাধারণ বিপ্লবী আন্দোলনে তারা আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু অতীতের মত ইতিহাসের সৌভাগ্য পুনরাবৃত্তির ধারণাকে আশ্রয় করে যখন যুবেরাজনৈতিক একটি বিপ্লবী শ্রেণী ছিল এবং এইসব ধারণা অনুসরণ শ্রমিক শ্রেণীর আশা প্রচার করে।

যখন বৈপ্লবিক সংকট গভীর হয়, তখন অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ এক বিচিত্র পদ্ধতিতে চলে।

এইসব জটিলতা সত্ত্বেও অধি সহজেই এটা বলা যায় যে, আজকের বিপ্লবী আন্দোলনগুলি সুনির্দিষ্ট ধনবাদ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণের এবং সুযোগ সৃষ্টিতে না হলেও তারা এক সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছে তা হলো সমাজতন্ত্র।

ধনবন্ত্রের আদর্শ যত বড়ই বলুক যে বৃদ্ধি করে মুনাফার এই আন্দোলনগুলি তা কত সহজেই ফেলে দিচ্ছে। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী শক্তি এবং আদর্শের আবেদন সম্বন্ধে করতে তাদের কি শক্তিই না প্রয়োগ করতে হয়েছে। তারা একদিন মার্ক্সবাদ সম্পর্কে বিদ্যা অপপ্রচার চালিয়েছিল যে মার্ক্সবাদ "অসার এবং প্রাচীন।"

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবকে ফেরীতলে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করল তার সামাজিক অবস্থান, তার শক্তি, সংগঠন এবং তার বৈপ্লবিক ভবিষ্যৎ যার অবস্থাবাদী পরিণতি হচ্ছে সমাজকে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিপত্তন তাকে প্রতিষ্ঠা করবে। বিশেষ ধনবাদ্রিক অর্থনীতির ভাঙনের মুখে তাহিকেরা শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে অধীকার করল; কিন্তু জীবন দিয়ে শ্রমিক-শ্রেণী তার অবাধার্য প্রমাণ করল। মার্ক্সবাদ—লেনিন-বাদের মূল নীতিগুলিরই তার অকাট্য সমর্থন মেলে।

আজকে, তাই, এইসব সংগ্রামে যুবকেরা সামিল হচ্ছে। সত্যিই, তা এর মানে যে যত সমাজতান্ত্রিক এবং রাজনীতিবিদ এদের তাদের অবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করছে। কিন্তু তাদের অবেষণার বিশ্লেষণ অবিশ্বাস্য এবং অসারবন্ধ। পৃথিবীর সর্বত্র "যুব-বিদ্রোহ" নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

কেন যুবকেরা বিদ্রোহী?

তার কোন সরল উত্তর নেই; তারও, সমস্যা অনেক গভীরে। তবুও এটা লক্ষ্যণীয় যে, বিশ্বের সকল বিপ্লবে এবং বিপ্লবে, এমনকি শ্রেণী সংগ্রামের উন্নতির সাথে তাল রেখে যুব সম্প্রদায় এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বভাবতই যুবকেরা অধৈ, ঘোলা-মন, আশাবাদক এবং প্রকৃতিগত এবং তারাই মুক্তি সংগ্রামে বেশী ঝোক দিয়েছে।

যা ঘটছে তা বুঝতে হলে বর্তমান যুব বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানে অনেক পেছনে যাওয়া প্রয়োজন।

মানুষের প্রয়োজন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ। তা অনুযায়ী সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এবং দেশে দেশে তার পার্থক্যও ঘটে।

অভাবের দাস, দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং প্রথম বস্ত্র-মানুষের প্রয়োজনের থেকে আজকের প্রতিটির প্রয়োজন পৃথক। ঐতিহাসিক অগ্রগতির একইধারার মূল। বিশেষ পরিবর্তনে মানুষের ঐতিহ্য এবং সমাজটির প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের একটা চরিত্র।

যুবকেরা বলেন যে, আজকের চেয়ে পুরানো দিনের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। এমন কি, তারা আজকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধকেও মানেন। যারা সবকিছু হারাবার ভয়ে ভীত তারা এক প্রতিক্রিয়াশীল আত্মরক্ষামূলক মনোভাব নিয়েছেন। এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি যেসব কমিউনিষ্ট অবস্থানের কথা বলছি না।

যে প্রতিষ্ঠান আমাদের বড় করেছে, সে আজ ভুলে গেছে। যে আমেরিকা বিশ্বের অথবা বড় বোমা বানিয়েছিলেন চন্দ্রে, সে আজ বোটের বেলায় ব্যবহার করতে পারে। ভিয়েতনামের কথা বলছি না, সিনেমা দেখার যার কাছে অনেক দিন সে আজ ঘরটাকে বলে ঠিক যেন সিনেমায় যায়। আজকের যুব প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির ফলে তার জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়; সে আর বেশী কিছু চায় না। কিন্তু এতো ক্ষণস্থায়ী; যখন সমস্ত সমাজ ভেঙ্গে উঠবে এবং পুরানো বোতল ভেঙ্গে ফেলবে তখন তো এর শেষ হবেই। যখন নতুন রূপ উঠবে এবং যুব সমাজ সমাজের জন্য অপেক্ষা করবে—নতুন চাহিদাগুলি সন্তুষ্ট চাইবে যখন তারা দেখবে যে স্বাধীন এবং স্বাবলম্বন শাসনতন্ত্রই সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করছে।

এটা বলতে চাইছি না যে, বর্তমানের অগ্রগতিতে যুবকের সকলেই সন্তুষ্ট। অধিকাংশক্ষেত্রেই—যেমনে সোনের উদাহরণ নেওয়া যায়—উৎপাদন শক্তির উন্নতিতেও দেখানে সমস্ত জীবনযাত্রায় যার ভোগ করতে পারেনা। ঐ শাসনের অধীনে যাদের অসন্তোষ রয়েছে।

যুব সম্প্রদায় যারা অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেটর, টিভির মূল্য বোঝে, যাদের বিশ্বের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সেই তাদের কাছে এই অগ্রগতির কোনো মূল্যই নেই যা তাদের পূর্বপুরুষের ছিল। তারা সামনে আরো এগোতে চায়, তারা আরো ভালো কিছু পাবার আশা করে এবং আরো উন্নতির আশা রাখে।

যখন পিতা তার পুত্রকে বলে "তোমরা যা পাচ্ছ আমরা তা পেতাম না"—এর ছাপ আছই। ফলতঃ যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই উন্নতিকে অস্বীকার করে যুবসম্প্রদায় সমস্যার ব্যবস্থার ব্যাখ্যাগুলো দেখতে চায়। এখনও সমাজের সমস্ত স্তরে বিস্তর পার্থক্য এবং শাসনে এমনও বৈষম্য রয়েছে। সামাজিক উন্নতি সত্ত্বেও যুবসমাজ এইসব ক্ষত এবং অন্যায় সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

লক্ষ্যের প্রয়োজনীয় যে, যুবকেরা দেখতে পায় যে সমাজের খুব অল্প সমাজের সমস্ত সম্পদ ভোগ করছে এবং সামাজিক ব্যাপারে তাদের কথাই শেষ কথা। বর্তমান অবস্থায় উন্নতি কোনক্রমেই সামাজিক বৈষম্য, শোষণ এবং মানুষের পার্থক্য ঘোচাতে পারে না। সমাজিক সমাজের অযৌক্তিকতা এইভাবে মানবিক মূল্যকে নষ্ট করছে এবং কিভাবে উন্নতির পথে বাধা হয়ে উঠছে তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। যুবসমাজ জন্ম নিয়ে উঠছে, অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা তারা অনেক দ্রুত পরিণত হচ্ছে কাল, তাদের শিক্ষার মান উন্নত এবং তারা অনেক বেশী দায়িত্ববোধ নিয়ে এবং আজ যে সমাজে মান ঘরে ফেলানের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। যুব-সমাজের সাধারণকে প্রগতি ও স্বাধীনতার দিকে পরিচালনার শক্তি জোগাচ্ছে এই ঘটনা যে আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক সাফল্য মানবজাতিকে এক নতুন সমৃদ্ধপ্রসারী সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন: মানুষ পৃথিবীর আকর্ষণের শক্তিকে জয় করছে এবং প্রকৃতির রহস্য ভেদ করছে। এসবের ফলে এবং সামাজিক উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর

ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা অবশ্যম্ভাবীরূপে, বিশেষ করে যুবসমাজকে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যে যাবে পারে না এমন কিছুই নেই।

যদিও আক্ষরিক অর্থে এটা সত্য যে আর নীতা নিলি: কিছুব্যক্তি যারা উৎপাদনের উপায় ও ফলনের মালিক ও নিয়ন্ত্রা তারাই এই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং তাদের হাতেই যারার ক্ষেত্রে যদিও তা প্রায়ই সবল সমাজের প্রাপ্য।

এটাও মনে রাখা উচিত যে বর্তমানের যুব সমাজ এমন এক যুগে জন্মেছে যে যুগটা হচ্ছে মানবজ্ঞ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ, বিপ্লবিয়ার থেকে বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব বিপ্লবে উত্তরণের যুগ। চোখের সামনেই পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটছে। পুরানো যুগে প্রযুক্তির ক্রমাগতিকতা ছিল বুঝোয়া, এখন পনর বছর পরিবর্তন অসম্ভব। আজ কল্পনীলতার দিন চলে গেছে। লোকে জানছে, জীবন আগে যা ছিল এখন আর তা নেই, আজ যা আছে আগামী কাল, এক বছর পর, পাঁচ বা দশ বছর পর তা আর থাকবে না। এই ঘটনা থেকে তারা আর বেশ থাকতে পারছে না। তারা জানছে, আজকের দুনিয়ায় যে পরিবর্তন চলে গিয়েছে তার অনেকখানি তাদের ওপর নির্ভর করছে।

সমাজতন্ত্র যুব সমাজে এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। আগে যুবসমাজ তাদেরই সাথী ছিল, তখন কিছু ভালো মানবতার প্রতিনিধি বিপ্লবীদের জন্য সমাজতন্ত্র ছিল এক বিমূর্ত ধারণা। আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অবস্থান আর সাধনা, তার শক্তি, তার সম্ভাবনা—এমন কি সমস্যাগুলি নিয়ে যুবসমাজ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ভালো ভালো ইত্যাদি সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচারে সাহায্য করছে। যুবসমাজ বুঝতে পারছে যে যদি যুবসমাজ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণে উন্নত দেশগুলি ধনতান্ত্রিক না হয়ে সমাজতান্ত্রিক হয়ে যেতো তবে মানবসমাজ এই ধরণের বাধিয়া, দারিদ্র্য বা বিশ্বের সম্ভাবনা হতো না।

আমাদের যুগের সবচেয়ে সমাধানের একমাত্র সামাজিক সংগঠন হলো সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ছাড়া কারার অস্তিত্ব দেশের উন্নতি ঘটত কিভাবে? সমাজতন্ত্র ছাড়া কারার অর্থাৎ দেশগুলি কি উন্নত দেশগুলির শোষণ ব্যতিরেকে সাহায্য পেত? আজকের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা শিক্ষিতের সমাধান কিভাবে ঘটত?

পরন্তু, সাম্রাজ্যবাদের আমলে সুযোই পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়টি কিভাবে বন্ধ হতো? শিল্প থেকে বিজ্ঞানের খেলা পনর ঘুচিয়ে যারা আজকের জীবনের বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটত কিভাবে?

পূর্ব যুব-সম্প্রদায়ের পনর বর্ষীয় অনুষ্ঠানেরগুলি চালান হতো যা তাদের মনে কিছু আগে নিশ্চিন্তের ভাবনা চুকিয়ে দিতো এবং যুবিয়াকোলীদের হাতে সবকিছু ছেড়ে আবর্তিত ধনোলাস থেকে মুক্তির পথ দেখাতো। কিন্তু এখন তার প্রচার করলে: ঘোষণা এবং বর্তমানে সমস্ত বর্ষীয় অনুষ্ঠানের বিপ্লবী ধারাগুলির সাথে একমাত্রে অবদান হচ্ছে যাতে আগামী শ্রেণীহীন সমাজে তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে।

বিশ্বে ব্যাপক যুব-সমাজ আজ শক্তিশালী বিপ্লবী শক্তির ভূমিকা নিয়েছে।

'যুব-বিদ্রোহে'র নতুন এবং উৎসাহব্যঞ্জক দিক হচ্ছে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের কার্যকলাপ। সাধারণভাবে উৎপাদকে আলোকে যুবমানসের প্রতিফলন এবং বিশেষ করে আধুনিক বিপ্লবোৎপাদনের যুগযুগান্তী পরিবর্তনের আলোকে আজকের সমাজে যা ঘটছে তার বিচার করা উচিত।

যন্ত্র বিশ্বে সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। যেমন, উন্নত দেশগুলিতে সবল জনসংখ্যায় কৃষকের অংশ কমছে। একই সাথে মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাড়ছে। আগের যেকোন সামাজিক প্রভাব বিস্তার করে এই অংশ ক্রমশই সমাজের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান উৎপাদনের প্রত্যক্ষ শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় ক্রমশই আধুনিক উৎপাদনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছে।

অবশ্যই, বুদ্ধিজীবি এবং ছাত্রদের এক অন্তর্বর্তীকালীন অংশ হিসাবে গণ্য করা হতো; এবং একদিকে যা অন্যদিকে

ক্রমশঃ→

সমাজে মূলীয় বণিকদের সাথেই তাদের ছাড়া বাঁধা ছিলো। তুলোচাষের বড় অধিকারেরই এর মধ্যে ছিল।

সেইসব ছাত্ররা শ্রমিকদের থেকে অনেক দূরে এক সুবিধাভোগী অংশ ছিল। তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো যাতে তারা দমনাত্মক সমাজের আদেশ-কর্তিকা হতে পারে এবং তার ভীতি সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে। কোলম্যান ছিলেন তেমনি বুদ্ধিজীবি এবং ছাত্ররা ছিলেন তার সাথে থাকত। এইসব বিপ্লবীরা তাদের ছেলেদের চেয়েছিল; যারা এই ধরনা বৈপ্লবিক ভাবের বাস্তবায়ন করে তারা তাদের সমাজ নিয়ন্ত্রিত কিন্তু সমবায়ের অধিকারিক হবে।

আজ, এমনকি এমন যেসব দাবী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে সমর্থনের প্রয়োজনীয় অস্ত্র—বিপ্লবী রূপ তুলে দিয়েছেন, তাঁরা এই ধরনের বুদ্ধিজীবি ছিলেন যারা শাসকশ্রেণী থেকে বেরিয়েছেন। তাঁদের প্রতিভা মানব-জাতিকে চরিত্র দেওয়া করতো এবং তা তার আনন্দের শক্তি দিয়েছে।

এখন যা ছিল ব্যক্তিকের আজ তা সাধারণ ধর্মে পরিণত হয়েছে। সমাজে সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া কাঠামোগত প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলিকে ধরতে হলে এর সম্পূর্ণ প্রয়োগ অনুধাবন।

ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবিরা আর সমাজের নেতা সুবিধার সুবিধাভোগী অংশ হয়ে থাকতে চাইছে না। এটা পরিষ্কার যে, এখনও পর্যন্ত এদের অনেকে শ্রমিক শ্রেণীর অংশ খুবই কম এবং ঘটনাচক্রে এই তাদের বাস্তবায়িত শ্রেণীগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। তাদের বিপুল অংশ যারা সমাজের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি—তারা হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বা ছোট বা মাঝারী বণিক বা কেরানী বা বুদ্ধিজীবির পরিবার থেকে এসেছে। অতীতের ছাত্রদের মতো তাদের কোন বিশিষ্ট ভবিষ্যৎ নেই। চাকরীর মতো পরিবার-আশা খুব অল্পই আছে। এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের পক্ষেও সমস্যা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ছাত্রদের অবস্থার ভিত্তি সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সংকটগুলি দেখা করতে বাধ্য করছে।

শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিষয় না করে আজকের ছাত্রদের বিশেষের বাস্তব বিশেষেই তৈরী করে নেবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। তাদের পুঁজির চিন্ন ধারণাটি এগিয়ে আসে, তবেই তার ধারে একটা স্পষ্ট রূপ পায়।

স্নাতকদের পর অধিকের অনেকেই সেবাধর্মী-নির্ভর শ্রমিক-বাজারে তার প্রবেশটি খোঁজার চুক্তির জন্য ভোগে। তাছাড়া শ্রমিক হবার তাদের আর কোন পছন্দ চলবে না। অনেকের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন নতুন বিশেষজ্ঞ ধারণা নিতে শ্রমিকের মতোই জীবনযাপন করে এবং শ্রম-বাজারে উৎপাদন-পরিবর্তন বন্ধ হয়ে পড়ে। তিনি বলেন পেশাদারের পর শ্রমিকদের অনেকেই তাদের বেকারত্বের দলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

ছাত্র, শ্রম-বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্যরা সমাজে তাদের স্থান সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠছে। শেখার সুযোগ সবসময় তাদের হাতে আসছে না, বুদ্ধিজীবি খুব সম্প্রসারণ ও তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সংগঠিত করছে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবীগুলি সামনে তুলে ধরছে। যুবক ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদিদের সংগঠনগুলি এর প্রমাণ হয়ে থেকে, নয় প্রমাণের পথে।

বিশেষজ্ঞ যুবক এবং ছাত্রেরা সমাজে তাদের সম্ভাব্যতার ভূমিকা নিয়ে সচেতনভাবে শ্রম-অধিকার-গুলির দেখে ঐক্যের নিয়োগ করছে। এই শ্রম-অধিকারগুলি তাদের সমাজে অধিকার নিয়ার সমর্থন জানাচ্ছে।

বিস্তারিত ভাবে, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে এই শক্তি বিশ্বের চালিকা শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের কুলের অগ্রসরমানতার এতে নতুন বৈশিষ্ট্য। তবু আমরা সাফল্যগুলো সমাজে এর পরিপূর্ণ জ্ঞান পাই না, কিন্তু একদা সবা আমাদের প্রজন্মে আজ সমাজে আছি। কিন্তু এখন প্রাচীন হয়ে পড়ছি।

আমরা কিছু বুদ্ধিজীবির শাসকশ্রেণী থেকে বেরিয়ে

এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে দেখে আমরা উজ্জিবিত হয়ে উঠেছি। শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো সংগঠনের ভেতরে এক নতুন এবং অবস্থাপালী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর সাথে যোগ দিচ্ছে—এর পিছনে বলার মতো কি যুক্তি আছে?

বিশ্বাসের ভাবে, এই বিপ্লবী শক্তির প্রথমেই কখনো সংগঠনের মধ্যে দিয়ে পরিবার হয়ে উঠবে এবং তাদের ও পরিবারগুলির উন্নয় দিয়ে তবেই এই নতুন শক্তি বিকাশ প্রয়োজনীয়।

এই সকলের কৃষকশ্রমিকরা ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরা চালিয়ে দিয়ে যেতে থাকে। উহার পেশাগুলিতে এদের সংখ্যা কত লক্ষে পৌঁছুবে। সরকারী হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত দশ বছরে ছাত্রের সংখ্যা ২৭ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ, পশ্চিম জার্মানীতে ১৮০,০০০ থেকে প্রায় অর্ধ লক্ষ, ফ্রান্সে ২১৮,০০০ থেকে ৪১৮,০০০ এবং জাপানে ২০০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ এ দাঁড়িয়েছে। সাধারণ ধরে ভারতেই শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা আজ প্রায় ১৪০ ০০০।

উপরে দিয়ে থেকে, বিপ্লবী আন্দোলনগুলিতে বিপুল সংখ্যায় ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবির আগমন নতুন সংগতি ও তাদের শক্তিশালী করতে নতুন চিন্তার ধার খুলে দিয়েছে। এরই সাথে বিপ্লবানুযায়ী পরিবর্তনের জন্য অধিকতর আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন সমাজ গড়ার কাজে যদি তৈরী বিপ্লবের ও লক্ষ কার্যিকর পাওয়া যায়, তবে এই পরিবর্তন সহজতর হবে এবং অনেকদিন আগে আনা যায়া অধিকতর করতে হবে। নতুন বুদ্ধিজীবি তৈরী করতে যদি আমরা সোভিয়েত ধরনের বিপ্লব আনত, আমাদের বিপ্লবে লক্ষ কার্যিকরের সহজলভ্যতা নতুন সমাজ নির্মাণে খুবই সহায়ক হবে।

এটা ঘটনা যে, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবিরা বিপ্লবে শুধু একতরফে যোগ দিচ্ছে না, তারা বিপুলসংখ্যায় যোগ দিচ্ছে। অবশ্য উপাদান, উত্তেজনা, ব্যক্তিস্বার্থের বহুমুখীনতা এই ধারার অন্য আগ্রহও তারা আকর্ষণও করছে। একইসাথে যুবকদের কাজকর্ম শুধুমাত্র বাধিক নয়, অনেকক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদীও বটে। প্রায়ই; এক পা এগোবার জন্যে, এক পা পিছোতে হতে পারে। আমাদের ভুললে চলবে না যে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ও এই ধরনের নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা রাজনৈতিক অস্ত্রস্থতার চিহ্ন। শ্রমিকদের প্রাথমিক উপাদান ছিল সমস্ত যন্ত্র ভেঙে ফেলা; কিন্তু তাদের সর্বশিক্ষু উচ্চমান অবাধ প্রবণতার সাথে একত্রিত হয়ে তুলনা হয়ে। অবশ্যই সংগঠনের প্রভাবে এই ভাইরাস অনেকখানি প্রশমিত করা যায়।

এই আন্দোলনের অনেকগুলির আগে পুরাতনের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয় যদিও মূলতঃ অর্থনৈতিক ধরনে বিপ্লবী আন্দোলনের রূপে এবং সামাজিক ও শ্রেণী সংগ্রাম দ্বারা পরিচালিত। শিল্পের অসন্তোষজনক এবং সামাজিক অবস্থানকে অস্বীকার করার জন্যই যুবকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যখন তারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে যোগ দেয় কেবল তখনই তারা বুঝতে পারে যে, সার্বপ্রকারে সমাজে ব্যবস্থার কোন রোগ, কিন্তু সেই কাঠামোর মধ্যেই এর অবস্থান যে কাঠামো থেকে তারা এসেছে। এর পরেই তারা এই ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হবে যে, পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের সংগ্রাম পরিচালনা এবং ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রাম হচ্ছে পুরাতন শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণীর সংগ্রাম। তারা তখন বুঝতে শিখবে যে, যন্ত্রের মালিকানা এই বিপ্লবীর মীমাংসা নয়, সামাজিক বিপ্লবতা এবং চিন্তাধারা থেকে এই মীমাংসা টানা হচ্ছে।

এই সাথে প্রায়শই যুবকরা দুটিকটি তৈরী করতে সাহায্য করে এবং সহিংসবিরোধী বুদ্ধোয়া মধ্য শ্রেণীকে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইএর সাহায্য করছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী উদ্যমকে অস্বীকার করতে দেখাচ্ছে, যাদের প্রথমিক যন্ত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছে এবং বর্তমান সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টাকে বিলম্বিত করছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের বিভিন্নে এই নতুন শক্তি পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের অবিচ্ছিন্নি বিপ্লবী কিছু সুসংহতের তাদের সাথে আনছে। বিপ্লবের সম্ভাব্য এইসব সুসংহতগুলিকে উপাদি দিয়ে আরো তাদিয়ে তুলছে।

এইসব সুসংহতগুলিকে পূর্ণোদ্যমের জন্য অবিচ্ছিন্নি

বিপ্লবের সাথে মিশিয়ে ফেললে আমরা ভুল করব, যদিও অনেক সময় এরা হতে পারে যে, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যুবকদের ক্ষেত্রে এটা পুরোপুরি সত্যিকার পুরুষত্ব; কিন্তু একথার তাৎপর্যের অভিজ্ঞতাতেই একদিন ভুল ভেঙ্গে যাবে।

যখন মার্কসবাদীরা যুবকের আবেগ ও নতুন শক্তিকে উৎসাহে যাচাই করতে বার্থ হন এবং তার সম্পূর্ণ ধরণা বা তাদের গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে আক্রমণ করে বসেন বা অবিশ্বাসভরে অপরিপক্কতার পরিণতি ভেবে তাঁরা যুবকেরা তাদের ও প্রবোচনা-কারীদের হাতেই অস্ত্র তুলে দেন। এই ধরণের কমিটিনিষ্ট প্রকারান্তরে ভুল করে এবং আন্দোলনের প্রয়োজনের ও আবশ্যকের ক্ষেত্রেরত যুবসমাজের কাছে তা বিপ্লবই অস্বীকার।

কমিটিনিষ্টরা অবশ্যই এই নতুন শক্তিকে যোগাযোগ করবে যা তাদের প্রতি পূর্ণোদ্যমতায় মুখীকৃতি ও অনুচিত। আমরা তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যই ব্যবহার করব; আমরা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। সুযোগমত, আমরা অবশ্যই তাদের মতো কাজ করব।

তাদের মনে ভুল ধারণা পরিষ্কার করতে হবে যে, কার হাতে নেতৃত্ব থাকবে সেটা কখনো কথা নয়। নেতৃত্ব অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর হাতে থাকবে এবং তাত্ত্বিকভাবে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিরা এটা স্বীকার করে।

যেসব দেশে কমিটিনিষ্ট পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শক্তিগুলি খুব উন্নত এবং যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে, সেখানে ছাত্রদের বিপ্লবের কথা হলি সেই দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের আলোকবর্তিকা বা শ্রমিকশ্রেণী বা তার পার্টি বা সংগঠনের সম্পর্কে রাজনৈতিক আভিজাত্যের কথা ভাবেন, তবে এইসব যুবকদের ভুল বোঝা হবে। পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে ছাত্র ও যুবক বুদ্ধিজীবিদের আন্দোলনের মধ্যে এই নয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তাধারা প্রবেশ করছে। যত বছর আগে তা হয়েছিল, এটা পরিষ্কার যে, পার্টি এবং শ্রমিক আন্দোলন থেকে যুবকদের আলাদাভাবে দেখার আছে। বিশেষতঃ, তারা আরও ভালো করে নিজেরা পারবে সংগঠন ও মুখপাত্র মানে কি, সর্বহারা আন্দোলনের মূলধারা, ঐক্যের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে।

ছাত্র যুব এবং যুবক বুদ্ধিজীবিদের জন্য কমিটিনিষ্ট পার্টির সর্বদা খোলা থাকা উচিত। সাংগঠনিকভাবে পার্টির কাজের জন্য বিশেষ করে এইসব যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজের জন্য পার্টি যেন সক্রিয় করে তোলা উচিত।

বর্তমানে যত দেখে ছাত্র ও যুব বুদ্ধিজীবিদের আন্দোলন সাধারণভাবে মতো; তা এখনো তাঁরা হয়নি এবং যার জন্য বিচিত্র ও বিপরীত উপাদানগুলি পাশা-পাশি রয়েছে। কমিটিনিষ্ট পার্টিগুলির উপর নির্ভর করছে যে এই সাধারণের কী রূপ নেবে এবং যুবকরা কোন পথ বেছে নেবে।

আয় চাঁদ

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়
(বিজ্ঞান পরিষৎ বিভাগ)

যখন ছোট ছিলাম চাঁদ সম্বন্ধে কত অজানা ধারণাই না মনে ছিল। মা যখন খোকা মিনে চাঁদকে ডাকতেন "আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা" তখনও চাঁদ বুঝি সকলেরই মামা আর ঘুরে ঘুরে সব মামার কপালে টিপ দেওয়াই ওর একমাত্র কাজ। কতদূর বড় জানার, মাথের কোল ছেড়ে অনেক অবধান চাঁদুমামা ওপরে। মাঝামাঝি ওপরে একখানা গরু ওপরে ওপরে যাচ্ছে যতই হয়ে যেত। তারপর তারার আকাশটা অপরূপ সাজে সাজত - চাঁদের আলো লাগত চারিদিকে কখন: গায়ে গায়ে বারান্দায়—ঘরে ঢোকার চুপচাপ, অথবা হয়ে চেয়ে থাকতাম চাঁদের দিকে, ভাবতাম চাঁদুমা বসে চলেছেন—চাঁদেতে বাড়ি এক মস্ত বড় বুড়ী আছে। তার চুলগুলো পাকা সবের মত। বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। যাক গিয়ে সে বসে বসে কেবল চরকা কাটে।

আমরা আরও বড় হয়ে বিজ্ঞানেতে যে চাঁদকে পেলাম, তার সঙ্গে আমাদের কল্পকথার চাঁদের কোন মিলই নেই। আকাশে যে চাঁদের চলা দেখা যায়, চাঁদটাই রাতদিন আমাদের চারপাশে অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। চাঁদের বুড়ীর কাছে রাতদুপুরে যায় না কেন্দুয়ারের খোঁজ করতে। চাঁদে যাওয়া সহজ কথা নাকি? পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হচ্ছে নাকি ৩৯৯, ৪০০ কিলোমিটার (২৩৯, ৮৬০ মাইল)। এই বিরাট দূরত্ব পেরিয়ে যদিবা কেউ চাঁদে যায় সে নাকি সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হবে তারপর—চাঁদটা নাকি ভূমোর সঙ্গে মোড়াই। কেউ জোরই সে ভূমোর সাথে ভুলে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের আজকে কত রেকর্ডের সৃষ্টি করে মানুষের এই বহু দিনের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং চাঁদে অবতরণের জন্যে চাঁদের সবজান্তাই যে ভূমোর আসুক না তা প্রমাণিত হয়েছে।

কোন মানুষ যদি চাঁদে যায় তবে সে পৃথিবীর থেকে চাঁদের অনেক পার্থক্য উপলব্ধি করবে। আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদকে যতটা নীলাভ দেখি, চাঁদ থেকে পৃথিবীকে তার চেয়েও বেশী নীলাভ দেখাবে কারণ পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুস্তর নীল আলো বিচ্ছুরণে সাহায্য করবে।

চাঁদের মানুষ তার আকাশকে নীল দেখবে না—দেখবে কালো। সে দিন রাতেই কালো আকাশে তারা খচিত দেখবে এবং সেই তারা আলো জল স্থল করবে না দিন থেকে আলো দেবে। আকাশ দেখাবে কালো।

চাঁদ থেকে পৃথিবীর উদয় অথবা অস্ত দেখা যাবে না। কারণ চাঁদের এক জায়গা থেকে পৃথিবীকে মাথার ওপরে দেখা যাবে আবার অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে সমস্তরালে দেখা যাবে এবং চাঁদের অপর গোলার্ধ থেকে পৃথিবীকে দেখাই যাবে না।

আমরা চাঁদের পূর্ণিমার সময় চাঁদকে যত বড় দেখি, চাঁদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে তার চেয়েও চারগুণ বড় এবং ষাটগুণ উজ্জ্বল দেখাবে।

একটা মজার ব্যাপার এই যে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির $\frac{1}{6}$ অংশ। কাজেই পৃথিবীর

কোন লোকের ওজন যদি ৬০ কিলোগ্রাম হয় তবে চাঁদে তার ওজন হবে মাত্র ১০ কিলোগ্রাম।

কোন বস্তুর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে মুক্ত হবে হলে ওজনহীন অবস্থায় ৭ মাইল গতিবেগ। কিন্তু চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে মুক্ত হতে হলে কোন বস্তুর বেগের মাত্র ১½ মাইল পরিমাণ হলেই।

চাঁদের পক্ষে আরও যে সব তথ্য পাওয়া গেছে—তার থেকে জানা গেছে যে চাঁদে কোন বায়ু নেই এবং জলও নেই। সুতরাং জল এবং বায়ু না থাকার ফলে এটা মনে নেওয়া যেতে পারে যে চাঁদে কোন জীবও নেই।

আমরা জানি যে কোন গবেষণা সঠিক হতে হলে বায়ু অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু বায়ু না থাকায় ফলে চাঁদে কোন গবেষণা সঠিক সম্ভব।

সূর্যের তাপে চাঁদের উষ্ণতা ১০০° সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় আবার সূর্য অস্ত যেলে উষ্ণতা নামে—১৫০° সেন্টিগ্রেডে হয় এবং আকাশ তা থেকে নিচে—১৫০° সেন্টিগ্রেডে নামায়।

চাঁদ সম্বন্ধে এত তথ্য জানবার পর বিজ্ঞানীরা চাঁদের বায়ু সূর্যের সেনাবার সম্ভাবনা করে মানুষের যাওয়া বন্ধ। চাঁদ সম্বন্ধে তাই প্রতি নিয়তই গবেষণা চলছে।

মানুষের ওই বেগেই অনায়াসে আসবার, অনেকের সেনাবার, অনেকের সেনাবার আসবে। সে যা সেগেই মানেই সঙ্গে থাকে না। তাদের বিশ্বিতে নিয়ে সে সামনের চাঁদে যা মানুষের সুখ সুবিধের অনেক বিশ্বিতে জানবার আছে তার অনেক। সে চলল হয়ে মনে ওঠে—"আমি চলল—আমি মানুষের সিপাহী।"

মানুষের এই আসবের ফলে চন্দ্র অভিযান শুরু হয়েছিল। আজ তা সকলের জানা গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছে ঘোষণা করেছেন ১৯০০ সালের ভেতরেই মানুষ চাঁদে যাবে।

ভবঘুরেরা আজ যেন অধিকের শুরু হয়। ভবঘুরের মানুষরা চাঁদের চেনায় চেপে আর যেন সুদূরের খোঁজে যাবেনা। চাঁদের বৃদ্ধিও আর চলবে কাটবে চাঁদের মানুষদের সাধারণের ঘর আনিক খোঁজার আছে তার খোঁজ নেবেনা। আমাদের মানেরাও আর মানুষকে দূর পাঠানোর সময় চাঁদের টান দিতে ভাববেনা। তাদের মনের তখন চাঁদকে হাতিয়ে মনন, শুক্র গ্রহের দিকে যাবে।

হে মানুষের এই অভিযান, বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে আমরা জানাই। সুন্দরের সন্ধানে, কল্যাণের সন্ধানে মানুষের এই অভিযান সফলতা মণ্ডিত হোক, সুন্দর হোক এই আশা নিয়েই পৃথিবীর মানুষ আজ দিন গুনছে।

সমকালীন শিল্প সমীক্ষণ

শঙ্কর মজুমদার
(ছদ্ম নাম—ইংরেজী)

ছবিগুলোর ব্যবহারে অথবা সর্বাঙ্গীণ রঙ করার স্বাধীনতা কিছু নিয়ে আমরা আলোচনার একটা ছোট্ট ফ্রেমের মধ্যে সমকালীন মানুষের যেন একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছে। আজকের বাংলা দেশে সমাজনীতি রাজনীতি এবং বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলো যেন স্পষ্টভাবে মানুষের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ পাওয়ালেই শোনা যায়। এদের পরিবেশে শার্প ফলপ্রসূতার প্রাসঙ্গিকতা বলে যেটি যদি ধারণে অথবা ব্যক্তিগত হবার পক্ষে বিচার হয়ে ওঠে এবং তাতে যদি একদল বাদবিতণ্ডা উঠাপ আমরা প্রদান করতে উদ্যত হয়ে পড়ি, তাহলে হয়ত অন্যায় হবার কথা আমাদের নয়। কিন্তু এই ধরণের ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ফলপ্রসূতা সংক্রান্ত ধারণাগুলো মানুষ অন্যান্য বিষয়বস্তুগুলোই সুবিধামত শিল্পকে, ঘরেই দিন যাচ্ছে, একটা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে আদান দেখতে চেষ্টা করছেন। শিল্পী সাহিত্যিক, কবি, ভাস্কর ইত্যাদি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে জনের যোগ যখন সবে দূরে যায় তখনে চারদের যেন বিশেষ একটা কিছু।

দু দুটী একত্ত বিস্ফুট ঘটে গিয়ে সমস্ত পরিবেশকে যে একটা অবক্ষয় ও বিভ্রান্তি মনোভাবী আশা চাকা দিয়ে উঠেছিলো তখনও কিন্তু কবি বা শিল্পীর আসন সেখানে অন্ধ যায়নি সম্পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবসত্তা তারই স্থাপিত হয়ে গেছে পৃথিবীর সর্বত্র তারই সৃষ্টিমূলক শিল্পকৌশিক অস্তিত্ব পেয়েছে প্রায় সমস্তরে। আমাদের দেশের মত দিনাবস্থা এসে যায়নি হয়ত ভাগ্যে, ইটালি, ফ্রান্সগুলোর। কিন্তু একথা স্বীকার করার কোনো দ্বিধা নেই যে অন্যের এই বিশেষস্তরের মোড়ায় দিকে নানাভাবে নানান মানসিক অনুপ্রেরণায় ঘুরে যাওয়া পড়তে হয়েছেই বারবার। আকাশ জোড়া যেমন অনেক বিন্দু যেমন হারায় না বিশেষত বৈশাখী বিস্তারে যেমনই যা চিরন্তন, তাও হারাবার নয় কোনোমতেই। অবস্থার তারতম্য হতে পারে। পরিবর্তন হতে পারে আঙ্গিক ধারায় এমনকি পক্ষপাতের। কিন্তু মূলে যে একটা সত্তা থাকে এবং সুন্দর ভাবে যেন, শিল্পীর ভাবনা যাকে ফুটিয়ে তা আরো ভাল লাগে করে, তা ধারণার কোনো প্রশ্ন আসেই না মানুষের সভ্যতার ইতিহাস থেকে এমন কোনো সাক্ষ্যের মানুষের মনে যদিও দুটোর মধ্যে মনে হয়। শোনা যায় তাদের শিল্পীমহল আরো এক দিক এবং কিছুটা প্রবেশ। কিন্তু কই তারা তো কেউনিয়ে হয়ে পড়েনি এমন সম্পূর্ণ। মার্শেলিক আলবেরের কাছ তো কেনিনও ওঁনিয়েছেন শিল্পে তার Measure এবং moderation এর Levelটি নিয়ে গেছে হলে নিয়েছেই একমাত্র সত্য।

ছবি এবং মানুষকার প্রকাশের যে একটা নতুন উপস্থিত হয়েছে, অনেক দাবী তোলের তারে আরো অযৌক্তিকতা এবং বিশৃঙ্খলাকেই টান, কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক। সম্প্রতি শিল্পী ঐপদিয়েরে যেন একটী বেয়ার সমীক্ষায় বলেছেন, আজ শিল্প চিরপরিচিত রূপ ও নামের বন্ধনমুক্ত। আজকের শিল্পী অর্থাৎ যথার্থের আধুনিক শিল্পী একটা অমূর্ত এবং একান্ত অনির্বিচিত জগতকে ব্যক্ত করতে চায়। মূল্যবোধ প্রতি, পরিবর্তনের প্রতি মানুষের যে একটি চিরন্তন আগ্রহ সৌন্দর্যকে সমান করে শিল্পী, যিনি সাধারণ মানুষের মূল্যমান, তা সৃষ্টি করেন, তা আপাতদৃষ্টিতে ব্যাহত ঘটে, কিন্তু সেই অন্ধ এটাও ঠিক, তেমন জন্মের থেকে নানান উপাদান সংগ্রহ করে যারা আজকের শিল্পী তুর তেমনি জন্মের অথবা যা অমূর্ত যা অবোধ অথচ যা নতুন এবং সর্বোপরি যা সুন্দর। কবি সাহিত্যিক ইত্যাদিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে শিল্পীর কোনো তফাৎও তাই আজ নেই। আমরা সেই কালিদাস অজন্তা ইলোরার আসল থেকে যা দেখেছি তার মধ্যে থেকেই তো সুন্দরকে আরো করে এসেছি

এবং তার। এখন যা হয় সভাতার পক্ষপাতে আমরা ভেবে আসছি, তিনের মত দৃষ্টির এই বিকাশের সুযোগকে অপরিচিতের এবং বিদেশভাবে অবজ্ঞাসূচক নিরীক্ষণকে প্রশ্রয় দিই।

ইটা আমাদের কথা সবচেয়ে বাস্তবিকতার বন্ধন অস্বীকার করে আজ অগ্রসরণী হচ্ছে। এবং পৃথিবীর বহুদেশের সঙ্গে সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলাদেশের শিল্পীর মন এ ব্যাপারে সচেতনভাবে চিন্তা করতে অনেক দেরী করেছেন। ফলতঃ, পরে আমাদের পথ সন্ধানের ফলভোগে পড়ব, তাই আমরা সকলেই প্রগতীর দোহারে যোগদান করব এবং চলব। ফলতঃ যোগ উপযুক্ত সময়ে সমস্ত আটিস্টদেরই কিছু অভাব আছে সত্য, কিন্তু প্রগতী কথাটার মধ্যে মানসিকতার দৃঢ় স্থিতির অভাব নেই। সেজন্যে ওই আন্দোলনের পরিচালনকারী ইউনাটা-কারদের চরিত্রের সঙ্গেই বিচিত্র। কখনো যদি কখনও ইটের টুকরো, সেখানে বাস্ত চাবির রিং, মাথার কাটা এই সমস্ত ছোটখাট জিনের মধ্যে একটা কিছু যে তৈরী হচ্ছে সেটা composition ঠিকই কিন্তু কোথাও আমের অথবা মুখমণ্ডলের সেই ছন্দ অথবা সুর, যা আমি মুখের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে?—না, এরা অথবা আজকাল করবার সময় অথবা অথবা এমনো অনেকে অন্তত আমাদের দেশের শিল্পীদের। তাই যা কাঁচের চলছে আমুক তারই কথা। এসব আমা যায় একটি গ্রুপ থেকে। হাজরার একটি কন্সট্রাকশনের পরিচালনায় একটি প্রগতী অঙ্কিত হচ্ছে যার পূর্ণাঙ্গতার কল্পনা এখনে ঐ সকল চারের অনেকটি ছবি দেখে কিছু আমা যোগ আমা অনেকে এই ধরণ মারামারি অবস্থার অথবা পড়তে হয়েছিলো। বিভিন্ন বৈদেশিক form ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইনি কেউ কেউ দেখাতে চেষ্টা করেছেন নিঃসন্দেহই খুব বলিষ্ঠ এবং অঙ্কিত হাতে অনেকটি তৈরিও হয়েছে। এ ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্যরকম আরো অনেকটি ছবি এই প্রগতীতে দেখেছিলেন ঐ পরিবেশ অন্তর্গত। Landscape ছাড়া অনেকটি বেশ নতুন ধরনের ছবি অথবা শিল্পী বর্তমান পরিবেশের অনেকটি নতুন ধরনের ছবি অথবা শিল্পী বর্তমান পরিবেশ

আমাদের মানব সমাজ অভিব্যক্তিকে মুখে ধরতে চেয়েছেন। এই প্রগতীতেই মুখোশ ১৮ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুজন প্রায় সমপর্যায় ভাবের কিছু কাজও রেখে গেছেন। তবে এদের আমা মনিষা বলতে গেলে একটা বেশ বড়, একটা খোলা আমাদার মত মিঠাদার ইত্যাদি পরিচ্ছন্নমান, সে ধরনটি আজকের অন্যান্য প্রগতীতে প্রায়ই দেখা যায় না। এই যে মেক্সি সরকারী আর্টস্ কলেজে চিত্রাবলি যা প্রমুখ অনেকজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির হাত দেখা গেলো। বিশাল একটা পাথরের ফলক খোদাই করে পরিকল্পিত সমতা সৃষ্টি করবার আয়তনটুকু নিখুঁত সাজা ইত্যাদি কাজে হয়ত আছে, সামগ্রীক ভাবে তাদের দেখতে হয়ত ভালও লাগে, কিন্তু তা সত্যিকারে তাদের শিল্প নয়, তা হল কথাকুশলতা। তবে সে যাই হোক ঠিক যেমন অভাব নেই সাহিত্য সমের, সঙ্গীত বিজ্ঞানজনের। অতি সাম্প্রতিককালে এই পরিবেশে যাদের অনেকজন শিল্পী দ্বারাও কিছু প্রবাসী চিত্রকর তাদের চিত্রকর্মের প্রগতী করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কথা পৃথকভাবে বলা আজ পরিসরে সম্ভব না হলে তাঁদের একটা কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে এঁরা সকলেই ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের একটা বলিষ্ঠ পরিবেশ রচনা করে যেতে চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমী প্রভাবের মোলব্যাধায় আটকা পড়ে এঁদের অনেক কেউ কেউ যেমন নিজ বক্তব্য প্রকাশে কিছুটা দুরবগাহী, Obscure, ঠিক তেমনই কোনো কোনো শিল্পী সম্পূর্ণ একদেশে ভাবধারায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।

সামগ্রীক ভাবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আন্দোলিত সাম্প্রতিক চিত্রশিল্প আজকে প্রগতীগুলি সম্পর্কে একটি কথাই বলা চলে। সেটি হল assimilation —বিদেশী form, technique, চিন্তাধারা সব কিছুর অনেক কিছু হয়ত কিছুটা ধার করে, একেবারে প্রকাশ করার প্রয়াস। এ বিষয়ে যাঁরা নিঃসন্দেহে প্রগতীর অগ্রগামী তাঁরা হলেন আধুনিক আর্টস, মোমাসিলা এবং ফ্রিলান্সিং গালারী অথবা বিভিন্ন আন্দোলনী ইত্যাদিতে যাঁদের আমাদের সম্পর্কেই বলা চলতে পারে এই একটি কথা। যেমন বলা যায় ঐ অঞ্চল ভূখণ্ডী।

ইনি অতি সম্প্রতি একটি প্রদর্শনীতে একসঙ্গে তাঁহার আমাদিগের জনের কয়েকটি ফেরেকীতে বিষয়ের করে কিছু ছবি রেখেছিলেন। কিন্তু ঐ মুষ্টাবীর প্রকাশভঙ্গী বড় কেরেই লক্ষিত হোয়া। বড় জোর, কলকাতার দর্শকের আমার, আধুনিক। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে একথা স্বীকার্য যে শিল্পীর অথবা সেই অদ্ভুত ফলের অবস্তুটিকে দেখিবার অনুপ্রেরণাটাই প্রকট, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী সেই একই আগের যোগ্যের জটিল। তাহাদের স্বরূপ যান। ইনি সাধারণতই প্রদর্শনী করে থাকেন। তবে অনেক বছর আগে স্পেন থেকে ফেরবার পর এঁর যে কয়েকটি 'বুল ফাইট' কেরেছিলেন সর্বজন 'প্রাণ আও রোমাঞ্চিত', তার মত প্রতি বিদ্রোহের হয়, তার মত বক্তব্য, স্পষ্টতা এবং অতি পরে অতীত প্রদর্শনীতে তিনি বাহবারি আসেন। এবং অন্যান্যের অবশ্যের আমাদেরীতে অতীত সাধার কোন্তে ইনি যে ছবি কয়েকটি কেরেছিলেন বিভিন্ন নরা medium নিয়ে কাজের বিকাশে যাঁরা পরীক্ষামূলক কয়েকটি কাজে রাত আছেন তাঁদের অথবা যাঁরা মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন প্রধান, অশোক মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। এবং কোরের সঙ্গে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমাদের ধারণা দেশে সাধে কেউ প্রায় প্রথম কয়েকটি বছর শিল্পী তত প্রতিকূল পরিবেশের সাক্ষাৎ করে চলেছেন বিশেষ বিশেষভাবে।

এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ আমাদের শিল্প চাহিদার প্রতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে আরও দুই শিল্পীর নামই উল্লেখ করা যায়, যাঁরা আপন প্রকাশ ও পরিচয় প্রদান করে যাওয়া দেশের শিল্পকে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, যাঁরা পৃথিবীর বহু বহুদূর পর্যন্ত দেখিয়ে বহু প্রান্ত থেকে যাওয়া দেশে এই কলকাতা শহরে এসে আপন সৃষ্টির প্রচুর্য প্রদর্শিত করেছেন। কিন্তু বিশেষভাবে একজনের কথা বারে করা একান্ত প্রয়োজন এই বছরের মোহার দিকে যোগাদিয়া আর্ট গ্যালারীতে ঐ একা মুক্ত শিল্পী দেখে এসে প্রদর্শনী করে যান। ধরিত্রী ইনি যাওয়া দেশের মানুষ, তাহলেও চিত্রকলার প্রতি নিবিশেষ অনুরাগী, কিন্তু এঁর সৃষ্টি অবস্থার যেমনটুকু পরিচয় নতুন এবং তার প্রকাশের একটি দর্শনানুবিক বক্তব্য সমাজ। Monopoint অর্থে যাহাকিছে যারা কলকের চরিত্রটি হাতেই পাওয়া যায়। তবেও অথবা কেরেছকে কলের তথ্য চাহিদে চাহিয়ে তাদের নিজেদের সৃষ্টি form থেকে বিশেষ ভাবে তুলির সাহায্য না নিয়েই কাজের তথ্য যে ছবিগুলি পাওয়া হয়েছে, সেগুলির বক্তব্য যেন স্পষ্ট কোনটা প্রায় কোনটা পাশী আমার কোনটা সুষ্ঠু Composition. অসাধারণদের পাশী যদি বর্তমানে কোনো শিল্প আন্দিকের ব্যাপারে কলকে চান, তাহলে ঐ মুক্ত নাম হয়ত সর্বাগ্রেই এসে পড়তে পারে। অবশ্য ঐ রাখাল বলে এবং অবশ্যিত এই দুই নামের উল্লেখ করতে হয় বিশেষ কয়েকটি কারণে। উভয়েই Amateur অর্থাৎ সৌখিন শিল্পী। রাখাল পাল হৈছে হাজপাটের অনেক কর্মচারী। এবং অবশ্যিত অন্যান্য বহু বহু একটি বাজে। ঐ কাজ প্রকৃতির বিভিন্ন কোনে দৃষ্টিপাত করে এই দুই অপেশাদারের ফুলে ধরতে চান। এবং অবশ্যিত এই বৈশাখেই বহুর পরে যত চড়িয়ে যা প্রকাশ করেন তাতে অভিজ্ঞতার ছাপটুকু না থাকলেও সেই ছবিটুকু, নিঃসন্দেহে সেই অদ্ভুত অপরিচিত অথচ তুমুল অনুভূতির একটা ভাল লাগবার কলকের প্রতি ইঙ্গিত দর্শক পেরেই যাবেন।

অতএব কোলকাতা শিল্প প্রদর্শনীর ঘোরে যার কথে এই মুহূর্তে যে কিছুটা জীবন এবং মুখর সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর্ট নিয়ে আলোচনা, চিন্তা, বিতর্ক বিবাদ এরা যেমন তুমে আলোচনা যেমন থাকবেই। আর এই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মতের কথা, আবশ্যিক পরিচয়ের পৃথিবীর একদল মানুষের মুখের অথবা একদল যে সৃষ্টির আগুন আর্টিস্টদের বিরুদ্ধে, যাদের যেমন শিল্পী তাদেরও কম কি তাদেরই অংশবিশেষ না? সুতরাং আমাদেরীতে পুরু আনকোরা বুলিয়ে যাঁরা বিরুদ্ধ করেন চিত্রকলার তথাকথিত আধুনিকতার আধিক্যকে, যাঁরা ইচ্ছা করতে চান প্রত্যেকটি মানুষের সেই বিষয়ক্রমের প্রতি চিত্রকলের অনুরাগকে, যাঁরা অভাব করেন স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পীজনের সহজতম বিকাশ প্রয়োগকে, যাঁরা যোগাতার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টি করতে উদ্যত হন অথবা অনুভবের অনুকূল জটিল বেড়াজাল—তাঁদেরও রয়েছে মূল ইতিহাসের কঠোর পুঁজি থেকে অবশ্যের একটি।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সার্থক উপন্যাস—

'স্বপ্নের খাঁচায়'

অমিল আচার্য
(প্রথম বর্ষ, ইংরেজী)

ছেলেবেলা থেকে বাংলা প্রবাদের একটি কথা শুনে আসছি যা থাকে কপালে তাই হবে। মানবজন্মের সার্থকতা 'স্বপ্নের খাঁচায়' কথাটা এক সামাজিক বাস্তবতার আঘাত আমরা পড়েছি এক ভাবের আবেগে ভোগে। স্বপ্নের খাঁচা আমরা প্রত্যহ ভাঙছি। বস্তুত সেই খাঁচাটাই আমাদের চারিদিকে উপাদান দৃঢ় করিল বলে। আমরা তার বাইরের বিরাট আকাশ বিশাল প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে পারি না। আমরা খাঁচা ছেড়ে দূরে দেখি। দূর কিছুর ব্যাপার করি। 'দৃষ্টিবিভ্রম' করি কোলকাতায় বাসার. অধিকাংশ আমরা গ্রামের যাই, কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা তার আখেই আমাদের মনে নূতন মূল্য বীজ দিয়েছে। গ্রামের ঘর দোরই ভালো পাহবের বিশ্বকেন্দ্রিক সভ্য সমাজের মধ্যে বসে। 'দুরন্ত' বোঝার এমন একটি চরিত্র। সে মধ্যবিত্তের সন্তান হয়েও গ্রামকেন্দ্রিকতে বিশ্বাসী. গ্রামকে সে দেখেছে, কিন্তু সে দেখা অন্যের প্যানির দেখা। সে বন্ধুরা গ্রামকে দেখে, গ্রামের লোকদের নিয়ে যে সব বড় বড় কথা বলা হচ্ছে তা তার ভালো লাগে নি। 'সাপের গ্রামদের ডিফেনিটিভস', 'গ্রামবাসী অর্থ, ফাইভ ইয়ার প্ল্যানস্ সুন্দর ইংরাজী, বন্ধুরার ভালো দুরন্তের পছন্দ নয়। গ্রামের কুসংস্কারও পছন্দ নয়। বস্তুতর কাছে এসব 'চলে, আর চলুন ন্যাশি'র ব্যাপার; কিন্তু অন্য বাইরে এসব সমালোচনা করতে জানে না, এসব সে ভাবে না—এসব ইংরেজী আর নিজেদের মধ্যে কথা আমরা জল পাব? কি দো আমরা জল পাব?' এটাই হচ্ছে বাংলাদেশ, এটাই আসল ভারতবর্ষ। মেলিনিজম্, বা মাওইজম্, বা গান্ধীইজম্ বা আবেদিকালিজম্ বা বাণালিজম্, এসব পরের মুখস্থবিদে শহরের লোকদের জোলাতো হেসে পারে, কিন্তু গ্রাম, কৃষক, তাদের মৌলিকত্বের আলো অন্ধকারের মধ্যে কোথাও পড়তে পারল? যারা কৃষি-আন্দোলনের বাবে পথ নির্দেশ, তাদের পথ জানে। সেই সময় পথ যদি কোনদিন তাদের হয় তবে বুঝবো ভারতবর্ষে বিপ্লবের সুকঠোর পথ তৈরি হচ্ছে। যদি তাদের মধ্যে কাজে ভিন না থাকে তবে বিপ্লবের লালসূতো এরা বিদেশী হিঁড়ে দিয়ে, আবার বাস্তবের দোলায় দিবসে ধরা পড়বে। 'বিরাট' একটি একজন আদর্শবাদী। সে বক্তৃতা-বাজীর ধার ধারে না, তবে বক্তৃতা দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। তবে 'স্যাদিক অন্যোন্যতি' সম্পর্ক চরিত্র বা পরিবেশ বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাই কি সে, সাংবাদিক, বিরাট, এবং তার বাইরেটাকে দুরন্ত চিত্রিত করেছে। তার বাইরে-বিরাট-দুরন্ত মানুষ কোলাপাসল, কি সে, প্রত্যাবর্তন, এবং পার্টির দীক্ষার. সেটাও জানতে বাকিই।

'স্বপ্নের খাঁচায়' মানুষ সোজাসুজি উপন্যাস্ চারটি অংশে বিভক্ত: (১) মুক্তিবাটা, (২) লক্ষীপুর, (৩) সোনালা, (৪) পার্টিটা। এই চারটি অংশের মধ্যে মুক্তিবাটা, এবং সোনালা যতো পরিষ্কার এবং সুন্দরভাবে লেখা, অন্য দুটি অংশ মোটেই তেমন সুপ্রযুক্ত এবং পরিষ্কার হয়নি। গ্রাম সম্পর্কে তার ভড়তা আছে। সত্যি বলতে কি গ্রাম জীবন সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদেরও 'লক্ষীপুর' পড়তে কষ্ট হবে। এর মূল কিছি তার নিজের জীবন সম্পর্কিত 'বিজন অভিজ্ঞতা'। তিনি লক্ষীপুর সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতি 'লক্ষীপুর ব্লুজ' আমার মনে এতোটুকু ধাঁচও কাটতে পারে নি। বরঞ্চ তার সোনালা, এবং মুক্তিবাটা যথেষ্ট বুদ্ধিমানার পরিচয় বহন করছে। যেখানে তিনি লক্ষীপুরকে বিচার করেছেন, যেখানে সে চরিত্রগুলো তিনি এঁকেছেন, 'স্বপ্নের খাঁচা' যাযাবার এর কথা তেমন ছাড়া তা কিছুই হয় নি। সেই

সবের ঘাঁচাটা সবের প্রথার সেন এবং প্রামে শ্রী কে. আসিয়েছেন। গ্রামের লোকদের তা ভালো লাগে নি। স্বাভাবিক। তারা জল পাবে কি না জানতে চেয়েছে।

গ্রামে তিনি যতোটুকু দেখেছেন, প্রায় বিপুলভাবে দেখেছেন। গ্রামের একমাত্র সিনিক চরিত্র 'ধনু বাইতী'। 'ধনু বাইতীর মধ্যে হয়তো আমরা এক জলজ্যান্ত রবি পাওয়া যেতে। বলা বাহুল্য সারা সই'পুরে 'ধনু বাইতী' একমাত্র চরিত্র যা পাঠকের ভালো লাগতে পারে। 'দুখের রবি' ছোলা ব্যাপারটা সবাসরি গ্রামের ওপর পরিবেশনা করা হয়েছে, যেমন শ্রী সেন বক্তৃতা, তেমনকার লেখার আলুথেকু, বিবাহ, এ্যাডিকালাচারাল অফিসার এবং ছাত্রদের নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা। কোথাও কোন প্রাণের আভাস নেই। কোথাও কথনে বাস্তবিক নয়, কোথাও অন্তর্দৃষ্টি বিকশন নেই। লেখক একমাত্র মজুমদি হৈরী করেছেন, যেখানে ধনু বাইতী একমাত্র বাবলা গাছ, এবং গ্রামের একজন চতুর্থ পথিক।

গ্রামের লোকদের কাছাও তিনি গাঢ়চিত্রণী চক্ষে পরিবেশনা করেছেন। সেটারও কতোটা প্রয়োজন ছিলো বলা যায় না। তবে গ্রামের লোকেরা সবের ঘাটায় স্নান করে না এমন একটা ধারণা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক নয়।

—যাবা হলে আমরা যাবা, যাবাই যাবব।

—'চালাক হলে চন্দ্রবে কি করে বাবু? একবেলা খেতে দিলে একবাবুদের কথা জানব।'

গ্রামের একটা মানুষের মুখে এ ধরণের ভাষালেখ চাপিয়ে দেওয়া সবের লেখা ছাড়া আর কিছুই নয়।

—'কি রে ইবন, হা করে কি দেখছিস?'

'এখানে দিনটা কাটালে হবে?.....দুখের কটা বেলা' ভবে ভাঁড়াগুলো আরও স্পষ্ট করার বদলে ঘোলাটে করা হয়েছে।

সবের বইটি পড়ে এই ধারণাই আমাকে করতে হয়েছে যে শ্রীমতীর রায় গাছে টিং, খেয়ালী, এবং বুড়ি বাটাতে যতোখানি সার্থক হয়ে উঠেছেন, গ্রামের অন্য মানুষ অনেকটা মাঠ কলে মনে হয়েছে। খেয়ালী আগে প্রথমার বন্ধুটি চরিত্র চালাকারে দেখা হয়েছে। বন্ধুর পুরুষকে থেকে পরিচয়লাভে প্রতি মমতা অনুভব করার চাইতে এই অংশ অনেক বেশী আবেগমন্ডিত।

"আমরা প্রথমে মেজাজে লাবণ্যর ঘরে গিয়ে সে বৌকে নিয়ে চলেছে গাবণ্যায়, কিন্তু এমন খেয়ালী—হাওয়াতে তার বোটা ঘরার নিয়ে একবারে ঘাঁস থেকে পক্ষম বৌকোয়। বৌকো টলমল টলমল করছে।—"

নিবিল চরিত্রটি একদিক দিয়ে বেশ ইন্টারেস্টিং। মানে সে মোটা চোখে চাবিদিক আসে। কোনো ব্যক্তি অপোজড অর্থবংশপরম্পরায় ধরো ধরার ইচ্ছে তার নেই। তাই হয়তো প্রথমার লেখার সঙ্গে গ্রামে ছড়াবাবুদের কাছে তার মন বিদ্রোহ করে না। বুড়িবাটাতে সাধারণ লোকদের সাথে গল্প করেও সে সমান আরাম পায়। যাবাতে ছাড়াতে সে অ্যাডাপ্টিবিলে চৌকিদারে ঘরে। কোন "Proletarian pride" তার নেই। আসলে নিবিল চরিত্রটি একটি স্বাভাবিক চরিত্র। কোনো ব্যক্তি আগে biased হওয়ার উপায় তার নেই। তবু এরকম চরিত্র যে ধরণের পরিবেশে থাকতে পারে তা হল অবশ্য অবং। চিরাচরিত ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক "Platonic love" এ অভিজ্ঞ পড়েছেন। দুটি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধরে ধরা পারস্পরিক মানসিক মতবিরোধ থেকে যেন 'মধু' চরিত্রটির জন্ম হয়েছে।

"....."ছাড়া দুজন ঠিক মধ্যিখানে গ্রামে মোটা দুই পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্নতা ছড়াই চিত্রায়িত। চিত্রায়িত ছাড়ের অন্তরের লোকদে। চারপাশে দুজনের অনৈক্যের চাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে তারা প্রবেশ করেছে এমন এক জায়গায় যেখান থেকে কেউ কাউকে সাড়াতে পারবে না'। মনস্তত্ত্বিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নিবিল চরিত্রটি একটি অহঙ্কারিক বাঙালী ভদ্রলোক মূল্যে।

সমগ্রতঃ বলব, বাংলা সাহিত্যের যে অনুরা-কবিতুরা তার মধ্যখানে 'অনীম রায়', খুব কাছে অথচ দূরত্বের সঙ্গে পরিচয় করেছেন। আমাদের দিনে তিনি আরো সম্ভাবনাময় এবং সার্থক হয়ে উঠবেন এ প্রত্যাশা তার 'সবের ঘাটায়' উপন্যাসটি দিয়েছে।

দুটি উপন্যাস : অবক্ষয় সমাজ প্রেমোত্তিরিক্ত সার্থকতা—

প্রজাপতি : শব্দের খাচায়

এলিয়ট সাহেব একদা লিখেছিলেন—যখন কোন লেখক বা কবি বড় হবে 'পলমাল' হয়ে পড়েন তখন বুঝতে হবে তিনি বাজারে যে দ্রব্য পরিবেশন করিতেছেন তাহা আদৌ নূতন নয়, পুরাতন পত্র নূতন মোড়কের মোড়কে পরিবেশন করিতেছেন। অত্যন্ত আমার এরকমটি মনে হয় নি। অন্ত তিনজন সাহিত্যিকের লেখা পড়তে গিয়েই মনে হল এর চাইতে খাঁটি কথা অন্যত্র পড়ি নাই। সমরেশ বসু, প্রথম সাথক যৌ লেখার, বাজারে এরকমটি বিরল। যার জন্যেই। যা লেখেন, যে ভাবেই পাঠক আছা কি লেখে ভিন্ন। ভাষার অন্তরে আপনি বিশ্বাস ঈশ্বরে! 'আপনি যা বলুন, কিন্তু ঈশ্বর আমরা যে তার সন্তান!' তাদের বলব এই বিশ্বাসটুকু, তা হাতখানা তাদেরই এমন হাত আমাদেরও খুব বড় লোকেরই আছে, তার একটা লেখক্ষ্য ও নয়—নয় ছোট গল্প—বড়ি বিশাল গল্প, ছবিসালে গল্প অথবা ঐ জাতীয়। এই কারণেই পড়তে পড়তে মনে হয়—ছুটেছি ছাই, চাইনা যাই, বেরিয়ে যাব নয়। আর কারণের এটা একদম্ সমালোচনা হচ্ছে না, সমালোচনার নামে অনর্থক বাগাড়ম্বর, অথবা অন্যায় জোরোক্তি, যা অন্ত কিছু। বাংলা সাহিত্যের পরিচয়তা আমরা বলে বলে পাইন মুখে সাথিরে বলবেন! অন্ত কর্ত, যোটেন্ কিন্। দেখেন, দেখান চিনে নিলেন! কিন্তু তুমি দেখে যে ঘর-সেই হয়ে দেখেন্টারের ছুঁ হয়েই এর পাথার ঔর থাকে। বাজারের ছুবিন বাবে দেখে যে আর কারোই থাকবে না। তবে হাঁ অনীমবাবুর প্রচুর দেখে আছে। তাইই ঘরিটিনি পাঠির যা রেকর্ড্ নাইজ, নোনা ধরা বন্দুনিয়ার যে বন্দুকের ধরার মতো কাঁচি কাঁচি বিরতি আমাদের তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি যে একজন দক্ষ 'ঘরিটিনি' তা তার চিত্রাংকনে মোটামুটি স্পষ্ট।

প্রজাপতির নাম আজ মনে পড়ছে বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষাৎকার কথা। 'সাহিত্যের কথা, সাহিত্যের কথা'—দুটি বিষয়ের মধ্যে ১:৯০ তে কোন কথা বলা চলে না। বুদ্ধদেববাবুকে এসব কথা বলতেই হবে, বলবারতা যিনি রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি বসেছেন, সুধীন্দ্রনের প্রাণ করেছেন, আধুনিকতার জয়গান গেয়েছেন, যাকে গল্প লিখেছেন, কবিতে মাতাদী করেছেন, আর মুখ বেঁকিয়ে ঈশ্বরকে যারা কল্পনেন—এসবই পাইত, এসবিল্ল, লেখেন। বুদ্ধদেববাবু যে বুল করে 'সাহারা থেকে আসার' এবং সাগরে বসে বিড়বিড়ি ভুলে দিয়ে যান্নি যাহিত্যিটের অন্তর সেটাই আমাদের পক্ষে যক্তির কথা। মুখার্জী থেকে শুরু করে 'বেলাশে ঘুড়া' অবি যিনি লেখেছেন। নিজের ঘুড়া নিজে দেখেন বলেই যাদা। সত্য বলতে কি বুদ্ধদেব বসুকে প্রেমকবির হিসেবে দেখতেই ভালো। এলিয়ট দেখেন পাইত এবং তার অন্যান্য বন্ধুর মতো বন্ধুদের সম্বন্ধে এমনি সুপাদ্য পুস্তক লিখেছিলেন যে তাদের পরলোক সম্পর্কে তিনি আশঙ্কিত যেমনি আশঙ্কিত বন্ধু যাহেন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের পারলৌকিক যাত্রা করতে করতে হবে তাই ভাবছি। কবির ভাবেরও—ছোট ভাই সমরেশ, বয়সে বড় শ্রীবুদ্ধদেব বসু। ছোট ভাইয়ের মতো ঘুরাক উপন্যাস লেখার যার তার নেই। কিন্তু যাদাপ বথাযোগ্য। লেখার তারও ত্রুটি নেই। ত্রুটিটা কি? না ত্রুটি হল এটাই তো বর্তমান জীবন। তাই ঔপন্যাসিকের তার হল সমাজচিত্র তুলে ধরা

হায় আল্লা! আমরা সবাই জানি কিভাবে আমরা এই দেবীর কৃপায় ভূতলে এলাম। তাই বলে সে সম্পর্কে পরস্পরকে বোঝানো কি যায়েজ? এসো বিচ্ছু, বুকিটা ছেলেমানুষী নয়। এই যে সমাজ জীবনের সর্বস্তর থেকে তাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার, তাকে আরো আদরে টেনে না নিয়ে এই কামের ব্যাপারটাও ভয়ঙ্করে দিয়ে একটা "উজবুকের স্বর্গ যায় করে দিব। বাপার এঁকে বাচ্চাদের জন্য অবশ্য কিছু "পর্নগ্রাফি" লিখে যেন আর বিক্রেতার আসল চরিত্রটি যায় ধরে ধরেন? প্রজাপতি উপন্যাসটি সবারই পড়া। অনেকের পড়ে পড়ে কয়েক লক্ষ মুখস্থও যে হয়ে গিয়েছে এমন নয়, তাই বলে আমরা ছেলে বাচ্চা দু'জনের চিন্তা যা প্রায়শই আমার লেখকের 'সমস্যে ছিঃ,' ব্যাপার বলেই মনে হয়—

"উঁহু যাদু, হাতে একেবারে বিস্কুট ফেলে যেন ··· মাঝখানের ফাঁকে, আর দুপাশে গোল হয়ে ওটা ওটাকে সত্যি আমার মাংসপিণ্ড বলতে ইচ্ছা করে না··· ··· ওই যে ঘাঁয়ে লেখে না 'স্তন'··· ওলি মাগো শিগগির বুক ফুটোচ্ছে··· মাগো···

"আচ্ছা, এরকম গোল হয়ে থেকে উঠেছে বলেই ওখানকার জায়গাটা কি এরকম খেয়াল, যেন খুব ছোটো ছোটো বিন্দু বুকে ওড়ানো।··· ··· আর ওখানেটা··· মাঝখানেটা আর বৃত্তদুটো, হাতদুটোর থেকে চারটে বেশী কলম। ····· খেয়ালটা ইকিয়ানের ভাবনা যেন গোল করে ঘোরেছি··· এর মাঝে আমার কেন, সবরকম মাঝেই দেখা··· মনে হচ্ছে মাবতে পারছি না, ঘুরিয়ে যাচ্ছে একটি হাত বাড়িয়ে দিই।"

হাসবে। একটা ছেলেছেলে আদর করে মায়ের দু স্তনের ছবি যাকে যাকে ন—বিন্দু অর্থাৎ শিশা আর শরীরের বিশেষ অংশের এমন বিন্দুর বর্ণনাই (মানে ঐ আরকি। লেখক যে বস্তুগুলির নামে করতাবে অভ্যোবার পরিচিত আমরা বর্ণনা) কি সমাজের ছবি তুলে ধরা? এ দ্বারা আরো যা আমরা তা দেখা যাবে না। যে মহৎ লক্ষ্যেশ্বরবাবু আমাদের নিয়ে এসেছি আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু আমাদের 'প্রজাপতি' একটি নিকৃষ্ট pornography। লেখকের মুখ্যুর তা নিয়ে আপনি কিছুই বলতে পারেননি। যাদু, যন্ত্রণা, বেদনা, শিশা দু'বছরের পাবকে, অনুভূতি, ন—বিন্দু, বলের অবদান বর্ষণ, যাদুটি, ছেলে, ওরা দলটি, মাস্তানে, বিস্ফোরণ, রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্ন, লেখাপ, পাহাড়া, অন্ধকার, এর বন্ধ ওরা, ছেলেবেলার ঘর, বাবার জন্য কলম, মাইকেলিন, বোমার আঘাত, মুখুর মুখে চুকির চুন চুন এগুলো কি লেখকের নিজের অনেই হয় নি? লেখকদার স্বাভাবিক বিকৃত মানসিকতার বিকৃতরূপকে তিনি যে বিভাবে বলেছেন তা লক্ষণীয়। পড়তে পড়তে হঠাৎ দুএকটি পাতা যায়, বোর লেখক যা লেখাকে নাড়া দেবার জন্যে লিখা আছে বলে আমার মনে হয় নি। তবের ব্যক্তিতে বলা যেতে পারে মানিয়ে 'অশ্লীল', একটা আপেক্ষিক শব্দ। বিদ্যে নয়। অশ্লীলতা তবুও ভালো লাগে কোনও প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা হয়, মানসিকতার তো কিছুই ভালো নয়। লেখকের মতো এমন একটা দুর্লভ ব্যাপার নৈব নৈব চ।

সমরেশ বসু অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক। আমি যেন পত্রিকায় তার 'কোথায় পাবো তারে' পড়ে মুগ্ধ, বিস্মিত হয়েছি। একটা লেখকের হাত থেকে দুরকমের লেখা। 'কোথায় পাবো তারে', লেখকের প্রেমাত্মিক অনুভূতি সত্য, আর 'প্রজাপতি' এবং 'পাতক' তার অন্যথার দিক।

সমরেশ বসু, যিনি 'বিষ্ণু' ছেলের হাতে মায়ের উপন্যাসটি লেখক তিনি যে সবে একটি বনী কাগজের হলদে ফুরা হয়ে পড়বেন, এবং সস্তা হাতবাক্সিতে বাজীমাৎ করার চেষ্টা করবেন, এটা আশা করা যায় নি। প্রজাপতি সম্পর্কে বহুলোক বহুরকম অভিযোগ বিষয়ে এবং সপক্ষে। আমরা শুধু এই শক্তিমান সাহিত্যিকটির জন্য দুঃখ বোধ করি।

সময়ের সেতুবন্ধ থেকে

বরুণ মজুমদার (প্রাক্তন ছাত্র

বৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে আমি আজ ফিরে যাবো
বকুলের সুবাসিত ঘরে। যেখানে অনেক হাসি –
যেখানে অনেক গান সহজ যেখানে সুরে
সবে আছে। মুক্তির দৌড়ে আগে আছো
সেই পরিচিত মফস্বল শহরে।

কথা বলার অনেকটা চরিত্র জমে রেখে
ফিরে যাবো শৈশবের অক্ষয় ঘরে।
আকাশ কি পাতালের কতটুকো ছুঁয়ে
কে যত বাঁধনো তুমি বাসুকার চরে!

কিছুটা বিশ্রাম পেলে সময়ের সেতুবন্ধ থেকে
নদীর কিনারে ফিরে লেখে যাবো ফেলে আসা বাড়ী।
এখন ফিরবো ঘরে। কিনারের গোধূলি বেলায়
কি বাকবো বেলাভূমে! কি বাকবো সমাধির ভয়ে?
আমার প্রার্থিত ধন কোনদিন খুঁজে পাই যদি
তবুও রাখবো তার অক্ষয় পুরাতন স্মৃতি।

একটি ফুলের ঘরে মনে থেকে বিদায় বেলায়
আমার শিশির আমি সে ফুল ফোটাবো নিরবধি।

বিদায় বিরল মুহূর্ত্তেরা

শুভ বসু
(২য় বর্ষ – বাংলা)

উঠে এলাম—সন্ধ্যা হ'লো—উঠে এলাম—
এখনো এই হাতের ওমো হাতের স্পর্শ,—
অন্তরিক্ষের বুকের মতো পাখনাটি,
এখনো এই অন্ধকারের গায়ে গায়ে
আলোর বুদ্বুদ,—বিদায় পথ, বিদায় পৃথি
বিদায় বিরল মুহূর্ত্তেরা।

অথচ সেই প্রতিশ্রুতি ছিল পড়ন্ত অন্ধকারের
সাক্ষাৎ হবে বিদায় পথ—ফুরা নদী,
অথচ সেই প্রতিশ্রুতি ছিল পড়ন্ত অন্ধকারের
কথা রাখে, অবাক চুমে তার যেন সে কথা রাখে।

উঠে এলাম—সন্ধ্যা হ'লো—উঠে এলাম
মৃদুল ছুঁতে নিলাম চোখ, নিজের ছুঁয়ে সুখের মতো দুঃখ
তেমনি ছুঁয়ে অবাক আজো, অন্ধকারে
লাবণ্যময় পেরিয়ে প্রায় দুঃখ দুঃখ সিঁড়ি আমরা
নেমে এলাম—অনুভবে দুঃখ, বিদায় পথ,
বিদায় পৃথি, বিদায় বিরল মুহূর্ত্তেরা।

নির্জন প্রান্তরে রক্তাক্ত তুমি

—সুকান্ত বসু
দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা)

আমি অনায়াসে প্রাণের পেরিয়ে যাই,
আমার সবে ছিন্ন কুসুম আমারে বাধা হয়ে থাকে না,
অথচ তুমি প্রান্তরে সাথেরই রক্তাক্ত হয়ে ওঠো।
বেদনায় প্রান্তরের গাছগুলো নীল হয়ে যেতে
পথহারের ছিন্ন চরণে তুমি অভিশাপ দাও
মাঠের ঘাসের ওপর উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোয়
ক্ষেতমাটা হাওয়াকে দুহাতে বাড়িয়ে বক্ষের ঘিরে
নিরুপায় তুমি।

আমলে তুমি ও আর মাতৃহারা শিশুটী নও।
শিবির থেকে পথে নামলেই, যাযাবর পথ তোমাকে
পথ দেবে এ আশ্বাসের কথা শুনলে, পরম নিশ্চিন্ত
কৌতুকে হেসে ওঠো। অবিশ্বাসী তুমি পরম নিশ্চিন্তে
প্রণাম কর।
যদি প্রান্তরে অবর হারায় তোমার চোখ থেকে
মোহের কাঁটার মত অশ্রু ঝরে পড়ে

অথচ তুমি জানবেই না
প্রান্তরটুকু পেরোলেই জ্যোৎস্নার ঘর তোমার জন্যে
পথীর এপিয়ে আমি প্রতীক্ষায় আছি।

ছন্দ রিক্ত

—অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা)

হায় সময় তবু শেষ নয় পথ
ছিন্ন চিত্তার দুস্তর সংঘাত
বাতাসের কানে নীরবের অভিশাপ
নীলাভে বিলয় জীবনের মরণ।

এখানে পৃথিবী প্রহর-চেতনা সুপ্ত
কেবল রাত্রি ছায়িতে অবলুপ্ত
অবশ কোটিতে প্রিয়াস্থ ছায়ায়
পৃথিবী খণ্ডনে জলধি-প্রেম স্তব্ধ ;

কেয়াপী-কূল দু-হাতে সময় খোলে
তারার চুপে দুখ খোয়ড়ানো স্বপ্ন
জীবন-মরু আদীন ঐ শূন্য
যেই হারানোর ছায়িত দুখ শোনে ;

মোহর-হারানো ম্লান মাবিক-সন্ধ্যা
পৃথির ছড়ির হিসেব-মিকেশে মত্ত
রাত্রির কেন্দ্রেছে সাবলীল চিত্ত-পত্র
'সময় আকাশ বিস্তৃত বাসনা।

হত্যাই ভালোবাসে অন্তমন

—বীরেন্দ্র নারায়ণ রায়
দ্বিতীয় বর্ষ। বাংলা।

অবশ্য আমাকে আজও থাকে আশা তার ঘরে
তার অন্তর গাঢ়ের অনাবৃত আদিম আবেগে
বহুল আদরে লিপ্ত সৌরভ প্লাবিত করে প্রান্তরে প্রান্তরে
নিয়ত পাওয়ার খেলা করে মুক্ত বাতাস।

অজস্রের মধ্য দিয়া হয়। উদ্ভাস অনুপা - কোথাও দুরিপাকের
ইতস্ততঃ ছড়ানো, ধানের আবেগের মে মেয়ে দর্পণ;
অজস্রের মিষ্ট জল কল মুল—সবই জননীর পরম আশ্বাস
ফিরে যেতে মন চায়—এই পল্লবেও—পাখি যদি পক্ষীরাজে ফিরে বিলকুল।

আমাদের বক্ষের গভীর—গভীরে মৃত্যু থাকবে এক চিরকাল।
আদিম জীবনে অভিশাপ সমাজ মৃত্যু হত্যা উল্লাস বৃত্তা;
অন্তর মধ্যে আলো লাল ধরে আসে মেঘাদের জলও লাল আর লাল;
'অন্ত আমাদের চিরকালের থাকুক' প্রত্যয়ে অবিচল ক্ষুদ্রের মুখ।

অজস্রের ভাব তুমি মুক্তাধার ধারের অন্তর—
নিয়ত ডেকে যায় মুখর অ মু-ব-অ-ম-মন,
দাবা দিতে চায় এত মন—অভিন্ন সত্তা হতে চায় অন্তর।
স্নেহেরু হৃদয়ের ঘরে এ মৌবিন সভাতা—হত্যাই ভালো বাসে অন্তমন।

বুকের সিংহাসনে রাজাধিরাজ করো

—রাজশেখর গিরি
দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা)

প্রিয়তমা হে আর একবার এবং হয় তো শেষবার
বুকের সিংহাসনে রাজাধিরাজ করো।

চারাচোরা লোকজনেরা
যাবে যাবে ভুল ধারণায় ধিক্কার :
যখন সন্ধ্যা হবে সন্ধ্যা
সকাল হবে সকাল
আকাশ, নক্ষত্রে সাজাই আর যাবে
প্রিয়তমা হে আর একবার এবং হয় তো শেষবার
বুকের সিংহাসনে রাজাধিরাজ করো।

বিচারের প্রহসন আমরা সহ্য করবে বলো
এবার আমিই করবো বিচার
মৃত্যুদণ্ডে শিক্ষার ঘরে
বুক চুরিয়ে বসবো সিংহাসনে
করেক ফোঁটা রক্ত হলেও
বীণাক্ষরে দেবো
হাসিতে ফুটবানো ঘরে আলো।
চৌমাথার ল্যাম্প পোস্টে ঝুলবে
মৃত্যুদণ্ডে বিকৃত মৃতদেহ
অন্যায় দোষ সাহস দিয়ে পাবে
ঘরে বাসা ছেড়ে চলে আসবে পোস্টের তলায়
ভাইরাসে কেউ পড়বে
কারার মুখী, ছুঁইও চাষাকীড়া,
মানব প্রেমে উদ্ভাসে
কি যে করবে বোঝাতে পারছি না…

প্রিয়তমা হে আর একবার এবং হয় তো শেষবার
বুকের সিংহাসনে রাজাধিরাজ করো।

আগুন ঝ'লসে উঠেছে

শ্রীকার্ত্তিক সেনগুপ্ত এম. এ. (৩য় বর্ষ)
(ঐতিহাসিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)

আগুন ঝ'লসে উঠেছে আমার বুকে
দুঃখ-বাদলির নিবিড় বেলা হবে,
ঐটুক প্রেম শুধু রেখে যাও মুখে
আমৃত্যুই মোর ঈশানে ধ্রুবতারে।

শ্মশানে মৃত্যু হাসাহাসি মাখে কেন ?
আঁকিয়ো শুধুই কলোম্বসের প্রায় ;—
দেখো হাসি হাসে প্রিয়তম নামী যেন,
যেহায় ভূত ঝ'লসে যাওয়াতে যায়।

যৌন যুবে যেন আমারে ভুলনা আমি
সাগরিক ভয় - ভুলেরে ভুলা ভেটে ?
সোনালীর দুখ যদুরে আলো আমি
বেলা চলে গেছে বেদের বেলাদী ভেটে।

বিবিধ হিয়ের পরিচয় আজ আলো
চেতনায় ছিঁড়ে—অমাতির অবগুণ্ঠন—
এখানে মৃত্যু হয়ে ওঠে লীন আলো
আহত হৃদয় কেঁপে ওঠে কেন মানে ?

আজ ঝ'লসে উঠেছে আমার বুকে
দুঃখ-বাদলির নিবিড়-বেলা হবে —
ঐ শিয়রে হও যে সুখে নয় সুখে,
মরণ এখানে জীবনের যৌন বোধে।

গাড়ির ভিতর

—হরিপদ ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা)

গাড়ির জানালা খুলে দাও, অতি
আমি এক প্রলয়ের পৃথিবীর বাসিন্দা হব :
আমি এক প্রলয় পৃথিবীর বুকের উষ্ণ
তোমার বুকের উষ্ণ তোমার হাসিটা খুঁজে নেব।

বন্ধ জানালা,
বন্ধ গাড়ির ভিতর অন্ধকার থাকা
আমাকে প্রায় ভয়ে প্রায় ভয়ে গাড়ির ভিতর
থাকলে মন যেমন শান্ত হয় : জানালা খুলে
দেখা যাবে, গাড়ির ভিতর আমার পৃথিবী এসে গেছে।

ইঞ্জিনের গাড়ি এলে,
গাড়ির ভিতর বিভিন্ন শব্দ ওর নেই, মানুষেরা
কথা বলে, মানুষের ছলে ছেড়ে ছেড়ে যোগাযোগ
অকপট রহী হয়, গলি বহে,
বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

অতি, আমি
জানালাটির ধারে তোমার ধারে আমার যৌবন রেখে যাব
তোমার চোখে, অতি, যৌবনছায়া রেখে যাব।

নিখোঁজ

—অরুণ মিত্রিক
প্রথম বর্ষ (বাংলা)

অনায়াসে হারিয়ে আছি মাসের পরে মাস
অগুন্তি দিন পথ চেয়েছি কেউ করেনি খোঁজ,
নিখোঁজ আছি মাসল মাঝার ঘরে খাঁচা বিনা
পরং কিম্বা ভাতন আমার হয়তো কাছাকাছি।

ক্যালেন্ডারে পৃষ্ঠা ওঠে আসা যে তার লাল
মনের মাঝার কাছেই আছে ভারে নয় নয়,
অনায়াস্য ক্যালেন্ডারের শেষ পাতারো ফোঁস
মিস বুঝিনি মাসের মাঝ তাহার মনের জলে।

যখন শ্রীশা উৎসব দব আভিজাত্য পূর্ব
'ভ' আমী তোমার উৎসব ছিঃ ভোলানা আমার,
অগুন্তি দিন পেছে আছি, তাহার কিম্বা জলে
অনায়াস্যে হারাবাছি মাসের পরে মাস।

দেখার মুখ মুখস্থানী দেখা সর্ব সুখ
তোমা বুঝিয়ে সর্ব নয়ন এত মিশেছে মেশি
অনায়াস্যে হারিয়ে আছি অনেকদিন হতে
হয়ত তুমি) লাগ তোমা তোমারও নিখোঁজ ?

"প্রতিশ্রুতি"

দিলীপ চন্দ্র চক্রবর্তী
বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান (—ম বর্ষ)

অতীতে
তোমার সাথে ভাব ছিল খলার খলার,
সম্প্রতি
বিচ্ছেদের ব্যথা শুনি দু বেলা।
সারি সারি শবদেহ কাঁধে নিয়ে
একদল লোক প্রত্যহ হাজিরা দেয়।
মহাশ্মশান অথবা কেওড়াতলায়,
কোন কোন প্রাণী
অথবা বাদুড়
বড় জোর হাড়-পা নাড়ে অবশ্যই,
হায় রাজরাজি হাতের আওয়াজে ছিপ যায়।

তোমাদের মাটির দেবে
বন্দিনী কলকাতুরিয়া
গান ভাসে, গান ভাসে।
আমার
মর্মবিদ্ধ যন্ত্রণায় খোলস ছেড়ে
তোমায় বরণডালা পরাবো,
যেদিন ·
মৃত মানুষগুলি
উঠে জাগবে—জাগবে।

অনুজ্জ্বল বাতিঘরে তোমাদের শরীরের ছবি

শিবাজী গুপ্ত

স্বরচিত আজকে ফিরে যাবার আগে পায়ের কাছে দাপাদিপাল
নীলজ্যোৎস্না অন্ধকারে লুটিয়ে বলে ভালবাসার পদাবলী।
চলনের গন্ধ ছুঁয়ে যে সব মুহূর্তে খোলা দিয়েছিল আমাই
স্নেহমায়ের সব মুখরিত হাসি উপহার দেব পুরস্কার সুখে।
আমি যাতাসে চোখের এক বলে যায় যেমন হয়
চিঠিরা বলল। আমাদাড়ি ঘরের ঘোড়াহাসা, বন্ধি
দর্পণ, সাধীতিক প্রতিমার সঙ্গের সকল মেয়
পুরাণ প্রাণাহে সকল বাদুকর বহুকাল ফেরে চলে গেছে।
মনের সঙ্গের কবরাজি, সঙ্গে সঙ্গে আজনের বাজনা
এসবই সরল নিয়োবলী অর্থাৎ এদারের স্বরলিপি
জেগা হয় নক্ষত্রে নক্ষত্রে। দুঃখের গভীরে পারাবত
উড়ে যেতে একবার দুজোমুখি নক্ষীরজন,
অমিত জ্যোৎস্না তীক্ষ্ণতম চোখ, বন্ধুজনের চিঠি।
বিষাদে, বিরহের মধুতোক্তি ঝরে যায় স্বরণীয় নাবিক,
অন্ধকারে বুঝি ফেরে তার কণ্ঠস্বরে আবারো সেই
ভালবাসার পদাবলী। বিজয়ন্তলের সঙ্গী ভবে একলা হাটে না।
স্বরচিত আজকে ফিরে যাবার আগে পায়ের কাছে
দাপাবিড়াল নীলজ্যোৎস্না আর আমার উচ্চারণ
অনুজ্জ্বল বাতিঘরে পড়ে আছে তোমাদের শরীরের ছবি।

॥ প্রয়োজন সংকার ॥

সোমনাথ কে

সারল প্রাণের সুর বাঁশিতায় যেখানে পাখী উড়ে যায়
জীর্ণ মানসিকতা বিশীর্ণ বাতে ভেতের ঘর কাঁপে
যার ভয়ে বাংলার বেখানে মানুষ ভুলে যায়
নিজে ভৌগোলিক তারে হক চুমে যায়।

সমুখে সাজার যাচ, চারিদিক পায় বিজয়রা
ঘোলাটে জলের ওপর ভাসে বহুরি পাতা
পাদনের জল নেই, বৃহবধূ জল ভরে তারই
বাঁশের ভাঙ্গ ছেলে মশারা আসে ঘর ভরা

যার যার হারানো মন, সবে আসে প্রবল জল
অন্তরার মন, চোখে ঘুমে চলা পথ থেকে ফেরে
বিজয়ের সাধনা আলোজনে চুমন নিতে চায়
চুনিকেরা পথে পড়ে থাকে, উদার বিকল।

ঘরে ফেলে দেয়া যায় ভরে আসে সব পরিবার
চুমতে চাবিটি এটি, সেটি নিয়ে বিল, মৃত প্রায়
বাংলা দেশে ভরি ঘরে, প্রাণহীন মৃতদেহগুলি
মশান প্রতীক্ষায় আছে—প্রয়োজন সংকার।

জনৈক বুদ্ধিবাদী বন্ধুর প্রতি

সিলভিয়া প্লাথ
(১৯ বছর - বাংলা)

যৌবনাশ্ব !
আমি আলোর ফুলের কাছাকাছি এসে গেছি।
পাখনা বিস্তারে তোমারও অসহ্য লাগে।
আমি বাতাসে ঘুরে ঘুরিহীন
এখনো অনেক বাকি সবকিছু জানতে ও চিনতে,
আমার সন্ধানে হয় ফাঁস নিয়ে
তার শরীর আমি আকাশে ঝুলিয়ে রোদে।
ওপর থেকে বীজের নিচে ছাড়াই
ভবিষ্যৎ হয় প্রেমে আঁটা লক্ষ লক্ষ টুকরো টুকরো মৃত্যু,
পাতা ঝরানোর ঋতু, তবি যাচ্ছে মরো বনস্পতি,
তার বয় লোহাইয়ের ঘাড়ে
ছুটছে ঘূর্ণির চাকা।
আমি শক্তিতে কিছু কম
অনুভূতিতে বড় বেশী,
আমার বানবিকতাকে ভাসিয়ে তোল
আরো উঁচুতে উঁচুতে যাই
যেখানে ঝুলিও আমার নাগাল পাবেনা।
মাথার ওপর অনন্ত নীল নক্ষত্র
দূর লোক উপর গতের মতো
তখন দাখো কি আমায় খুঁজে পাও।

'রাজা'

(যখন কিছো বেতা মাটির পুতুল কিংবা ফসলে)

তপন শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
(এম এস—মাথিমাবিজ্ঞান)

মুকুটহীন রাজা
তুমি সারা জীবন
পরিশ্রমে মাথাটা কেশ খানি নিচে
এখন তোমার বিশ্রামের সময়,
এবং তাই এখন থেকে নিশ্চয়ই
তোমার—ঐতিহ্যিক খেলের ঘর
কিউবাং খাঁচা খেয়ের গলে
নিসর্গের মাতৃদের ছায়ায়
মাতৃপালোর ঘনিষ্ঠ মোহাবরে
তোমার নিয়োগের পরার কথাই খুব ব্যস্ত থাকবে।

• • • •

'যার প্রাণের আমন্ত্রণ পুড়িয়ে ফেলে'
আজ আমার পথ হেরিয়েছিলে
তুমিই প্রথম।
যদিও তোমার গায়ের রং ছিল কালো
এবং তুমি তোমার অবকাশিত
মুখমণ্ডল ঢাকিতে মহান
কারণ সেই সাদা মানুষটা তোমাকে
(যে তোমাকে খুন করেছিল)
আনুমানিক ঘন্টে ছোট একটা ঘণি
একটা মানুষকে খুন করার চেয়ে
বেশী কিছু করতে পারেনা।

প্রেম ইত্যাদি কয়েকটি বোধ

বিশাই পাল

(এম. এ., ১ম বর্ষ – বাংলা)

১. শহুর প্রেম

আমাকে এখন ঘরে ফিরতে হবে — আজ — কাল — পরশু —
শহুরের দূরে তাদের তলায় উদর ইচ্ছায়।
মনেও উঁকি মারে অজানার বেদনার শরণাবে
বেদনা,
মনের প্রজার গহ্বরে সব ফুরিয়েছে — ফুরোচ্ছে — ফুরোবেও —
উঁ ॥ আমার জীবন প্রাণের ঘাম শহুরের বাতাসে শুকোই,
বন্দিত মাসের বুক জমা করে।
অন্তরালি নীল জিজ্ঞাসার মাঝে ঘুরে ঘুরে
শত শহুর হারবার উঁকি উঁকি
প্রাণ দুটি পাখা মিলে
ঐক্য ভালোবেসে মাতৃত্বালের এক্যতানে তবে গানের মাঝার হবে।
শহুরের শক্ত ঠোঁট আজ শক্ত একটুও নেই —
বিলাসার নৈঃশব্দে উঁকি উঁকি দারা দিন
কৃপন বাতাসের বিষম দেখে বুক ফেটে যায়
তবুও এক টুকরো পাবে বাওয়া দুর্গন্ধ অথচ সুবাদু মাংস চাই
আমার জীবনের দুর্দিন জিজ্ঞাসার শহুরের মত।
প্রিয়তম,
তোমার শহুরের পাকস্থলিতে একদিন ঘুঘুর আক্রান্তিক হবে
এই প্রেম।
তাদের অরণ্যতায় আমাকে হবে
এবং রবির বিষাদে তোমারি মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসবে
দ্বিতীয় পৃথিবীর অধিবাসীর মতো……
এবং আমি তার চৌদ্দ পুরুষের প্রেমিক
এবং তুমি ষোড়শী প্রেমিকা – শহুরের উপবাস কঠিন দেবে
আজ তার মুখের আদর্শ নরম গালকে ঘুণ ধরে
মরণের অনন্ত ঘুম……
নিয়ে যৌবনক্রিয় বৈদ্যুতিক সমাহারে
তুমি…… আমি……আজ……কাল……পরশু……

১. বীভৎস

তোমার বুকের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে
আমার ক্লেদের রক্তপদ্ম ফোটে।
তোমার বুকের এক জনক মণির বিষাদে
মরমের গলিত ক্ষতের বীভৎস সৌরভে
আমি লবণাক্তের মেয়ে সুন্দর মাছের।
ঘুমায় হিম হিম সৌন্দর্যে
কেবলি বিকার, বিকৃত পৃথিবীটা তত মধুর।
তুমি আমি বিপ্রতীপ বৃত্তীয় ব্যাসার্ধ
কেবল,
অপ্রাণ মনের সহিল সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি পরিচিত
আমরা সবটুকু আমাদের বিবর্জিয়া হয়ে যাব
তোমার সব প্রতিশ্রুতি ছন্ন বোরের অনাবৃত পরিধানে অবশ।
এবং তুমিও —
অমিল বিবর্জিয়ায় এ এক অদ্ভুত আমের জীবন,
অবাধে মরীয়া জীবনের রঙ, আশ্চর্য তীব্র ও উজ্জ্বল।
নেতিবাচক প্রশস্তিতে তোমার-আমার খুব মনিষ্ঠ আত্মীয় :
আমরা কেবল মৃত এতদিন ধরে কেবল ছায়াদের বসি —
তাই বুকে নিয়ে আমরা অভিপ্রায়ে মাটির এক সরল সমুদ্রতা :
সব বোধ ঝরে করে যায় — নতুনের পুষ্টি হয় তেমনি।
এবং নতুনের মণিষ্ঠ উচ্চিত্যবাদে অধির ঝরে ঝরে
অধিবীয় মৃত মণিচির অন্তর এমনি এক আশ্চর্য ছন্ন মেয়ে বা কি
— সেই আর এক জীবন — পৃথিবী?

২. আকাশের গল্প এবং

আকাশটা — নির্জন নৈরাজ্য — ভাষা — নিরর্থক —
মূকাটা, নীরবটা, মৃত অন্ত-অস্থি,
তাই বা বীভৎস, অক্ষয়, এবং বিকৃত :
আমি জন্মছি : এবং তুমিও। পাই অন্তরের অন্তর যায় :
বোধ? অথবা বিশ্বাস? অথবা অনাস্থা?
মৃত উত্তর! আশ্চর্য প্রশ্ন! আশ্চর্য উত্তর!
নির্মূল প্রক্রিয়া। বাপের পর বাপ। কেবলি বিকৃত বোধের অপাংক্তেয়।

নয়নসখীর শমরু-লালী অথবা অলৌকিক

— প্রণয় সূত্র
(প্রথম খণ্ড—বাংলা)

গ্রামের নাম 'নয়নসখী'।

আমি যখন গ্রামে এসে পৌঁছোলাম তখনো সন্ধ্যে হয়নি।

বাজার হাটতে হাটতে দেখলাম আর আর আকাশ মিশ কেঁদুল বস্তুটি নাক্কেলের গাছে গাছে প্রায়ই ঝুলে আছে। এখানে ওখানে ঘর দেখলাম, মাঠ, বাগান, বসুধা, ফোয়া, পুকুর ধারে ছোট ছুটি দোকান, স্কুল বাড়ি দেখলাম, তারা মন্দির, জলা, হিজল ফোয়া, কোথাও একটা উঁচু ঢিবির আকাশের, গাছের তলায় শিব কিংবা বট ঠাকুর, খেজুর গাছ হাড়ি বাঁধা হয়েছে, পুকুরের অনুবিধানের কাঁকে কাঁকে ঘোরের পরম বিস্মিত অবগাহনের দৃশ্য, আর সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল আমি আমার ফলিপুরের সেই পুরোনো মানুষদের কিরে এসেছি। পৌষের বৃষ্টি, গ্রাম দুইতে বয়ে পুরোনোর সেই বিরল আবহ, একবার মৌসুমের এক টুকরো আকাশের ওপর রাখলে ছবি বানিয়ে দিতে মনে হয়, কেউ কিছে আসে না, তারো পুরোনো দিন বাদির অতল থেকে ধীরে টুকরো তুলে আনার পক্ষটাকে আবিষ্কার করতে পারে না, চলতে চলতেই থামতে হয়, থেমে থেমেই আবার চলা শুরু করতে হয়।

দু একটা সাইকেল কিন্তা চলছিলো।

আমি 'নয়নসখীর' বাজার হাটতে হাটতে কাজ খুঁজি, তার বাসস্থানিকের ঘর পাচ্ছিলাম। বলতেই উঠবে। ছবিটির ভাব বুঝতে পারছিলাম। বড় বিশ্ব বলল শোনাচ্ছিল ছবিটির ভাব। ছবিটির কথা বলার আমি পথ হাটছিলাম। রাস্তার ধারে একটা ছোট মিষ্টির দোকান। দোকানের সামনে একটা বাতাবি লেবুর গাছ। তার নীচে মিশন টাওয়ারো। মিশনের নীচে একটা বেঞ্চ পাতা। পথের দিকে একটা কাজের কুলছে। সামনে ছোট সাইনবোর্ড—"বন্ধুক 'ছিটার ব্যাগার।" মিশনের কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ চশমাক বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের মাথায় চুল প্রায় নেই। আঙুলগুলো কলাইয়ের মতো মোটা মোটা —"বসুন, বাবু বসুন, কি খাবেন বলুন, কিরের গলা, নবরসচিকা, বরফোলা, বাজবোল বলুন কি খাবেন বলুন।'

'খোটা দুধের বাজবোল দিন' বলে আমি বেঞ্চটার ওপরে এসে বসলাম। ভদ্রলোক আমার সামনে টুলটার ওপরে বসে বললেন—'দেখে মনে হচ্ছে বোলপাড়া থেকে আসছেন।'

'বলছেন—ঠিক।'

'আবছায়। তোমরাবার মানুষ আর দেখলেই চেনা যায়।'

বললাম- 'আচ্ছা শিবের বাপন মন্দির এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন—'তা মাইলখানিকের রাস্তা হবে। রিক্সায় যেতে পারেন। একটাকা নেবে। তবে সন্ধ্যে নামছে। আজ আর যাবেন না, কাল সকালে গিয়ে যাওয়াই ভালো। প্রায় জঙ্গলের ভেতর দিয়া। দাপ টাপের উপদ্রব তেমন একটা কিছু নেই তবু দিনের আলো থাকতে থাকতেই যাওয়া ভালো। আপনারা সহরের ছেলে, সকল জঙ্গলে-টঙ্গলে অভ্যেস, তোমার অভ্যেস তো নেই।'

'ঠিক আছে আপনার কথামতই যাওয়া যাবে। কিন্তু আজকের রাতটা কোথায় থাকি বলুন তো।'

'আমার একখানা ঘর খালি পড়ে আছে ওটায়

থাকতে পারেন, অবিশ্যি খুব কষ্ট হবে। তাল ডাক্তির মশা কামড়ানো আলাদা ব্যাপার। রাতবাদুড়ের বাড়ি ছেড়ে অবিশ্যি তাদের থাকতে পারবেন। বড় বড় ঘর সব তালা পড়ে আছে। কিন্তু একটা কথা, আর যেখানেই যান, ঐ পশ্চিম বাড়িতে যাবেন না।'

'পশ্চিম কে?'

'পশ্চিম দিকে দূরে ঐ যে বাগান দেখছেন ওটা নীল হোসুদের বাগান। ঐ বাগান পেরুলে শুরু হয়েছে রহীম বক্সীর এলাকা। ওখানে ছোটদের গায়ে একটা বিরাট বাড়ি আছে। বহু পুরোনো আমলের ভাঙা ভূতুড়ে বাড়ি। ওখানে পঞ্চক বলে এক রহস্যময়ী থাকেন। পঞ্চক অবিশ্যি একলা থাকে না, ওদের অনেক লিজের চাকুর নৌকরও এটাচড থাকে।'

আমি বললাম—'তাতে হয়েছেটা কি?'

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন—'ওহেই তো শেষ নয় মশাই।' তারপর খাটে মুখ নাড়িয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন—'প্রায়ই গভীররাত্রে ঘরে ও বাড়িতে একটা ভূতুড়ের কান্না শোনা যায়। বাড়িতে ভূত আছে।'

ভূতের কথা শুনে আমার পুলক জাগলো। পৃথিবীতে দুটি বস্তুতে আমি বিশ্বাস বিশ্বাসী নই ভূত এবং ঈশ্বর। কোলকাতায় যাইয়ে যব গ্রামে যব অঞ্চলের মাঝিরে যব দুর্গম বন জঙ্গল পেরিয়ে এসেছি আমি অনুমান হাতে একটা টর্চ নিয়ে। ভূতের কথা শুনে আমার কৌতূহল বিগুণ বেড়ে গেল।

আমি বললাম—'আমি তাহলে পঞ্চক বাড়িতে ভূতের সাথেই রাতটা কাটিয়ে আসি।' ভদ্রলোক আমার পাশ থেকে সরে বসলেন। বললেন—'যারা যাবেন মশাই। আপনার বেয়াড়ি আজা যৌবন। অকালে প্রাণটা খোয়াবেন। কেন মিছিমিছি বাপ্ মাকে কষ্ট দেবেন?'

'বাপ্ মা কেউ কোন জিন্দাবাদে আমার নেই। আমি যখনে চোখের জল ফেলার জন্য ছাড়া করে লোক আসবে হবে।

প্রচুর উৎসাহে আমি ভূতটার আসার বেশ কটা ভদ্রলোক থেকে নাম ঠিকানা পশ্চিমদিকে নীল হোসুদের বাগানের পথ ধরলাম। সন্ধ্যের অন্ধকারে বুঝতে পারছিলাম নীল বাগানের খুব বড় বড় কয়েকটা গাছের ডাল হোসুদ হোসুদ ফুলে ভরে আছে। টর্চের আলো ফেলে নীল ফুলের ফুল খোঁজার চেষ্টা করলাম। পেলাম না। হঠাৎ কি খেয়াল হোলো ফুটো ঘর বাকড়া মাথা ফুলগুলি গাছের উঁচু ডালে টর্চের আলো ফেললাম। বিচিত্র সুরে অনেকগুলি পাখি উড়ে পালাল। পাখিগুলো উড়ে পালানোর পর একটু মায়া হোলো। এত লম্বা হাঁটতে হাঁটতে এসে আমি নবনন্দীর রহীম বক্সীর বাড়ীটা যেখানে শুরু সেখানে এসে দাঁড়ালাম। রহীমের বুড়োরা তখন উঠোনে আলোয় চৌচাল করছে। পাশে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। সামনে একটা বিরাট লোহার গেট। গেটের দুপাশে দুটো পেরুপাথরের থাম। গেটটা খোলাই ছিলো। আমি ঢুকলাম। সামনে অনেক খোলামাঠ। খোলামাঠের মধ্যে একটা পাথরের রাস্তা। একটা লম্বা রাস্তা। রাস্তাটুকুতে রঙীন পাথর ছড়ানো রয়েছে। দু একটা পাথর আমি হাতে তুলে দেখছিলাম সাধারণ পাথরের চেয়ে কিছু ভারের। দুপাশে কিছু ফুলের গাছ। মিষ্টি ফুলের তীব্র গন্ধ আসছে। সেই গাছের ডালে বেলা পরী, হরিণ, বহু, মোরগ। আমি একটা বৃহৎ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজার কাঠের কারুকার্যটার ওপর দিয়ে মোমের কোনো পাখনা উড়ে গেলো। টাটাং টাটাং করে কারুকার্যটা ফুলে উঠলো।

বর্তন হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এক বৃদ্ধ। তাঁরটা ফুরে পড়েছে, চামড়ায় কুঁচি কুঁচি, মাথার সবগুলি চুলের মতো পাকা সাদা সোনালী চুল ঝলমল করে উঠছে। আমার ভূতের সামনে সেলামটা ফুলে ধরে বললো—'কাকে চাই।'

বললাম—'আমি কোলকাতা থেকে আসছি। আজ রাত্রিটা এখানে থাকতে চাই।'

'এ বাড়িতে থাকবেন' বৃদ্ধ বীভিমতো বিস্ময়ে কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ।'

'ভূতে বিশ্বাস করেন?'

'না।'

'ঘরের লোক অবশ্যি এ বাড়িতে খুব আছে।'

'বলেছিলো।'

'থাকতে পারবেন? না কি রাত্রির দুঃস্বপ্নের কান্না শুনে ভাগা যাবেন।'

'আমেন আমি একবার তিন বছরের বাচ্চা ছেলে এখানে বাঁচে পড়ে গিয়েছিলাম। চার মোড় কিছু ভেবেছিলো। শেষ পর্যন্ত মরিনি। ওটাই আমার ভাগ্যে লাই চান্স ছিলো।'

'ঠিক আছে। বাদুন আসেলো। আসুন এদিকে আসুন আপনার ঘরটা দেখিয়ে দি।'

'আপনার নামই কি নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়?'

'হ্যাঁ।'

আমি আমার ঘরটা দেখে এসে বললাম, 'পঞ্চমদা বলে কি একটু দেখা করা যাবে?' নীলকণ্ঠ আমাকে লাল টকটকে ঝালটি মোড়ানো মিষ্টি বেলে খেতে দিয়ে এলো। বেলায় বারান্দায় আড্ডা জমে উঠছে। ছেলেরা যার যার ঘরে পুরুষ মহিলারা ড্রয়িংরুমে। ছবির গলায় ফুলের মালা। খোলাপী শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পঞ্চমদা ঘর ঢুকলাম। নীলকণ্ঠ পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেল। পঞ্চম 'আপনি আছে সুখে' পড়ছিলো। বইটা বিরাট টেবিলটায় ওপর নামিয়ে আমাকে বসতে বলল। আমি পঞ্চমকে দেখেই বিরাট চমকে উঠেছিলাম। গল্প উপন্যাসে এতকাল যাদের কথা পড়েছি। বিশ্বাস করিনি। আমার মনে হোতো যেসব সব বড়লোক মোড়ায় চড়েই এসব কথা লেখেন। জীবনে আমি তো কখ দেখে দেখিনি। কিন্তু যাই হয় উপন্যাসের বর্ণনার সঙ্গে তো তাদের কোথাও কোনো মিল নেই। অন্ত আজ আমার সামনে আমি .যে সেই দুঃখবাদিনী অসহ্য যৌবনা যাদের নয়, বড়লা নয়, বহু নয়, সুন্দরী ছবনী কিংবা রোগী অপূর্ব সোনালী কেশবাসিনী ঈশ্বিতাকে দেখলাম। অবশ্যি আমার মনেও চিত্র আছড়ানো হোলো। আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন নেচে উঠলো। আমি হাত তুলে নমস্কার করার আগেই পঞ্চম তার হাত দুটোকে পদ্মফুলের মতো জোড় করে আমাকে নমস্কার করছিলো।

আমিই প্রথম কথা বললাম 'এটা কি আপনার বাড়ি?'

পঞ্চম জবাব দিলো 'হ্যাঁ'।

আমরা দুজনেই পাঁচাক সময় চুপ করে বসেছিলাম। পঞ্চম সেই সাময়িক নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলো—'আপনি কি এখানে রাত্রির থাকতে চান?'

'কি করে বুঝলেন?'

'তা না হোলে এখানে আপনি আসবেন কেন? কিন্তু আপনি তো রাত্রির থাকতে পারবেন না'?

'কেন?'

'জানছি এ বাড়িতে প্রায় রাত্রিতেই বাকি একটা দুঃখের কান্না শোনা যায়।'

'আপনি শুনেছেন কখনো?'

'না। আমি ছাড়া আর সবাই শুনেছে। নীলকণ্ঠও শুনেছে। অবিশ্যি আপনি যদি থাকতে সাহস পান, এখানে থাকার আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। নীলকণ্ঠ আপনার খাবার দিয়ে আসবে। তবে সম্পূর্ণ নিজস্ব দায়িত্ব।'

আমি ঘরের চারদিক তাকালাম। বেলায় বেয়ের একটা ছোপানী ছেঁড়া ঝাঁকানো ঠাকুর মতো একটা দুঃখের খাট। দুঃখটার লম্বা কিংবা কি ভয়ঙ্কর ভাবে ঝুলছুল করছে। পঞ্চম বলল—'খাটটা আমার মোলা। আমার খুব প্রিয় ছিলো। ওর নাম লালী।'

বেলায় ঘরে আর কোনো খাট নেই। শুধু আলমারি ঠাসা অসংখ্য অজস্র বই ঘরের চারপাশে একটা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মতো ঐতিহাসিক সৌন্দর্যে সোজা পাচ্ছে। কিন্তু এখন আমার মনের মতো পঞ্চমের দুঃখের লালীর খাটটা ছিল ঘরের মতো নিবিড় ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে এবং দুঃখের কান্না শোনার ব্যাপারটা আমার শরীরের কোথাও ছাঁ পাকিয়ে বেসেছে। আমি দুঃখের কান্নার সঙ্গে লালীর খাটটার একটা অতিপ্রাকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের অলৌকিক চেষ্টায় খাটটার কাছাকাছি এগিয়ে এলাম। কোন মোটরের কি নাম যেমন আমি জানিনা অর্থাৎ অস্টিন, ফ্লাইমাউথ এয়ুবাসাডার যেমন আমি চিনি না, তেমনি কোন্ দুঃখ কোন্ জাতের, কোনটা সিসি, কোন্‌টা

বিদেশী, তেমনি আমি জানি না। এ্যাংলোবিয়ান মানে একটা ইংরাজি শব্দ মনে পড়ছে। কিন্তু আমি এ্যাংলোবিয়ান চিনিনা। আমি পার্থী দেখলে বলে দিতে পারি কোন্ পাখির কি নাম, প্রায় সমস্ত বিদেশি ফুল এবং গাছও আমি চিনি, কিন্তু মানুষ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল কোনোদিন ছিলো না। নীলকণ্ঠ একটা ট্রেতে দুটো পেয়ালা আর কেটলি নিয়ে এলো। আমরা সারাদিন খেলাম।

শঙ্কর বলল—'যাক্ আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আর কিছু ভাবে পড়ুন। একটু বিশ্রাম হবে। রাত্রিরে নীলকণ্ঠ আপনার ঘরে খাবার দিয়ে আসবে।'

একতলার ঘরে ফিরে এসে আমি শঙ্করের কথা ভাবছিলাম। এই রাত্রিবেলা বাড়িটার চেহারাটা এরা ও রাতে কেমন করে? আমার কেমন মনে হলো সব কিছু আগলে খুব শান্ত সমর্থ নয়। কোথাও একটা ফোকর আছে। আর আর আমার সারাদিনের ক্লান্তির ওপরে ঠাণ্ডা বাতাসের বন্যাজন্তুদের মতো ঝিরঝিরিয়ে পড়ল। আমার চোখে কখন গভীর প্রশান্তির ঘুম নেমে এলো। রাত্রিরে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি সমুদ্রের তীরে একটা ফুলের প্রদর্শনী দেখতে গেছি। সেখি পীচ্ রঙের ছোট্ট ঘাসে একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে শঙ্কর আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মাথায় টুপি নেই। হাতে একটা ঝকঝকে তলোয়ার। ওকে ঘোড়ার পিঠের মতো দেখাচ্ছে। হঠাৎ স্বপ্নটা ভেঙে যেতেই আমার গলা শুকিয়ে এলো। আমি জলের জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। আর ঠিক তখনই সমস্ত বাড়ির দেয়ালের ইট পাথরের ভেতর থেকে যেন একটা ফুসফুসের কান্না গুমরে উঠলো। আমি অন্ধকার ঘরে একা দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি নাতো? প্রথম রাত্রির প্রত্যেকটি ভেতরে ভেতরে একটা ফুসফুসের খুব চাপা মেয়ে কান্না যেন কেউ কেটে টুকরো টুকরো করছে। থেমে থেমে রাত্রির গভীরে আসছে কিন্তু আমাটা ঠিক কোথেকে আসছে আমি বুঝতে পারছিলাম না। নাঃ আমি ভেবেই আছি। আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারিদিকে ঘরের মতো স্তব্ধ নিস্তব্ধতায় শান্ত। কোথাও কোনো বাতাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন তরঙ্গতা নেই। শুধু সেই ফুসফুস কান্না ক্রমশঃ বার বার তরঙ্গে ওপরে উঠছে। সেই দুঃখের কান্না।

পরদিন।

রাত তখন আটটা বাজে। বারান্দায় টবের টুকরো টুকরো আলো এসে পড়েছে। বারান্দার একটা ঘরের সামনে বাবার ঘরের মতো একটা ঘরনা। আম, জাম, নীম, বেতবন, হলুদ, দাদুর, তমলা ঘরের কাঁচের দরজাটার ওপর দিয়ে আলো এসে পড়েছে। আর আমার ছোটবেলার সেই আশ্চর্য ম্যাজিকলণ্ঠনের মতো লাগছিলো বরফের কাঁচের ওপর চড়ানো টবের আলো।

'আপনি বিয়ে করেন নি?' শঙ্করের প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেলো। ওকে এত রাত বাদতে আমি বিয়ে করতে যাবো কেন? বললাম—'না।'

'আমার অনেক কথা আছে। শুনবেন আপনি?' শঙ্কর গলাটা ঝিরঝিরে করে কেঁপে উঠলো। 'নিশ্চয়ই শুনবো।' আমি শঙ্করের আরো কাছাকাছি এগিয়ে এলাম।

শঙ্কর বলতে শুরু করলো—'আমাকে একরকম জোর করে বিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তখনকি বিয়ে করতে আমি রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আমি পত্নী বিয়ের পর ভালোবাসতে পারিনি। ও আমার কাছ থেকে একবিন্দু ভালোবাসা কোনোদিন পায়নি। ও আমাকে অনেক বলেছিলো শঙ্কর বিয়েটা যখন হয়েই গেছে তখন অতীতটাকে ভুলে থেকে চেষ্টা করো। মানুষের জীবনে অনেক ঘটনাই তো ঘটে। অনেক বিষয়ের সঙ্গেই তো সে পরিচিত হয়। তাই বলে কোনো পরিচয় কি কেউ অনন্তকালের জন্যে ধরে রাখতে পারে? তখন বলেছিলাম, শুধু তুমি ছাড়া আমার এরকম সম্পত্তির মালিক কেউ হবে না। কোনো আশঙ্কা নেই। তুমি আমি আর·····। তখন আমাকে টাকার বিনিময়ে কিনেছিলো। অথচ আমি তো এরকম মানুষ কোনোদিন চাইনি। আমি তো প্রচুর অর্থ, প্রচুর সম্পত্তি সোনা, হীরে, জহরৎ কোনোদিন চাই নি। আমার একটা সুন্দর

আকাঙ্ক্ষা ছিলো। আমি সেটা তো পূর্ণ করেছি না। কেন করেছি না? আমি তো একটা মানুষকে ভালোবেসেছিলাম। আমি তো ইটের খাঁচার ঘর চাই নি, আমি তো ফুলের ফুল চাই নি। সুবর্ণর মধ্যে যা কিছু সৌন্দর্যের অভাব ছিলো। আমি পুরুষকে চিরদিনই পুরুষ করে জেনে এসেছি। যেমন পুরুষকে আমি ঘৃণা করি যে পুরুষ তার চারপাশ মানুষ হতে চায়। আমার কাছে সে ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। সেখানে আমি পুরুষকে অক্ষয়, ধীর, অনন্ত, ঐশ্বর্যশালীর একটা ভাবধারী পশুর মতো মনে করি। আমি একে ভালোবাসতে পারিনি। সৌরাংশু যেন আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে আমাকে প্রতি মুহূর্তে সুখে দুঃখে স্পর্শে এমন ভাবে জড়িয়ে ছিলো, যে আমি আমার জীবনে সৌরাংশু ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পুরুষের স্থান স্বীকার করিনি, সেখানে দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব আমি মেনে নিতে পারি না।

আমার ঘরে যে মুহূর্তটার ঘটনা আছে, আপনাকেতো বলেছি তার নাম লালী। আমার খুব প্রিয় ছিলো। আমি অন্যান্য সময় সুবর্ণর সঙ্গে যত ব্যবহার আমি তোমরা তার চেয়ে বেশি সময় লালীর সঙ্গে ব্যয় করেছি। লালীকে ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলতো না। সুবর্ণ অনেক সময় লালীর দিকে একটা ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, আমি বুঝতাম ও লালীকে ঈর্ষা করে। আমার সময় অল্প বলে সৌরাংশু বাড়ী আসার দিনগুলো যেন ফুরে যেতো। তাকে নিয়ে আমার জীবনের যতো ছোট ছোট পাওয়ার কেনা জমিয়ে যে দিনগুলো পেয়েছি সেই দিনগুলোর কথা আমি মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারতাম না। কখনো কখনো সুবর্ণকে ভালোবাসার চেষ্টা যে করিনি তা না, কিন্তু আমি একা বুঝতাম আমার চেষ্টাটা শুধু চেষ্টাই। তার জন্যে আন্তরিকতার অভাব হয়তো ছিলো না কিন্তু আমাকে যে চেষ্টা করে ভালোবাসা যায় না সেটা আমি পরে অর্থে অর্থে উপলব্ধি করেছিলাম। আসলে লালীকে আমার বলতে কলতে আমি সৌরাংশুর কথা ভাবতাম। এক এক সময় আমি সুবর্ণর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতাম, এসে লালীকে নিয়ে বারান্দায় এসে বসতাম, জোছনায় কাছে চলে যেতাম, বাগানে বেড়াতাম। সুবর্ণ ভাবতো আমি লালীকে নিয়ে মাতি। আসলে লালীকে আমি তীব্র ভালোবাসার অনেক সময়ই একে ভালোবাসতে বসতে আমি সৌরাংশুকে ভালোবেসেছি। লালী আমার সঙ্গে থাকতো কিন্তু আসলে আমি নিজের মনের সঙ্গে একলা বেড়াতাম এবং সৌরাংশুর কথা একটা আকর্ষণ মুখস্থতি মহন করবার আমার নিজের নিজার। এক এক সময় নিজের পরিচয় আমার নিজেরই খুঁজে ফেলতে ইচ্ছে করতো। কারণ সুবর্ণকে অকারণে আমি বড় বেশি যন্ত্রণা দিয়েছি। আমি নিজেকে নিজে ঘৃণা করতাম। সুবর্ণকে আমি মুহূর্তের পাশি দেওয়া তো দূরের কথা একে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম। যে শাস্তি ওর প্রাপ্য ছিলো না। আমি ওর জীবনটাকে ঘুরিয়ে ওলট পালট করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এইসব থেকে নিজেকে সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত একে আমি সুখ দিতে পারিনি। একদিন বিকেলবেলায় প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় ছটফট, করতে করতে ও প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাক্তার এসে শুধু ইঞ্জেকশন দিলো। কিন্তু তিনদিন সুবর্ণ প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় শুয়েছিলো। সেই সময় একদিন সৌরাংশু এলো। আমি যেন হাতে আকাশের মতো একটা বাড়তি মুহূর্তে আকাশ ফুড়ে শ্রাবণের সজল বাতাস যেন দেখলাম। সুবর্ণ একেবারে অসুস্থ অবস্থায় শুয়েছিলো, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি। আমি একে সুস্থ করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কয়েক দিন একটা আমি ওর মাথার পাশে বসে একে সেবা করেছিলাম। সৌরাংশুও অনেক সাহায্য করেছিলো। সেদিন সত্যি সুবর্ণ যদি সুস্থ হয়ে উঠতো তাহলে হয়তো আমার আজকের দিনগুলো সোনা হীরা মুক্তায় ঝলমলিয়ে উঠতো। ততদিন সুবর্ণ অসুস্থ ছিলো লালী সারাক্ষণ ওর বিছানার পাশে মেঝেয় ওপর শুয়ে থাকতো। আমার মনে হতো লালীর চোখ দুটো জলে ভরে আছে। লালী সুবর্ণর অসুস্থতায় সেই দিনগুলোতে বোধ হয় একদিনও বারান্দায় এসে সূর্যের আলো দেখেনি। সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে ঘুরতে ঘর থেকে আপন মনে বেরিয়ে যেতো।

আমি যাবার থেকে দেখবার ও কোয়ার্টার যাবে দিয়ে ফেলে আসছে। এই সময় ও আমার কাছে একদম আসবে না।' একদিন ভোরে দুর্বল যাবে গেল। আমার সামনে প্রথাত দুর্বার ওপরে যেন একটা ঘোর অন্ধকার পর্দা এসে দুর্বাটাকে ঢেকে দিলো। সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকারে ভরে উঠলো। তেতে তেতে কোথায় কোন্ অতলান্তে থেকে একেবারে অন্তরের সাথে মাঝে মাঝে হঠাৎ একদিন আমার কানে সৌরাংশু কথা বলে উঠলো—'শুনছ, আমরা আবার নোতুন করে জীবন শুরু করবো।'

আমরা আবার নোতুন করে জীবন শুরু করবো।

একদিন সৌরাংশুর বুকের ওপর উপুড় হয়ে কেঁদেছিলাম বাথানে ঐ খোলাপাতার নীচে। আর সেইদিনই সমস্ত পৃথিবীর দুঃখগুলোর একটা পাহাড় আমার নিয়ে আমি যাবিত্রির ঘরে ফিরেছিলাম। সেদিনই ঠিক হয়েছিলো আমরা এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবো। কেউ জানতে পারবে না, গ্রামের কেউনা লোক একটুও খবর পাবে না। আর যাবোটার সময় সৌরাংশু আসবে। আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসবো। এসে কোথায় উঠে তখনও ঠিক হয়নি। বাপমাকে খাওয়াবো না। বাংলাদেশ ছেড়ে বহু দূরে কোথাও চলে যাবো। আমরা আবার নোতুন করে জীবন শুরু করবো। আমার রূপ ছিলো সেই রূপ যেন একদিন দুর্বল পরনের টাকায় দুলে আমাকে কিনেছিলো। দুর্বল যেদিন আমাকে দেখে পাগল হয়েছিলো সেদিন আমি ওকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে ফিরে করবেন না। আপনি আমাকে ফিরে করে সুখী হবেন না। কিন্তু দুর্বল পরনের টাকার জোর ছিলো। আমার ফিরে যা আর কারুর কাছ থেকে সে আমাকে টাকার দুলে, হীরে জহরতের দুলে কিনে নিয়েছিলো। কারুকে আমাইকার আমি আর সৌরাংশু এ বাড়ি ছেড়ে অন্ধকারে পালিয়ে যাবো। আমের ফিরে মালীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার চোখে জল ঝরে পড়েছিল তা পরীক্ষের ওপর। আর এই সময় আমি দেখলি দুর্বলের অন্ধকারের সময় থেকে দুর্বল যাবে যাবার পরও মালী যেমন যেন চুপ মেরে গেছে। ও যেন সব কথাই ভুলে গেছে। যেন ওর সেই জগৎ থেকে বিদেই সব কথার শক্তিও সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। এখন নিস্পৃহ উদাসীনতায় ও যাচ্ছিলো ঘরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিলো ও যেন নীরবের সমাধিতে গেছে পোড়াচ্ছে। পরদিন রাত্রিরে একটা ছোট সুটকেসে আমার প্রয়োজনীয় কয়েকটা কি কাপড় শাড়ী, ব্লাউজ কিছু গয়না নিয়ে আমি সৌরাংশুর জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ মালীর জন্যে ছোট ছোট কিশোরে আমি চমকে উঠলাম। ঘর থেকে জল বারান্দা পেরিয়ে এসে দেখি মালী সৌরাংশুর বুকের ওপর মাথিয়ে উঠে ওর মাথাটা কাছে ধরার চেষ্টা করছে। আমি অনেকবার ডাকলাম, মালী মালী, মালী। কিন্তু মালী একবারও আমার দিকে ফিরে তাকালো না। সে তখন সৌরাংশুর গলার মাংসের ওপর ওর ঠোঁট বসানো নিয়ে কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে। সৌরাংশু মালীর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছে তবে ওর সেই বলিষ্ঠ হাত দুটো দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া মালী যেন ওকে সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলেছে। সৌরাংশুর শরীরে কক্ষ ফাঁকে দেখে আমি ধরধর করে সমস্ত শরীরে কেঁপে উঠলাম। দেখলাম বারান্দার একফোঁটে সৌরাংশুকে মুটিয়ে ফেলে ওর সমস্ত শরীরটাকে ঘিরে মালী দুহাত ছড়িয়ে হাপাচ্ছে, সৌরাংশু গলার মুখে ধক্ ধক্ করছে, মালী একটা জন্তুর মতো হাপাচ্ছে। আমি তীব্র উত্তেজনায় কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না। আমি কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ঘর ছুটে রিভলভারটা বের করে নিয়ে এসে মালীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। মুহূর্তে মালী সৌরাংশুকে ছেড়ে ফেলেতে লুটিয়ে পড়লো। সেদিন নীলকণ্ঠ আমাদের গাড়ী করে সৌরাংশুকে কোলকাতার হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলো। আমি যে কেন সেদিন ওর সাথে কোলকাতায় যেতে পারিনি আজও তা বলতে পারবো না।

কোলকাতার হাসপাতালে সেই রাত্রিরেই সৌরাংশু মারা যায়। ডাক্তার নীলকণ্ঠ...' বিদায়ের ফোনের দূর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যেমন হয় আমিও তেমনি যেন একটা অন্ধ জগতের নানা ভাঁজার আকার বিস্তর

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। সমস্ত ধরায় 'আলো নীলকমল' শুনে আমি চমকে উঠলাম। এই প্রথম আমি সমস্ত মুখে আমার নাম শুনলাম। এবং সমস্ত আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে বিশ্বাস হোলো না। আমি সমস্ত মুখে আমার নাম শুনে রীতিমতো পুলকিত, উল্লসিত হলাম। "আলো নীলকমল দেখি সারা রাত্রি একা একা ঐ জোছনাটার মাঝে আমি অন্ধকারে বসেছিলাম। আমার ঝিলমহলের ওদিকে লালী ঘেমেছে দুটিয়ে পড়েছিল। চিঠিতে যত বেড়িয়ে এসেছিল। আমি একবারের জন্য চমকাই লালীর পাশে ফিরে এর মধ্যে যত কথার সামান্য চেষ্টাও করিনি। জোছনার মাঝে বসে আমি লালীর অমন নিষ্পাপ মায়া মুখের ওপরে উঁকি দিয়েছিলাম। লালী সারারাত্রির ক্লান্তায় কাতর হোয়ে ঘেমে ঘেমে উঠেছিলো। লালীর সেই মুখমণ্ডলের কমল ছায়া আমার বুকের মধ্যে এসে যেন পাখরের মতো জমে গিয়েছিলো। আমি খুব উঠার করতে চেয়েছিলাম। পারিনি। আমার চোখ থেকে একবিন্দু জল গড়িয়ে পড়েনি। সারারাত্রির যন্ত্রণায় ঘেমে ঘেমে লালী তার সমস্ত অভিশাপ চড়িয়ে দিয়ে গেছে আমার শরীরের রক্তের মধ্যে। যে রক্তের বিশ্বাস পরিবর্তনে আমি অংশগ্রহী ছিলাম আমি যে সেই বিশ্বাস অহংকারে থাকতে পারিনি। লালী দেখেছিল আমি সুবর্ণকে ভালোবাসতে পারিনি। আর তাই সুবর্ণর অহংকার বিকেলবেলে সে সুবর্ণর জন্য বিশেষ বিশেষ যেসব নিয়ে তার সমস্ত ক্রোধ জমিয়ে রেখেছিল একদিন সুবর্ণর প্রতিনিধি হোয়ে আমাদের ভালোবাসাকে ঘৃণা দিয়ে হত্যা করবে। এবং সত্যি তাদের সার্থক হয়েছিলো। আমাদের ভালোবাসাকে গলা টিপে হত্যা করতে গিয়ে লালী সোনাগুর গলা টিপে ধরেছিল তখন ঝিনুকবার। আর সেই ঝিনুকবার উপর আমার ঝিলমহলের গুলি এসে লেগেছিলো। ঘোরের আলোয় আমি দেখলাম লালীর প্রাণহীন দেহটা ঘেমেতে পড়ে আছে আর তার ঘড়িয়ে গায়ের পাশে রক্ত জমে আছে, রক্তের ওপরে মাছি এসে বসছে।' এরপর সমস্ত কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর বললো—টাঁদ আছে, নীলকমল তার হয়েছে। তার তুমি ঘুমোতে যাও।'

রাতে ঘেমে এসে আমার কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। আমি সমস্ত কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে গভীর রাত্রির লালীর জমন কথার শব্দের কথা মনে পড়ল। আমি বললাম ঐ কান্না ভবিষ্যৎ ভয়ংকার। লালীর কান্না। কিন্তু আলো প্রায়ই সে কান্না কেন এখানে শোনা যাবে? আমি কোনোদিন কোনো অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করিনি। ঠাকুরমার মুখের গল্পগুলো ছোটবেলায় আমার খুব প্রিয় ছিলো। এবং সবারই বাল্যকালের সবচেয়ে প্রিয়সঙ্গী ঠাকুরমা। ঠাকুরমার সেই অবিশ্বাস্য ভয়ং বালক কালে কার না ভাল লাগে? কিন্তু তারপর জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার অনেক সিঁড়ি পেরিয়ে এসে যৌবন ভরে বিশ্বাস ভরায়। এবং আমি জানি আমি পৃথিবীতে অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কিছু আমো বিশ্বাস করি না। ভয়ং হাতে ঘেমে ঘেমে যাওয়া আমার সহ্য হয় না। আলো হাতে ভয়ং কিংবা মানুষি দেখলে আমার বিশ্রাম হাসি পায়। কিন্তু আজ আমার সমস্ত বুকি পুরুষ পুরুষহীন হয়ে গেছে। আজ যেন কোন বুকি আমি আর মানতে পারছি না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করতে পারি যে সেই রহস্যময় আগের লালীর কান্না আজও এ বাড়িতে শোনা যায়। ভয়ংকার বাড়িতে আমি কিছু সেই কান্না শুনেছি। আমি জানবার ছেলের সাথে পুরুষের পার্থক্য একেবারে সহজ এবং আকাশের মতো। পুরুষ চিরদিনই আকাশের মতো উদার, বিরাট, সীমাহীন, অনন্ত। সমুদ্রের বুকে আকাশের মতো নারীর বুকে পুরুষ নিজের ছায়া ফেলে পুলকিত হয়। কিন্তু আমি কোনোদিন নিজেকে সেই পুরুষ আকাশের মতো ভাবতে পারিনি। আমি নিজেকে কোনোদিন, কোনো মানের মাটির মতো গভীর বুকে টানা ভাবতে পারিনি। আমি চিরদিন একা, নিঃসঙ্গ এক সত্তা, এক আকাশ এক ইচ্ছার পুরুষ। কিন্তু আজ সমস্ত পুরোনো বিশ্বাসগুলো চুরে দলিয়ে আমি সমস্ত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে আমার নীল পুরুষের নীলকমলের নীল আকাশের

ঢাকা হেলমেট চোখে ঢেকে ঢেকে অবশ্য খুব ভালোই দিয়েছি।

আমার ব্যালকনি থেকে দুজনের ঘরটা ওপরে ওপরে উঁকি দেয়। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ সন্ধের সেই ঘরটা বারবার ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসছে। এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে আমি খোলা দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। ঘুমের ভীষণ পাশ আসছে। আমি যেন ঘুমঘোর থেকে সন্ধেবেলা যে চমৎকার একটা ঘুম দিয়েছি তার সেই ঘুমের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

পরদিন ছিলো ছুটির দিন।

রাত বারোটা। আমি শঙ্করকে বললাম 'আজ রাত্তিরটা এই বারান্দায় শুতে যদি আমাকে অনুমতি দেন।'

'রাত্তিরে ঘুমুবে না?'

'ঘুম এলে ঘুমোবো।'

'মশারি খাটবে নাকি?'

'আজ পূর্ণিমা। এখানে বসে চাঁদ দেখবো। মনে হচ্ছে অনেকদিন যেন চাঁদ দেখিনি।'

'ঠিক আছে ঘুমোও।' শঙ্কর আর কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে যায়। একসময় ওর ঘরের আলোটা নিভে যেতে দেখলাম।

আমি বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছি। সম্পূর্ণ নতুন একটা রাস্তাকে দেখছিলাম। রাস্তার দুধারের সারি সারি গাছের ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে দূরে বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রাস্তার ওপর হালকা কুয়াশার মতো কিছু জমছে। গাছের পাতায় পাতায় চাঁদের আলো ঝলমলে রাস্তাটাকে গাঢ় নীলের মতো রহস্যময় করছে। সেই কারণেই হয়তো এখানে একটা ঐতিহাসিক আবহের খেলা যেন খেলে উঠেছে। মনে হচ্ছে এখন প্রায় রাত দুটো টোটাল। চারদিক চুপ হয়ে এসেছে। আমি যেন ইতিহাসের মতো দিগন্তে মিশে আছি। বারান্দায় ঝুলের ঝুলন্ত মতো আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আমি নিজেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম। এও কি সম্ভব? শঙ্কর আমার সামনে ছিলো না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমি শঙ্করের সঙ্গে কথা বলছি। শঙ্কর, তোমার মতো মানুষও পৃথিবীতে থাকে? আমার বন্ধুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কই তোমার তো কোথাও কোনো মিল নাই। অথচ মানবী তুমি অথচ বন্ধুও, না কি তুমি সম্পূর্ণই বন্ধু? কে তুমি? তুমি কি সত্যি কোনো ইতিহাসে তোমার নিজেকে আমার মনে হচ্ছে? তুমি কি রক্তমাংসের শরীর? তুমি কি ঘাম? তুমি কি স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে এসেছো কোনো দামী পাথি ধরতে? না কি এই জীবন? এটাই বাস্তব? শঙ্কর আমি এখন কোথায়? বন্ধুত্বটা প্রায় কি সত্যিই কোথাও আছে? আমি কি সত্যি একদল হারানো প্লেন থেকে কোনো এক দুপুরে একটা প্লেনে চড়ে বসেছিলাম? কতদিন আগে? কত বছর আগে কত দূর আগে আমি কোলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছি? আমি কি আর কখনো কোলকাতায় ফিরে যাবো? না কি আমি এই বারান্দায় অনন্তকাল হয়ে আছি? শঙ্কর তুমি কি আমার কেউ? আমার খুব আপন কেউ? না কি তোমার ঐ মায়াবিস্তারিত হরিণী শরীরের নিবিড় পরিচয়ে তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করেছো? এই সব ভাবতে ভাবতে আমি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুমভাঙা সেই সকালে। ঘুমভাঙা পাখীর ডাকা ডাকি কানে আসছে। আমার মনে হলো কখন থেকে ডাকছে। আমার মনে হলো আমি যেন সমস্তদিন থেকে ঠাণ্ডা জলে ডুবে ছিলাম। ঘুমের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠছি

মতো শোনাবে কেন? সরলা আজ কেন দুপুরের আয়ার মত প্রতিদিন আসবে? কিন্তু আই তো পরিষ্কা দেখছি। লালীকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। সরলা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না কেন? আমি অবশ্য চিৎকার করে ডাকছি সরলা সরলা সরলা। ও আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না কেন? ও এখনো দুপুরে দুপুরে ঘুমিয়ে রয়েছে। আর সেই আয়া গুলিবিদ্ধ দুপুরের আয়ার মতো সরলা বেরে উঠেছে। যখন আকাশ দুপুরের আয়াও এত কথা শোনায় না। সরলা কি আমার অস্তিত্ব আমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছে না? ও কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে না! আমি এই পৃথিবীর মূলস্তম্ভ বাড়ির মতো স্তব্ধ বিস্ময় বোধে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি সরলার মুখ দেখতে পেলাম আমার পরীক্ষের ছক পাল্টে গেল। আমার মনে হলো সরলা আমাকে দেখতে পেয়েছে। সরলা আমাকে দেখতে পেয়েছে। সরলা আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমার সমস্ত

॥ কুসুমিত জীবন বাহার ॥

চণ্ডী মণ্ডল
(প্রথম বর্ষ – আলো)

জন্মের পর বেশ কয়েক বছরে নিজেকে প্রথম চেনে সে বুঝল তার নাম অভিনাশ, এই নামে সংসারে তাকে সবাই ডাকে। সে ছিল বেশ বেশ হৃষ্ট তার খুব খেলে সবসময় মিলিয়ে তার এই শৈশবে সে যেমনটি ছোটবেলা ঠিক তা যেন তার অভিনাশ নামটি তাকে তার নিজের মত হতে বাধা দেয়। এখন সে তার বাবা মা আত্মীয়দের বলল: আমার নাম বদলে আমি অন্য নাম চাই। সকলে রাজী হল, তাই হবে; হল। তখন সমাজের কাছে যার যাহিন কিছু যার নাইকো তাঁর আকাশের পাখি সমান বেলার মতো অমল সহজ সুন্দর মনোরম, সমস্ত বিশ্বের সে নিজেকে মিলিয়ে বুঝল; এই তার শৈশবে সে অমল নামে এমন তার সবকিছু, তার ব্যবহারের সঙ্গে নিজেকে সে আজন্ম সহজ অনুভব করল, সে আর একটুও বড় হয়।

তারপর সেতার ধরে যৌবনের বৈশাখে অমল নামে আবার দেখে তার নিজের পরিচয় স্পষ্ট নয়। এখন পৃথিবীতে ঘরে ঘরে নিজেকে প্রকাশ করে সে, চারপাশে তার নতুন নতুন বিশ্ব, সে এক আজন্ম পরিচয় অনুভব করে নিজের মধ্যে কিন্তু তাকে নিবিড় নিশ্চয়তা কাছে পায় না, সে সমস্ত কিছুতে নিজের কাছে অতি আপন করা পড়তে চায় যেন নিজেকে আরো কত বিচিত্রভাবে দেখে বুঝতে সে চায় কিন্তু অমল নামটি তাকে অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। সে সম্পূর্ণ ভাবে স্বাভাবিকভাবে নিজের কাছে ধরা পড়ার জন্যে তার পুরোনো নাম বদলে নতুন নাম রাখল অনিমেষ—অমল।

একটি মেয়ের ভালোবাসায় সবার একটি নারীর সঙ্গে নিবিড় প্রেমের গভীরে সে আবার নিজের কাছে এবং যেন সমস্ত বাহিরের কাছে অপরিচয়ের সেই নারীটির কাছেও যেন সে ধরা পড়ল, অমল ধরা কিন্তু সে বুঝতে পারল যেখন এখন যা তার স্বাভাবিক হওয়া হয়েও সে যা হতে পারে হতে চায়, তা সে বহুল একজন কমলেশ নাম তাকে বার বিয়ে অম্পষ্ট পরিচয় অনেক করে রাখল, তার বর্তমানের জন্যে নতুন একটা নাম তার চাই, সে তাই নিজেকে যা অনুভব করে সেই মত নিজের নাম দিল অনেক মজুমদার। এই নামে এবার সে নিজেকে বুঝল স্বাভাবিক, এখন তার পরিচয়ে যেন বাধা নেই, শ্রেষ্ঠিকাও তাকে সহজে স্বাভাবিক অনুভব করল, প্রেম সহজ অনুভব করে সে প্রেমে। সার্থক হল; ……কিন্তু বন্ধুদের কাছে সংসারের অন্যান্য অনেক তার পুরোনো নাম কমলেশেই সে নিবিড় পরিচয় থেকে গেল।

যখন সময়ে সে বিয়ে করল, পিতা হল তখন কমলেশ বা অনেক যেন নামেই যেন তাকে মানায় না, এই নামগুলি এখন তাকে লজ্জা দেয়, এই নামগুলি তার বর্তমানে তাকে সহজ হতে বাধা দেয়, এখন অনেক দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সহজ স্বাভাবিক এই তিনিশ বছর বয়সে নিজের পৃথিবীতে নিজেকে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবীর সকল সহজ কিছুর কাছে থেকে নিজেকে স্বাভাবিক ভাবে পেতে হলে অন্য নাম চাই, বর্তমানের নিজের সঙ্গে মিলিয়ে সে নিজের নাম রাখল অনিমেষ চৌধুরী। তার সমস্ত সন্ধানের বাধা দূর হল। অনিমেষ চৌধুরী এখন স্পষ্ট নিখুঁত উজ্জ্বল।

কিন্তু তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে সময়ে সে বড় চাকুরে, গাড়ী হয়েছে, বাড়ী কিনেছে, পুরোনো স্ত্রীকে ডিভোর্স করে নতুন অভিজাত বিয়ে করেছে, সে এখন অনেক বেশী অভিজাত সমাজে এখন তার অন্য পরিচয়

অন্ত ভূমিকা, এই ভূমিকার একটা নতুন নামই তাকে সার্থক আত্মরিক করতে পারে তাই সে এখন নিজেকে মুখোপাধ্যায় এই নামে সে অনেকের মাঝিয়ে গেল; তবে সে একটুও অভিনয় করছে না, স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে আসছে তরুণীর আত্মবিশ্বাসে। চরিত্রের এই পরিণামে কখন কোথায় পৃথিবীতে সে ফুরতে পারে না এখন, নিজের বিষয়ে সমস্ত কিছু বাড়ি মান সম্মান প্রেম ভালোবাসা স্ত্রী সন্তান টাকা পয়সা এত দিনের সমস্ত সব কিছু যেমন বিচ্ছিন্ন বিশেষী এক নারায়ন বিচ্ছিন্ন নারী বহু সহীর অবের নারায়ন যার উদ্ধার আনন্দ এখন সমস্ত সংসার ফুরাপাস, একটা গভীর বিষাদ তাকে বার্থতা-বোধে নিবিড় ঘন করে যেন, একে একে অবহার মাঝে সে যেন নির্জনতার একা অসহায় তার প্রতি আরো আর কেউ সে সকলের দূরীর বাইরে। তবু, নিজেকে তার খুব বিষাদ মনে হল, পুরোনো সমস্ত নামগুলো তাকে দিয়ে নারায়ন অভিনয় অভিনয় নিয়েছে সে ফুরতে পারে কিন্তু কিছুই সে এখন করতে পারে না, প্রথম থেকে নতুন ভাবে সে আর জীবন শুরু করতে পারে না, এখন সে চায়, সে শুধু আর একটা নতুন নাম নিতে তার এই বর্তমানকে অস্বীকার করে সে নামে এখন সে জানেন নেই; সে হল অমল মুখোপাধ্যায়।

অমল মুখোপাধ্যায় যখন মনের জোরে এখন সুস্থ। তিনি আর হাঁটতে পারেন না, দীর্ঘ পথ চলতে পারেন। তবু দীর্ঘ হাসপাতাল বারান্দাটার দুঃখ তাকে সহ্য হয় না, হাসপাতালে ফিরতে পারেন না চলন্ত গাড়ীর জানলা দিয়ে তিনি যেমন বাইরের সমস্ত দৃশ্য নিজের হাতিয়ে যাচ্ছে তিনি নিজে যেন সমস্ত দৃশ্যের থেকে দূরত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রমে, বাইরের বাজার তার তখন জীবন থেকে যাচ্ছে পড়ছে কিন্তু তিনি বিশ্বাস নিতে পারেন না তার জন্যে যেন পৃথিবীতে আর বাজার নেই,.....

বিজয়কুমার স্ত্রী অমল মুখোপাধ্যায়কে ডিভোর্স করে যেন আবার বিয়ে করেছিলেন সেই স্ত্রীর যৌবনকে এখন যেন ধরে রাখতে পারে না, নারায়ন সুন্দরী মেয়ের আরো প্রৌঢ় মুখ এই স্ত্রী নারায়ন প্রণামকে এখন অমল মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত যেন কোন দিন কোন স্ত্রী আর নিজের ছেলে নয়, সমস্ত নারীদের মধ্যে তার জীবনের একদিনের সম্পর্ক ছিল সত্যের, পরীর সম্পর্কের বিদ্যা, নারায়নের মত হয়েছে কেউ অমলের কেউ এঞ্জিনীয়ার কেউ ব্যবসায়ী তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের, তাদের মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বে কোন প্রয়োজনে তারা কেউ নয়। সমস্ত বিস্মৃতে সমস্ত সময়ে তিনি ছিলেন অপরিচিত অসহায় শুধু অসহায় এখনও সমস্ত কিছুতে তিনি বর্তমান একটা সম্পর্কে, এই সম্পর্ক তত বৃদ্ধ তত বিদ্যা জন্মের পর থেকে এখন সমস্ত জীবনব্যাপী নারায়ন নাম নিজের পরিচয় তত বৃদ্ধ মনে হয়, আজীবন তিনি একটা চরিত্রের খাঁচায় বন্দী পাখি অথচ তার জন্যে বাইরের কোন অন্য ব্যক্তিত্ব জন্মের আকাশও ছিল না কোনদিন, কোন সাধনা নেই, জীবনটা একটা বৃদ্ধ দুঃস্বপ্নের তিনি ফুরতে পারেন ফুরতে পারেন জীবনের প্রতি ফুরতে তিনি তত অভিনয় করেছেন তত বিচ্ছিন্ন তার নাম, তিনি নিজে যখন কোন সত্য ছিলেন না বিভিন্ন চরিত্রে শুধু অভিনয় করেছেন শুধু এখন মনে হয় তাঁর আরো কত নাম হতে পারত · কিন্তু সমস্তই বৃদ্ধ এতদিন যা প্রমাণিত হয় এখন তাই হয়েছে, আর কোথাও কিছুতেই ভালো লাগে না, অমল মুখোপাধ্যায় শুধু শেষ আশ্রয় নিজের নাম নিজের কুলদারাল চক্রবর্তী।

এখনও তিনি পথচলতে আরম্ভ হয়ে বিছানায় শুয়েছেন, চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে তিনি অন্ধ হয়ে যেতে পারেন কিছু অনুভবও পান না এখন, হাত দুটো নাড়তে পারেন না, নারায়ন জটিল অসুখে তিনি ভুগছেন। তাঁর জন্যে অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, শরীরের অন্তর বাহির সমস্ত কৌশল অবস্থা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, সমস্ত বাহির বিদ্যা হয়ে গেল, নিজের কাছে একা অপরিচিতের মত তিনি পড়ে আছেন।

কুলদারাল চক্রবর্তী আজ মারা যাবেন। অন্ধ বোবা শুধু অসহায়ের তিনি ফুরতে পারছেন তাঁর দুঃস্বপ্নময় চারপাশে এতদিনের পৃথিবীর জন্য বিচ্ছিন্ন অসহায় থেকে অমলের তার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক কিছুই বুঝবার ক্ষমতা নেই আর। এখন যদি নিজের পরিচয়টুকু তিনি ফুরতে পারেন সেই চেষ্টায় তিনি হঠাৎ মনে মনে খুব ব্যস্ত এবং উত্তিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁর খুব কাছে এসে গেছে, যত জোর একবারটি ফুরে, সেটুকু পথ হেঁটে আসতে মৃত্যু সময়

মোর যার এক বিন্দি, এক বিন্দিতে নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে দেয় তখন তাহার আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তিনি তাহা এবং একটিমাত্র জীবন, জীবন-মৃত্যুর সমস্ত ভার তাঁর জীবনের পরিচয় খুঁজতে পারছেন, এখন তাঁর যা নাম হওয়া উচিত তিনি জানেন, এই অবস্থায় সেই নামেই তিনি নিজের কাছে নিজেকে পরিচয়। তিনি নিজে বুঝতে পারছেন এখন যা নাম তাঁর কিছু মানা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত চারপাশে অপেক্ষা করছে সেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁর বর্তমানের নামটি জানিয়ে দিতে হবে কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? তিনি কিছু দেখতে পান না তখনে পান না তবু বলতে পারেন না যখন এই সময় তাঁর এই নামটি সকলে না জানলে তাঁর নিজের পরিচয় যে ভুল হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে। নামটি কেমন করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব? তিনি এখন নিজেকে পারেন না তবু বলতে পারেন না তেমনের ইশারায় কিছু বলেন কিন্তু তেমনের দৃষ্টি সেই। পত্নীর তখন বিদায় বেলার ভেঙে দুমড়ে যাচ্ছে যেন হাঁটু দুই বিরাট তাঁর তাঁকে আকড়ে ধরেছে, তাঁর নিজের বাবাজীবন মুখোশ মুখ ভেঙে এক করুণ গোঙানী। পত্ন উঠছে, তিনি চলেছেন পালকি করে যাচ্ছেন। তাঁর পত্নীর এক মুখোশের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর সেই নামটি জানাতে চাইছেন যেন সেখানেই তাঁকে সবাই সকলে জানে তাহলে এই বিদেশ জীবনেও তাঁকে সকলে চিনবে তাঁর মুখ আরো গভীর যন্ত্রণায় ভেঙে দুমড়ে গেল, কিন্তু সেখানেও চলে যেতেও তিনি যাবে হলে, মৃত্যু পর্যন্ত আত্মগোপন করলে তাঁর। যাবে মুছে না তবু মুছে তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর একদিন তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর এই এই ছিল ইতাদি এখন তিনি মরে যাচ্ছেন এই পর্যন্ত, আর বেশী কিছু কেউ জানবে না বা মুছবে না। চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও এই জটিল অবস্থাটার ব্যাপারটা মেনে নিলেন, এখন তাকে পত্নিই কেউ মুছবে না, তাহলে তাঁর সমস্ত জীবনটা মিথ্যা হয়ে যেন, তখন অন্ত এক পাড় যন্ত্রণায় একবার তাঁর মুখবলা জীবনে চলে যাবার আগে যন্ত্রণায় মুখোশ জটিল ভেঙে মুছে ভেঙে একটা শেষ অভিনয়ের মুখোশ। নিজেই পরিচয়ের ভার নিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন।... ইতিহাসের অন্ধকারে কোথায় কত লোকে কী মূল্যবান মুছে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। বিছানার মেন পাথরে যা মাটিতে খোঁজা তিনি এখন কোন নামই বলতে পারেন না। তবু বিতৃষ্ণায় তাঁকে অন্ধকারে নিয়ে নিয়ে চুকিয়ে পুকিয়ে মেন করার চেষ্টা করছে, চারপাশ অন্ধ শব্দ মুখ।

স্মৃতির বলাকা বনাম রাহুমুক্তি

—দীপক চৌধুরী

(কলিত রসায়ন বিজ্ঞান—দ্বিতীয় খণ্ড)

ভর মাথা—মানে মাধবলালবাবুর এক প্রকার বিশ্রীরকম খেয়ালের প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন কয়েকগুলো বিচ্ছিরি চিন্তায়। বীচের মাথাকা থেকে চিটকে ওর ঘুমন্ত মনে এসে ধাক্কা মারলো। অত্যাস বশে সে ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো ওর। বোজকার মত একটা হাই তুললো হাত দুটোকে মাথিসের উপর দিয়ে মাথার দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে। মাধবলালবাবু তখনো চেঁচাচ্ছেন—বয়স পুরুষের এখনও ধ্বা হয়নি বুঝি—যে মন মন উত্তপ্ত। উত্তপ্ত অক্ষয় কথাটা শুনতে পেলনা। শুনলে আজের হয়তো ঘুম শেষ মাধবলালবাবুর মোকাবিলা দেখে—কিংবা হাসতো—রোজ রোজ একই কথা বলার মৌখা দেখে। একটানা ঘুমের আবেশে হারাতে অনিচ্ছুক অক্ষয় পায়ের তলায় গুঁড়ি মারা মশলা জাতীয়টাকে টানার চেষ্টা করল পায়ের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে। ফল হল এমনি উঠে পড়া উচিত হয়। শেষমেষের মত জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল বেডশীটটাকে।

এমনি উঠবে ও। আগেও ইচ্ছে করেনা ওর উঠতেনইতে দেখে। দেখছিলই করেনা। আজ লাগেনা ওর ও মাধাটা। আর আজ লাগেনা মাধবলালবাবুর ঐ উপদেশ মিশ্রিত চিৎকারটা। দুটোই একসাথে হলো। একটা অনুভূতিহীন হাত দেখে বোঝা যুমের দিকে তাকিয়ে দু'একটা ক'রে বকতে ও আজ লাগেনা। লাগতে পারেনা। আর বয় পঞ্চাশের ওপর—দু'শো টাকা মাইনের কেরানিদের অক্ষয়ো ঘুম ভেঙে রোজ রোজ জীবনের কর্তব্য নিয়ে উপদেশ শুনতে ত্রিশ বছরের অক্ষয়ের আজ লাগতে পারেনা, পারেনা—শুধু শুনতে ভয় রোজ। অর্থাৎ অভ্যস্ত। এ আর এক প্রকার কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে ভুলচুকের ভয় নিয়ে থাকেনা।

তাদের নীচে পায়ের চেঁচানিতে ওঠার ঘুমের ভয়ে আনলো ও। মাসে মাসে ইউনিফর্মটার মাইনে পাবে। টাকা ছাড়া আর বিশেষ কিছু আসে। সুতরাং উঠবে সে। চিরকালই তো হয়ে আসছে। যোগ্যতম জাতীয় প্রবাদবাক্যটা যে কার মনে মনে পড়েছিল কেবলে উঠে বোঝে।

পাশেই কোন বাড়ীতে একটা বাচ্চা ছেলে খুব কাঁদছে। খুব কাঁদছে অক্ষয়। কিন্তু শুনতে ভালবাসে। কিসের ভয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত। এবার উঠে বসে ও বিছানার উপর। মানটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। 'তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী—অক্ষয় বারকয়েক চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা।

নীচ থেকে আবার মাধবলালবাবুর একটা চিৎকার শোনা গেল। সব আর কথার ঝড় তোলে অক্ষয়ো বুঝলো এ চিৎকার বাড়ি কাটাবার ফুল হাতে নিয়ে হচ্ছে। মোটা অঙ্কের মাধাব্যথা। এ অঙ্কই অক্ষয়ের ভাল লাগেনা মাধবলালবাবুকে। লোকটা শুধু চিৎকারই করতে জানে। মাঝে মাঝে ওর জীবন রাগ হয় বাবার উপর। যখন ভেবে—তার দু' বছরের বড় আইবুড়ো দিদি ঘিনিটা বাড়ানোর রেলিং ধরে কলম চুপ করে দাঁড়ায় মুখচন্দ্রর ভেবে—বৃষ্টি আকাশের ঘর্ম প্রবাস—তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বুজিয়ে যেন নিজের ভেতর উপর, তখন অক্ষয়ের অনেক কিছুই মনে হয়। নিজের জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মাধাটার উপর আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে ওর। দিদি যখন কলম চুপ

আর একটা ছেলে বাবা বীরবাহু নিয়ে কিছুক্ষণ পর পরপর ছোট ছোকরাটার উঁচুতি দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে—তুলনার তখন বাবা পায়। অবশ্য রাধাবল্লভবাবুর উপর অনেকটা নির্ভরতা। ওর মনে পড়ে, বছর তিনেক আগে গায়ের এক ছোকরা ওর পিসির সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করেছিল বলে ও বন্ধুদের নিয়ে ছোকরাটাকে প্রহার দেয়েছিল। তখন একটা তৃপ্তি পেয়েছিল মারার মধ্যে। এখন মনে হয় ভুল হয়ে গিয়েছিল। অহিংস হয়ে উঠেছে তুলসু। সংসার—তার বন্ধু বলে, ভাল করে তাকাতে—বুঝতে পারবে সব কিছুর আড়ালে আছে কিছু একটা পাবার আশা। সবাই ছুটছে কিছু পেতে. কিন্তু জানে—উপরে কিছু নেই। আসমানটাই সবার কিছুর অন্তিম ইচ্ছা। সবাই রাজনের মত বাদুড়। এ বয়সে সব ভাবনা সবকিছুর তারপাশে ছুটিয়ে যাবে। তার একটার ছুটা যাবেই প্রয়োজন। তুলসুর মনে হ'ল সে একটা ভাবনাকে হত্যা করেছে। নিজেকে উঁচুতে ও।

বাড়ীর বাইরে কয়েকজনো ছেলে তুলসুকে ডাকছে। ওরা ছেলেই বেরবে গেল তুলসু। মাটিটা গায়ে ঝেড়ে উঠে এল। তিনজনা ওদের। একজনের 'বি—এস' ওরা। সেদিন থেকে রাধাবল্লভবাবুর ছটফটানি কথা শোনা গেল। বেরাটার বেটা সেক্রেটারী—হাঃ হাঃ হাঃ উচ্চহাসি। ঘরের দেয়ে ঘরের ঘোর তাকিয়ে বেড়ানো বন্ধ। ঘরের সেরেও বন্ধুদের ডাকাতে যাবা হল তুলসু। যাবার কথা কোন শোনা গেল। কবে সেটা কখন অনেকের পরিচিত হল—কি ও কি কাজ? যাব যাব! তাকতে পারে যে। তোমার পায়ে পড়ি—এমো যাবনা।

আর একটা খুব আশ্চর্য লাগে তুলসুর। এ যেমন করে সম্ভব! একটা ঘটনা তার ছোট্ট রাধাবল্লভ এতগুলো লোকের খুশিমত ঘটনাটার অনেকটি অভিযোগগুলো আশ্চর্যজনক ভাবে বাবা চাপা পড়ে যাবে। অনেকগুলো সম্পূর্ণ নিরপরাধের চরিত্রের অন্য সাজানো আসামি এসেছে। যদের ঘরের আগে বন্ধুরা যখন পাড়ায় এক সার্কাসে রাধাবল্লভি নিয়ে করে যা ছেড়ে অন্য পাড়ার চলে গিয়েছিল রাধাবল্লভ হিংসে চাপা থাকায় 'নেমকহারাম' ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি। যা কিছু হাতের পা হাত হাতে নিয়ে ঘুঁসিয়ে বেরেছিলেন। ঠাকুরের বাড়ি আর্শিক করেছিলেন তা বেন নিয়ে আসে। মেয়ে মহলে সাজনা দিয়েছিলেন বউরো ওদের বেশী দুখে আছে। কি, এ ছেলে মেয়েরা যা যাইনা পায় নিজেরাই ঘুলোয় না। আজেই সাহায্যের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। অবশ্য নিজে মাঝেমাঝে গালী মা-এর ভাব মাঝে মাঝে পড়ে বড়মার বাড়ী থেকে। আর যৌবির অসুখ—তার সন্তান সম্ভবা। নিজে এসে পড়ুয়ে ছেলে বৌ-এর প্রসবের দুখে হয়ে ওঠেন। অবশ্য তুলসু জানে—এরে কি মেয়েদের যারা যৌবির বিয়ের যা এর উপর—রাধাবল্লভ বাবুর নয় সন্তানের অসাধুর সংসারটার উপর।

সব ছাড়া তুলসীর। চোখ দিয়ে যা ছলেও মেয়েরা পারছে তুলসু তা চল পাঁচা আর মোহা পরিহীন হাড় জিরজিরে হাড়টা ছেড়ে তুলছেন না।

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ওঠে তুলসু। কেন এই দীনতা? কি প্রয়োজন এ অভিনয়ের? মুখে কৃত্রিম পরিতৃপ্তির ঘর মাখিয়ে সবকিছু সহ্য করে যাওয়ার কি প্রয়োজন? এর বিনিময়ে কি পেয়েছেন তিনি রাধাবল্লভবাবুর কাছ থেকে অনন্তকাল দুখ আর বঞ্চনা ছাড়া?

দুখ হয় তার - তীব্র দুখ হয় তার দুর্বলতার জন্য। ভালবাসতে ইচ্ছা করে খুব। কাঁদতে ইচ্ছা করে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে। তুলসুর চিন্তা বন্ধ হয়। ওরা ডাকছে আবার।

ওদের বিদায় দিয়ে তুলসুরা এল ও। বারোয়ারী তলা। স্টাটে রাধাবল্লভের আইনজ্ঞ মোকদ্দমার বন্ধুদের উৎসব। দুর্গত আর মোসাহিবের পরিপূর্ণ। হাই-স্কালপাড়া আর আশ্রম পাঁচের অবাধ যাতায়াত। তার বন্ধু ছত্রাম জমে—বিড়ম্বিটা উজ্জ্বল বেশী। তার মেয়ে অকল্পনীয় আলো সব সময় ঠকিয়ে পড়ে। রাধাবল্লভই মোদ কিছুর বিক্রয় ঠকটাই বেশী করে চোখে পড়ে। মনের আধার প্রধান আর প্রেম নিবেদনের যাকে তাই আমরা মানুষের পরিচয়টাকে খুঁজে ফিরি। যৌবির ভালবাসা পেয়ে রাধাবল্লভের যৌবির কথা ভুলে যাই। তুলসুর মনে হয় কলমের দুর্গত আর পরিচয়ের

মানুষের পৃথিবী ছেড়ে গেছে। অথচ আর পাঁচজনের সাধারণ বিহীন দাবাবেন। প্রাণের উৎসগুলো ক্রীত হয়ে গেছে এখানে। মুক্ত হতে চায় সে এই ক্রীতদাসত্ব। এক ঝলকে ওদের ফেলে বাকিটা পরিষার করে দিল ওদের।

দিন পাঁচেকের কাজটা ফুরিয়ে গেছে। তাই নিয়েই টাক ওলোকে ওদের মুখ মুছে দিল ও। উপরে উঠতে বাইরের ঘরে গোলমাল শোনা গেল। শুভেন্দু বুঝলো ওর পার্সোনেলটার মেজাজের অভিযোগ শুরু হয়ে গিয়েছে। জানলার ধারে দাঁড়ালো ও। ভোর ৪৫ হয়েছে। তাঃ কিং যে ব্যবস্থা করে বাকিরাও আর একবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিল।

ওরা এলে দাঁড়ি হাতে নিল ও। এখুনি ওটাকে ধারে চালাবে। ওরাদের মুখের মোলায়েমগুলো মাখানো হয়ে গেলে মানুষের মেরে যাওয়া জীবটাকে টেনে টেনে সোজা করে দেবে। পাঞ্জাবী চাদর মানুষের সাইজ পড়ে ও। একদিন চাদের ছেলে বলা হয়েছিল কবি সাহিত্যিক ছাড়া পাঞ্জাবী মানায় না। শুভেন্দু মানে সে কবিও নয় সাহিত্যিকও নয়, তবুও অনেকে বাবুকে দু'একটা ভালো কবিতা লিখেছিল। পাঞ্জাবী আর পরে না ও। সে চায় নিজেকে সুন্দর দেখাতে। ওয়াদের চোখের আয়নায় নিজেকে সুন্দর দেখতে চায় সে। ওর আর অনেকের মধ্যে যে পার্থক্যের প্রকাশ আছে মাঝে মাঝে তাই শৌখিনে অবশ্য শুভেন্দু উপলব্ধি করে না। তবে চাদ মানুষ বা না মানুষ অন্তরঃ ভাল মানুষ—এইটাই চায় সে। দুর্বলতা নয়—জীবন মুক্ত করার প্রেরণা।.....যা ভেবে চাদেরের। রোগটা ওটাকে ওটাতে রেখে এল শুভেন্দু।

বাড়ি ফেরে অনেক অভিজ্ঞের অনেক বাকা। চাই মাথা ঠুকে দিয়ে যেন হজমে মোগাসে খেলা ব্যাপার অথচ মন খুশী পরিতৃপ্তির ঢেকুর—যাস্ উঠি মনোগুরু। উঠে পড়ে। যতদূর হুমে চাটা পায়ে গলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনকে বোঝালো। ঘিনি-আর সিঁড়ি ওরালার সিঁড়ি ঘরে বাইরে ভাসিয়ে যায় যাইনে। যান থেকে ওদের ফেরে ওরা শুভেন্দু। "ফেরের হাতে বলা দেব যাই ছেড়ি ঘরে; অনেক দেরী হয়ে গেল দেরী অনেক দোরে।" আশ্চর্য মনুষ! এত মিষ্টি বলা তো সিঁড়ি ঘিন না? আর এ গান? কেমন যেন লাগে সমাধানের ওর। নিজের ঘরে ফিরে চায় সমস্যার ভীত্রতা ওলোকে। মানুষকে ওরা এক জন্তুতে ঘিরে চলে যেন।' আহা ওরে—সুন্দর রাজা—ঘর রাজা। সেখানে—সেখানে শুভেন্দু আছে—ওরে এ শুভেন্দু নেই সেখানে—ওরেরা নেই—কমুনিটি নেই; শুভেন্দু আছে। বন্ধুদের ছাওয়ার মাঝার শুভেন্দু সেখানে কোলিলের গান, ফুলের গন্ধ আর আধুনিক কবিতা ঘিরে আছে। সেখানে চাদের মানুষরা সার্থক জীবন যাপনের অজস্র ঘরে আছি ওদের মুখ ভোলা স্যাটিস্ফাইড জীবনে সাধ আর সাধ্যের অন্তে, আকাঙ্ক্ষা আর লব্ধির অন্তে, ঘর আর সন্তাবনার অন্তে প্রাচীরটাকে ভেঙে ফেলেছেন। অজস্র সব আইসুক্রা মিনিয়া উপযুক্ত সঙ্গীর সঙ্গে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। সন্তোষের ঘরে সার্থক হয়ে অজস্র মানুষের জীবনের ঘরে উপলব্ধি করবার অন্তরা গান অজস্র। মায়েরা সব মুখ সরল মেয়ে নিয়ে ছড়িয়ে আছে মুখে মুখ আর মানুষ উপভোগ করছেন। সমাজ বিরোধী লোকেরা চাদের অন্তরে চাপা পড়ে গেছে। সব অন্তরা শুভেন্দুকে সুন্দর দেখার চোখের অধিকারিণী করেছে।

॥ খাঁচা ॥

অমল চট্টোপাধ্যায়
(দ্বিতীয় বর্ষ—অনার্স্ বিভাগ)

রাজার কথা

'না'—বলতে পারব না। ছুতোর অপমান করি কি করে। এমন পথায় সেন্টিমেন্টালিজমে একেবারে ইতি দিতে পারি নি, পারি নি নিজেকে পুরোপুরি বন্ধ করে ফেলতে। তাই দিকে ফেরে আছি, ভাবছি কি বলবো। একটা একটা ফেরে দেখি নি। তাই ছুতোর আমার দিকে ফেরে আছে অনীম আগ্রহে আর আশঙ্কা নিয়ে। ওর হয় আমি ওর মান আমার সম্পর্ক অস্বীকার করি কি না।

ছুতোর—অদ্ভুত ও। বাইরে এত আকাশ, ফেরারে ঠিক বার উনিশ এক মানুষ। তিন রঙা আগে চশমা দেখি পুরু। আমি যার ইয়ারে রিলিয়াণ্ট ছাত্র। ও তা বাবার সঙ্গে এসেছিল আমাদের বাড়ী। সবে ফুলের পরিচয় পায় হয়েছে, দুর দুরুর কথা বলবার অবসর মোর করত। কিন্তু আজকে ও অনেক পালটেছে। তাই প্রশ্নটা করবে কম না। উত্তর কিন্তু একটা দিতেই হবে, বললাম—অস্বীকার করি না কিন্তু তোমার চোখের ভবিষ্যতে তোমার হাতে খাওয়া ভাল মনে করি। এখন যোগবের সময় এসেছে ফেরে দেখবার। তবে এটা ঠিক আমার পথ পাল্টাবে না।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আর কারও রাস্তা আমা নিশ্চয় করছে। সেটা তুমি একটু ভেবে দেখো। এরোজনে তোমার মতি কিছু বদলাও।

—কি করতে বলো?

—পরক্ষণ ঘটনায় অড়াতে যেয়ো না।

মেয়েদের শেষোক্তি পাথাটা একটুকাণে ঘুরে এসেছে। নীচে দিয়ে আসিয়ে মেলাম, উঃ, সেই একই অবস্থা। টেবলগুলোতে বারোজন বসে বারো ধরনের লোকের এক বিচিত্র ঘটনা। সবলেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

মেয়েটার চুমুক দিয়ে বললাম—অসম্ভব।

—কিন্তু—

—তোর কিন্তু নয় প্রিয়া, ওপর থেকে হয়ে সবগুলো আমার কাছে একটাই টেবল দেখতে পাচ্ছো। কিন্তু নীচে থেকে দেখতে গেলে ওদের প্রত্যেকের দুঃখ আলাদা।

—আজে কি?

—প্রিয়া, তোমার বিশ্বাসের জোর থেকে অভিমান—একটা চশমাটার কথা নিয়ে না ভেবো, তাহলে সবই মেয়ো হবেন। কিন্তু একটু কাছে গিয়ে দেখলে ওদের অনেক কষ্ট একটাই, আর সেটা হলো মেয়ে পাওয়া।

—তোমার মত মেয়ের মন আমার নেই।

যোগবের আই। মনীষ একমাত্র সন্তান। অভাবের যীভৎস চেহারা কখনও দেখে নি। দেখবার মত মনের গঠন নয়। পিয়ানো টেনিস আর আদরে ছোট স্যানিটেশন নিয়ে দিন কাটে। বললাম—

—দেখার মতন মন তোমার নেই, কারণ তুমি একটা অদ্ভুত খাঁচায় আমা যাস করছো। সেখানে আলো, হাওয়া সবটুকুই কৃত্রিম।

—তুমি কি বলতে চাও?

—এখন। একটা বিরাট খাঁচায়, সেখান থেকে একটি ছোট খাঁচায় চলে যাও আর একটা খাঁচায়, সেখানে যাই থেকে কতগুলো লেখা পড়ে "জ্ঞান" লাভ কর। আবার সেইভাবে খাঁচায় বদল নিয়ে যাও। তোমার বোঝবার অবকাশ নেই যে সবটা তুমি খাঁচিতে বসে

যাচ্ছ যাং ঘরে শিয়ালো বাজছেলো সেই সময়টাই তোমারই বয়ে যাবার যাবার মেয়ে দুটো ওটার জন্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, এমনকি এখনও তখনও তিনের সন্তানটুকুও তোমাদের।

এতদিনে অনেককিছু কথা বলে ফেলেছি। ঠিক এইজায়গে ওর সঙ্গে তোমাদের কথা বলিনি। বলবার সময়ও বোধ করি নি। মাথী ইন্ডাস্ট্রিয়ালীজী আর দুর্বীর চাটোর্জীর মেয়ে সুপ্রিয়া চাটোর্জী। ওকে এতদিন কেবল সুপ্রিয়া বলেই ডেকে এসেছি। আমার কাছে ওর কথা আলাদা। সেখানে এর সমাজ ওর সমাজ সবকিছুই উপেক্ষিত। ওকে যে বিয়ারের আবদার ওর চাহিদিকে, ওর একটা ওটাকে আমারই অনেক বড়ুর মুক্ত কাজে। আমার বিয়ে ছেড়ে পাশের আপেক্ষটুকু মাত্র করে সুর যখন পাশ দিয়ে যায়, ছেলেদের মনেও ইচ্ছা জাগায় ওর মন। অনেক ছেলে দেখেছি ওর পাশে আমার দাঁড়াবার সম্ভব নয়। ও না পারবে নিজের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বার হয়ে আসতে, না পারবে আমার অতীত জীবনের সঙ্গে তাল রাখতে। আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি আজ আমি ভালবাসি, আর ভালবাসি বলেই ওকে আমার সঙ্গে ভড়াতে চাই নে। তাই দুটীকে সুপ্রিয়া আমার দিকে চেয়ে মনে ভাবে—হয়ত এতবাসি দুটী তোমার মনে কে জাগিয়ে রাখে, সে কি তোমাদের মনের সেই মেয়েটী—যাবনী যান?

এতখানি বলবে আশা করি নি। কিন্তু আজিকে আজ একটু অন্যরকম—বলবার সুরে বলবার—যাবনীকে সম্মান দিয়ে কথা বলে। আর ওদের ভাষাভাষি ছেড়ে পারলেও তোমার ওপর আমার অনেক বেশী শ্রদ্ধা থাকতো।

বোধ হয় একটু বেশীই বলে ফেলেছি। সুপ্রিয়া মুখ নাচিয়েছে। অনেক পরে মুখ তুলতে দেখি চোখের পাতা ভিজে। মুখ আরও গম্ভীর—খুশি আমাকে এমন করে তোমাদের বলো নি। তোমাদের না।

এ-ও ওকে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু বলবার—

—কেন জানিনা মনে হচ্ছে এতদিন যা মনে জেগেছে বলবার। এখন হয়ত সময় মাত্র পালটা ফেলে পারে।

মুছতে পারবি ও তার চোখ মেয়ে। কিন্তু সত্যিই এমন হতে পারে। নিজের স্বামীর সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ জাগছে। চাটোর্জী মানুষগুলো আজ কোন—ঠিক ঠাহর হয় না। তোপাদি ঠিক বলেছে এক স্বামীর থেকে নতুন প্রেমিক নিয়ে আজ চালাবে। কিন্তু মর্মবেদনা বাজা বেজে। তাদের নিজেদের প্রেমিক আমিই ওদের দেবো।

সুপ্রিয়া আরোকেও ঘরে ঘরে উঠলো—কেন এভাবে নিজেকে আর পাচ্ছে না করছ। আজ তোমাদের বাড়ীতে নিয়েছিলাম। প্রত্যেক মানুষই এবং মানুষ দুজনেই তোমাকে বিন্দুমাত্র এভাবে চায় না। কেন তবে নিজের ক্ষতিয়ার নষ্ট করছ? ওদের প্রাপ্য তা পাচ্ছে। আর না দেওয়াও ঠিক ক'রে নেবে

—তোমার কথা বুঝি। কিন্তু ক্রিয়া ওদের দিকে চেয়ে তোমার আক্রোশ হয় না? মনে হয় না তারা পাওয়ার হাতেছে। ওরা ওদের জীবনী শক্তিটুকু যখন প্রকাশ করছে, তোমার ইচ্ছা হয় না একবার ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে?

—আমি যাবার বলছি ছাড়া, আমার ঘড়ী ছোট। সেই ঘড়ীটুকুর মধ্যেই আমি বাঁচতে চাই। আমার ছোট পৃথিবীর মধ্যে থেকেই আমি সুখী হতে চাই।

—আমার ঘড়ী থেকে আমি যখন বেরিয়েছি তখন আর ফিরতে পারবো না। নিজের হাত বাবা-মার থেকে নিয়ে নিয়েছি। আর যদির সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে যৌবনের সত্তা পেয়েছি। ওদের বাচার মধ্যে নিজের সার্থকে এক করে নিয়েছি। আর পথ নিয়েছি ওদের ওপরতলার মানুষগুলোকে টেনে নিচেয়ে নামিয়ে আনিয়ে নেবার

—ওদির পোশাক ছাড় না তুমি—

—ওদির পোশাক নয় প্রিয়া। আমি বেশক পাল্টি দেহি-বেদিন সত্যিই এমন হবে। আর আমার তখন কিছুটুকু হবেন তোমার বাবা।

—তিনি তোমাকে ঘেন্না করেন।

—অসীকার করি না। কিন্তু তিনি একটা অসহায় প্রতিবন্ধু, আর আমি তাদের, যারা ঘেন্না পেতে পারে না, ঠিকভাবে

পড়তে পারে না, তোমরাও যাতে ওঁকে আরাম দাও সেদিকে লক্ষ্য।

—তুমি তো ইচ্ছা করলেই এর থেকে পরিত্রাণ পেতে পারো। বাবা তো আমার অংশীদিবেন।

—ইচ্ছা করলে। কিন্তু ইচ্ছা করেই করি না। এখানেই তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ।

সত্যি কথাটা বড় সহজেই বলতে ও। ওর সঙ্গে তোর হয় এটাই স্বাভাবিক। ও আবার বলল—

—বাজা। তুমেছি ওখানে পড়াশোনা হবে। আমার ভয় করছে। তুমি কি—

—ষ্টীভ প্রিয়, আমার জন্যে আমাকে দুর্বল করে দিও না। তুমি জানো বেটা আমার নীতির বাইরে তা করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

সুপ্রিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল। ষ্টীভাইটে আরামটা বেশ যে বোঝা যাচ্ছে। বেয়ারা এসে ডেকে। বিল মিটিয়ে উঠতে বলল।—চলো তোমার তো আমার দিকে আসতে হবে।

—হবে না।

—আমার দিক থেকে ছেড়ে দেবার এখন বাস বন্ধ থাকতে পারে না।

—যার আমার দিকটা আমার ওপরই এটুকু মেহ আছে না?

—তোমার দিকটা জেনেই তো বাবার বন্ধুর ছাই প্রিয়া তুমি নিজেকে আমার কাছে রাখিয়ো না।

—বাজা—ভীষ্ণ গম্ভীর হয়ে উঠল সুপ্রিয়া।

মেয়েরা এমন কত মুহূর্ত ছুটে হাতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। সেদিনের পাখাটা একই ভাবে ঘুরছে আর ঘুরছে। টেবিলক্লথটাতে একই ভাঁজ চলছে। শুধু একটা আগে এই টেবিলে যারা বসেছিল টেবিল ছেড়ে উঠবার সময় তাদের মধ্যে একটু অন্যের পার্থক্য। এটাই বোধ হয় একমাত্র সান্ত্বনা ছিল। বক্সিতে মাটটার টাকা পাই হয়ে গেছে। সুপ্রিয়াকে বাড়ীতে দিয়ে আসতে হবে।

সুপ্রিয়ার কথা

পৃথিবীতে যদি স্বর্গ নেমে এসে থাকে সেবার আমরা এই ঘাটিতে। আর আমার জীবনদেবতা একমাত্র পুরুষ-পাত্র। কেন আমি ওর প্রতি এত অন্ধ আমি না, তবে এটুকু বুঝি এই অন্ধ ভালবাসায় সুখ আছে, তৃপ্তি আছে। কি জন্যে ওকে এত ভালবেসেছি, একথাটি আজও বলিনি ওর প্রতি আজ আমি না, তবে এটুকু জানি সেটা ওর প্রাপ্য।

আজ পড়ে প্রথম যেদিন দেখি ওকে, ও ছিল একটি আমোদপ্রমোদের মূর্তিমান মূরত। ওকে যখন দিয়ে দেখেছিলাম, খুব ভালভাবে না বুঝেও ওকে দেখেছিলাম তন্ময়ই। অনেক ভাবে ওর চোখের দিকে তাকিয়েও ওর চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হতো না। বাস্তবিকের চাইতে ওকে খুব সহজেই ওকে ঈশ্বর ভাবটা সহজেই ধরতে পারতাম, আর তাতে আমি ভাবার আরও কাছে যেতি।

প্রমিলির ব্যস্ত রাজা সুবাসী আর তরুণী সুপ্রিয়া চ্যাটার্জীর মধ্যে তখন ছিল প্রথম যৌবনের উন্মাদনা, অনেক রঙিন কল্পনা। আমার বেশ মনে পড়ে ঐ বয়সেই রাজা ভবিষ্যৎ সংসার সাজাবার জন্য প্ল্যান করত, আর এই ব্যাপারে রাজাকে ঠিক ওকে অসুবিধা দাঁড়িয়ে দেখা পেয়েছি। কিন্তু তখন ভাবতাম না আমার জীবন তরীর হাল রাজা কেউও দিতে পারে।

বেশ কয়েকগুলো বছর কেটে গেছে, আর আগে আগে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বারো সমস্যা। ও চিরকালই বিলাসিনী। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পা দেবার কিছুদিন পরে দেখলাম ও মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায়। আমার সামনে অন্তরঙ্গতা কথা বলে ফিরে. জিজ্ঞেই বলত, "তোমাকে বলে লাভ নেই, তুমি তো বুঝবে না।"

সত্যিই বুঝতাম না। বোঝবার প্রয়োজন বোধ করি নি। এর পরে দেখলাম রাজার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমে যাচ্ছে। তারও পরে ও বাড়ী ছেড়ে উঠে গেল। তখন তোমার ওকে ঠিক নেই। এর পরে

দিন চোখে চোখে রেখে এটুকু বিশ্বাস করেছি, ঠিক তত সহজের নয় না। তবু নিজের অভিমান ঠেলিয়ে রাখতে না পেরে অনুযোগ করেছি, "তুমি আমাকে এতদিন ঠকালে।"—উত্তরে "তোমাকে নয় একটা পুরুষ জীবনকে একটা নরম মাটীর বাসনকে।"

—বাঁধন মানতে পারো না?

—যে বাঁধন পক্ষ নয় তাকে বাঁধা পড়ি কি করে?

এর উত্তরে মনে মনে আমার সবটুকুই ওকে দিয়েছি। আমি জানি মুখে না বললেও ও সেটা বোঝে, আর সমর্পণের স্বীকৃতি তার কথায় খুঁজে পেয়েছি। দেখেছি মনে মনেও আমাকে গ্রহণ করেছে। আর বাইরে কেবল আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাকে ও আরও কাছেই টেনেছে। এমনও রাত্রিতে আমি ওর নীরিহ গায়ে হেসেই দিতে পেরেছি, পেরে গেছেও। তা বলে না জানি, তবুও একটা বিশ্বাসের মতো গড়ে তুলতে পারতে দিতে আমি চাই নি।

কবি হাউস থেকে সেদিন বাড়ী ফিরে যাবার পরে সেই কথাটাই তখনও সেটা আমার আশাতা ছিল। কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাদেরকে মাদ্রাজে ওজার ব্যবস্থা থাকলে আর পুলিশও থাকলে নতুন প্রতিনিধির নিরাপত্তার জন্য। বাবা পরদিন থেকে পাঠিয়েছিলেন মাদ্রাজে। ও এসেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তখন থাকতে অসুবিধা হবে ভেবে বাবার দলের পর আটকে রেখেছিলাম—একটু সুখে চলবে না?

—আমার বোকার ভুল নেই।

আমি থাকতে পারি নি। বলে পড়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরে উঠেছিলাম—বাবা আমার আর কেউ নেই।

আমার চুলে হাত রেখেছিলো,—তুমি না আমার ভালবাসো? তবে আমার সঙ্গে বাবা দিয়ে তোমার প্রেমের সার্থকতা কোথায়।

ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম ও ছিল দৃঢ়তার দৃঢ় প্রতীক। তখন কেবল মনে হয়েছিল ভালবাসা ভুল করে। আর কোন কথা বলতে চাই নি, পারি নি। কেবল ওর পক্ষ বুকের ওপর মুখ রেখে অবোধের মত কেঁদেছিলাম।

ও চলে গেলো। দাঁড়াবার শক্তি পারি নি। ভাঙ্গার মতো দু হাত দেখেছি রাখতে নিয়ে আর ঘরটাকে ভরিয়ে উঠেছি। বারবার বাবা এসে দেখে গেছেন।

সকালে যাবার বেলায় বাবা খোঁজ নিয়েছিলেন, ধীরে তখনও সাড়া দেয়নি। আমি ভাবনায় বিহ্বল হয়ে উঠেছি। কোনদিক কিছু ভাবতে পারছিলাম না। আর কিছু না ভেবে বাবাকে ডাকিয়ে ঘরে ঘরে উঠেছিলাম—তোমাদের তো অনেক আছে। তার থেকে কিছু না হয় আমাকে ভিক্ষা দিলে। আমার সবস্ব কিছু এরা ক'রে নেবে কিছু ভেবে?

বাবা যা বাবতে পারেন নি। ফোনে মাকেতাকে সাড়া পাঠাতে বলে তখনই আমাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে চলে এসেছিলেন। কারণদোষ সামনে তখন বাবার হাতের নামে 'ভিক্ষাপাত্র' ছিল আর 'আমার মুখের অন্ন' চাইছে। গাড়ি থেকে নেমে ছুটে একটা ভঁইলার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমি যে এমনভাবে আমাকে পরিত্রাণ করবে ভাবিনি। রাস্তার ধারের চওড়া কপাল বেয়ে রক্ত পড়ে তখনই ক'রে গেছে কালো মুখ। কোন কথা বলতে পারিনি আমি ওর বুকে লুটিয়ে পড়েছিলাম।

এইবার রাজাকে নার্সিং হোমে দিয়ে ফেলো। বাবার আগে ওর আর আমার বাবা-মা সকলেই ওর পাশে বসেছিলেন। ডাক্তারখানার ডাক্তার কিছুক্ষণের জন্য আমাকে সেরেছিলেন। আমি তখন ওর পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে আছি। রাজার মা আমাকে তুলে নিয়ে ওর সামনে বসিয়ে দিয়ে অন্য বাইরে গিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে রাজা কথা বলছিল। আমি হেসে আমার হাতটা ধরে ও বলেছিল—প্রিয়া, আমার মৃত্যি তোমার মনে কষ্টদায়ি রাখি যাবে আমি না, তবু থেকো ওদের জীবনে আমার মৃত্যি সমাজন হয়ে।

—তোমার মৃত্যিতে অন্যায় কোনদিন করি নি। তবে তোমার জন্য আমার জীবনটাই আমার জীবনের বড় ব্যথা।

—আর সুযোগ পাবো কি না জানি না, এটুকু বলতে

পারি এতক্ষণেই নিজের ঘরে পৌঁছে গেছি। সে তুমি ... ... আর তুমিই।

ডাক্তার এসে গেছিলেন। ওর এই শেষ কথা কি না আমি না।

ওরা সবাই চলে গেছে। চারিদিকে থমথমে ভাব। অধিকাংশ রোগী আজ চলে ওরা এমনিতে উৎসাহিত হয়ে ওঠা যাচ্ছে। ম্যানেজার বিকাশই হিসাপাট দিতে যাচ্ছে। সামনের বাড়িতে রাত্রে ডাক্তারকে ওরা নেওয়া বলেই প্রচার হয়ে। কিন্তু আমি বলতে পারি ডাক্তার আমাদের মধ্যে নিজের ডাক্তা আদর্শ পুরুষ এবং পুরুষের আদর্শ। আকাশের সবটাই নীলও, কিন্তু মাটি এমনও ছড়াই ছড়ানো। "ওরের জীবনে" ডাক্তার আদর্শ সত্যকার নয়ে। ওরের থেকে থেকে নেওয়া আছে, আর আমার জীবনে আমি কি দিতে পারব? ডাক্তার আদর্শ আছে, থাকবে। আমাকে সে চরিত্রই দিয়ে গেছে।

—আমার পথ আমি ঠিক করে নিয়েছি।

—x—

রোহিণী

শক্তি মিত্র

সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রোহিণীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রায়েই তার জীবনের সমাপ্তি ঘটিত হোল। অপমৃত্যু ঘটানো হোল রোহিণীর। বাঁচবার আকুতি, হোল করবার বাসনা থাকলেও রোহিণীকে বাঁচবার সুযোগ দেয়া হোল না। ঔপনিবেশ সমাজব্যবস্থা তখন সমাজ ব্যবস্থার সামান্য ভাবে শুধু রোহিণী নয়, রোহিণী শ্রেণীর সমস্ত নারী তাদের নারীত্বের উন্মাকালে, সমাজের কঠোর নৈতিক আদর্শে জীবনের কোরক অবস্থায় নব শিল্প অনায়াসে নিয়ে নীরবে অন্তর কোনে বসে চোখের জল ফেলেছে, কিন্তু বিদ্রোহ করতে পারে নি। যেখানে তারা বিদ্রোহ করেছে সেখানে তারা ধ্বংস সমাজ ব্যবস্থা ভাঙা হয়েছে সাহিত্যে।

সারা ঔনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সামাজিক বিধান হয়েছে বড়। মানুষের কামনা বাসনা—আকাঙ্খা হয়েছে অবহেলিত। নারীর নারীত্ব সামাজিক বিধানের ভারা হয়েছে বিধ্বস্ত। বিধবা নারীর প্রেম বা 'পুনর্বিবাহ' সমাজের ভারা হয়েছে বিদ্রুপ। যে নারী কোন ছেলে ছেলে সে বিধবা। শত সহস্র আচারের বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর, কিন্তু তার নারীত্বের প্রতি কারো দৃষ্টি নেই। সে যে নারী, তারও কামনা বাসনার মতীর এর প্রতি ঔনবিংশ শতাব্দীর সমাজ লক্ষ্য করেনি। নারীত্বের প্রতি চরম লাঞ্ছনা প্রদর্শন করা হয়েছে এই সময়কার সমাজ ব্যবস্থায়।

এই সামাজিক অত্যাচারকে এই শতাব্দীর বহু নারী সহজে মেনে নিতে পারে হয়েছে। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মতন সাহস বা সাহস তাদের ছিল না। তাদের জীবনেই প্রতিফলন পড়ে সাহিত্যে। তাই এই সময়কার সাহিত্যে আমরা দেখি সমাজের সঙ্গে নারীত্বের সংঘর্ষে লেখকেরা সমাজেরই পক্ষ নিয়েছে। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মতন সাহস তখন তাদের ছিল না। ফলে এই সময়কার সাহিত্যে নারীর হয়েছে লাঞ্ছিত, অবহেলিত। তাদের কামনা-বাসনাকে পদদলিত করা হয়েছে। তাদের চরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে।

বঙ্কিমও এই দোষ থেকে মুক্তি পায় নি। তাঁর রোহিণী চরিত্রের অস্বাভাবিক বিকাশ এবং অপমৃত্যুর জন্যে ঔনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। বঙ্কিম অনেকটা সমাজের দিকে তাকিয়েই এই চরিত্রটির অস্বাভাবিক পরিণতি ঘটান। তিনি নিশ্চয়ই রোহিণীকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু সেই উপলব্ধ সত্যকে তাঁকার করতে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চোর। কিন্তু বঙ্কিমের তখন সে সাহস ছিল না। তাই তিনি রোহিণীর জীবনের সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও এই চরিত্র কোনদিন তাকে মুখ দেখান না। বরং ধর্ম ভাবনায় ভিত্তে জীবন কাটিয়ে শেষ পরিণতি ঘটান যাতে সে জীবনের সবচেয়ে ভালোবাসার তার হাতেই তার মৃত্যু ঘটান। অথচ জীবনে শুধু অপমানই বোঝা নিয়ে বেড়ালো।

রোহিণীকে বঙ্কিম প্রকৃতির দান রূপে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রোহিণী কি সত্যই শুধু প্রকৃতির দান। তার অন্তরে কোন ভালোবাসার কি কোন স্থান ছিল না। যদি স্বীকার করা যায় রোহিণীর মধ্যে লালসার উত্তাপ ছিল বেশি, প্রেমের আস্বাদন ছিল কম; তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না নারীর কামনা প্রেমের জন্যে লালসা করেছে। রোহিণীকে বিচার করতে গেলে কি ঔনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থা। যদি রোহিণীকে বিচার করতে হয় তবে

নৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে বোধ হয় বিয়াট ক্ষতি হয়ে যেত। কিন্তু রোহিণী যাকে ভেবেছিলো বিত্তহীন প্রেমিক, আসলে তা নয়। সমস্ত ভালবাসার চেয়ে সম্পদের আশা সে করেছিলো। তাই সে গোবিন্দলালকে ছিনে ধরা করেছিলো। গোবিন্দলালকে ছিনে ধরার মুহূর্তের সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল নারীর ভালবাসা দিয়ে গোবিন্দলালকে বশ করতে। তার অন্তরে একদিনের বিলাসী আর বাইজীর অবস্থান হবে। তাই যেদিন হরলাল তার অন্তরের ভালবাসাকে জাগিয়ে দিয়েছিল, আর যেদিন গোবিন্দলালের সহানুভূতি পেয়ে মনে হোল রোহিণী এই দুদিনের জন্য বিয়াট বাজার হয়েছে। গোবিন্দলালকে পেয়ে রোহিণীর মনে শুধু একটুকু আশাই হয়েছিল তার অন্তরের অন্তর ভালবাসা গোবিন্দলালের প্রাণ তৃপ্ত হবে। তাই সে সমস্ত কলঙ্কের বোঝাকে মাথে নিয়ে সে গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রেমপুরে যাত্রা করে। এর পিছনে তার প্রবৃত্তি কাজ করেনি। কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর অন্তরের মুহূর্তের সৌন্দর্য মাখিয়ে সুখ পরে রোগের যাতনায় চুপিসার হতে চেয়েছিল। তাই গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিয়ে না করে পরিত্যাগে রেখে তার সৌন্দর্যের নারী সমাজে ভোগ করিল। রোহিণী তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তার বেরবার পথ তখন ছিল বন্ধ। তাই সে শুধু গোবিন্দলালের ভোগের উপাচার হয়েই দিন কাটিয়েছে। কিন্তু গোবিন্দলাল যদি বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়ে রোহিণীকে গ্রহণ করতে পারত তবে উভয়েই জীবনে এত বড় বিষাদময় পরিণতি ঘটত না। শুধু তাই নয়। রোহিণী চুরেছিল গোবিন্দলালের অন্তরে প্রবেশ; হারিয়ে রোহিণী। তাই সমস্ত ভালবাসার উপাচার গোবিন্দলালের পায়ে রোহিণী লাগিয়ে দিলেও গোবিন্দলাল তা সমস্তরের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারেনি, রোহিণী যে গোবিন্দলালের হৃদয়ের গভীর তটে আঘাত করতে পারে নি, একথা রোহিণীর মতন বুদ্ধিমতী নারী সহজেই বুঝতে পেরেছিল। তাই গোবিন্দলালকে ছিনে রোহিণী যে ছোট ঘরখানার স্বপ্ন করেছিল তা এক ঝটকায় ভেঙে পড়েছিল। যদি রোহিণীর নারীত্ব একটা মর্যাদায় পরিণতি হোত না যদি তার পূরণ ধর্ম বন্ধনের মধ্য দিয়ে রোহিণীকে গ্রহণ করত, তাহলে রোহিণীকে একটি প্রেমিকা আদর্শ গৃহিণীরূপে সে লাভ করতে পারত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থা রোহিণীকে তখনো দেয় নি তার আদর্শ লাভের অধিকার। তাই বার বে আজকে পুরে প্রেম হয়, রোহিণী সেই আজকের সম্পর্কে আসবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজ রোহিণীকে আসবার সুযোগ দেয় নি।

রোহিণীর বঞ্চিত নারী সত্তা বিয়ের কোন মূর্তি না থাকা সত্ত্বেও তাকে সব আচারের মধ্যে দিয়ে যাপন করতে হয়েছে। যেদিন সে ঘরের বাইরে উঁকি মেরেছে সেদিনই তার বিরুদ্ধে মুখ খোলা করতে লাগল। এই সমাজ রোহিণীর নারী সত্তাকে স্বীকার করে নি। এই সমাজেই চোখে পড়ে রোহিণী—গোবিন্দলাল পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে নি। এই সমাজের কীটদষ্ট ফলে গোবিন্দলাল রোহিণী চলাচলের অপেক্ষা করেছে। তাই যদি বিধবা রোহিণী ভালবাসাকে ছিনে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হোল। সুযোগ পেলে রোহিণীর যে নারীর পূর্ণতা সৌন্দর্যে বিকশিত হতে পারত, তার চরম পরিণতি ঘটল রোহিণীর ঘরবার বিরাট আকুতি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে।

সমাজ যদি রোহিণীর ভালবাসাকে স্বীকার করে নিত, তবে বোধ হয় রোহিণীর এই করুণময় পরিণতি ঘটত না। তবে রোহিণী সুখে সংসার করতে পারত। কিন্তু রোহিণী এবং গোবিন্দলালের মধ্যে সমাজের বিধান বিরাট ব্যবধানের কাজ করেছে। তাই উভয়েই জীবনে নেমে এসেছে করুণতম পরিণতি। রোহিণী মৃত্যুর মাধ্যমে আর গোবিন্দলাল বেঁচে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

রোহিণীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ তার যাদুময়ী-মূর্তি। যে হরলাল গোবিন্দলাল বিশ্বাসের ধনের প্রতি আসক্ত ছিল। হরলালের প্রতি কোন ভালবাসা তার ছিল না। হরলালে যেমন তার মনের সুপ্ত বাসনাকে জাগরিত করেছিল। হরলালের শুধু বুদ্ধিই দেখা করে

সে উইল চুরি করে নি। কারণ প্রথমে এই স্বর্গে সে রাজী হয় নি। কিন্তু যখন হরলাল রোহিণীকে উপহার দেবার পূর্বমুহূর্তে সরল মনে সে কথাটি রোহিণী রাজী হয়। মোটের উপর রোহিণী অন্তরে এই ভালোবাসার আদান প্রদান করে নি। হরলালে আন্তরিকতায় রোহিণীর অন্তরের শূন্য বাসনাকে ভালোবাসা দেবে ভরিয়ে তোলে। তাই সে ভেবেছে ভালবাসা, আর কিছু আকাঙ্ক্ষার কথা। সেই জন্যে সে প্রথমে হরলালকে ঘিরেই তার সুখের সংসার গড়বার আশা কিন্তু যখন জানল হরলাল তাকে বিয়ে করবে না; শুধু ভোগের আনন্দে তাকে ব্যবহার করতে চায় তখনই রোহিণী সরে যায়। হরলালের প্রতি ভালবাসার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু একটু যেন স্পর্শ লেগে যায় রোহিণী হরলালের মধ্যে।

কেবলমাত্র ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন হয় রোহিণী-গোবিন্দলালের মধ্যে। গোবিন্দলালকে দেখা মাত্র রোহিণীর প্রাণ মন যেন সমর্পিত হয় গোবিন্দলালের প্রতি। তার জন্যে রোহিণী কখনও ভাবি সংসার বিষয়ের কল্পনা করে নি। রোহিণীর যা কিছু সব সার ভালোবাসা তা সবটাই গোবিন্দলালকে দিয়েই। তাই বাস্তবে তাকে পেয়ে ঘরে ফিরেই পারে নি। রোহিণী ভেবেছিল গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিয়ে করে সুখে সংসার করবে।

কিন্তু যেদিন প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের সাহচর্যে এসে রোহিণী বুঝল গোবিন্দলাল রোহিণীকে কোনদিনই বিয়ে করবে না। শুধু রোহিণীর যৌবনকে কেন্দ্রেই গোবিন্দলাল ভোগ করতে চেয়েছে। তার অন্তরে রয়েছে অমর, বাহিরে শুধু ভোগ বিলাসের জন্যেই আসছে রোহিণী সেদিন মন ভেঙে গেছে। কিন্তু ঘরে ফেরবার পথ তখন রুদ্ধ। তাই রোহিণী অন্তরের সমস্ত বেদনাকে ঠেলে ফেলে প্রসাদপুরে থেকে গেল। আর দুদিনের বেদনার আঘাতে সে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে। রোহিণী যা চেয়েছে তার কিছুই পূর্ণ হয় না। অন্তরের অন্তরতা অন্তরাই হয়ে গেল। শুধু তাই নয় তাকে ঘিরে যখন তার একটা ভয় ঘনিয়ে আসছে। ঠিক সেই সময়ে বিশাকর দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রোহিণীর সেই সময়ে রোহিণী বাড়ীর ঘরে সন্ধেতে একটু উঁকি দিয়ে। তাই রোহিণী বিশাকর দাসের নির্জন গলায় সাক্ষাৎ করতে কোন দোষের ছিল না। কিন্তু রোহিণীর চরিত্রকে কালিমা লেপন করবার জন্যেই হয়ত এমন কতগুলো কথা লেখা হয় তার ফলে রোহিণী যেন বিশাকর দাসের প্রতি আসক্ত লেখা হয়।

রোহিণী যদি বিশাকর দাসের প্রতি আসক্ত হয়ত তবে দোষের নয়। জীবনে রোহিণীর পাওনার ঘর শূন্য। রোহিণীর জীবনের বার্থতার জন্যেই তার অন্তর্নিহিত ক্ষুধা হয়ত সে বিশাকর দাসের কাছে খুঁজে পেতে। হয়ত সে পেয়ে চেয়ে বসেছিল বিশাকর দাসকে ঘিরে সুখে সংসার পাতবে। যদি গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে সুখী হোতে পারত। যদি রোহিণীর সঙ্গে প্রসাদপুর বাসকালে গোবিন্দলালের অন্তরে আরও সহজের সৃষ্টি হোত। সহজাত ভালোবাসা আলিঙ্গনে যদি রোহিণীকে কাছে টেনে নিতে পারত তবে রোহিণী আর কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হোত? বিধবা রোহিণীর নারী অন্তর কাছে নারীর কামনা-বাসনা সঞ্চার করেছে, তাই সে বিস্মিত হয়ে তার হরলালকে চেয়েছে' যেখানে আশা করেছে শান্তির নীড়। সুখের সংসার। এইটুকু চাওয়াই ছিল বঞ্চিতা নারী রোহিণীর জীবনে সবচেয়ে বড় চাওয়া। শুধুমাত্র পুরুষের সঙ্গ কামনাই সে করে নি। কোন পুরুষ যদি বিবাহ বন্ধনের দ্বারা তাকে নিয়ে ঘর বসত হয়ত তাকে নিয়ে সুখী হতে পারত। কিন্তু তাকে নিয়ে পুরুষেরা শুধু খেলা করেছে, তার অন্তরের ব্যথাকে বুঝতে পারে নি, বা বুঝতে চায় নি। নারীর নারীত্ব হয়েছে লাঞ্ছিত। তার ঘর বাঁধবার স্বপ্ন বারেবারে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সমাজের সকল বাধা নিষেধ অবহেলা রোহিণীকে দোষী করে জীবনকে উপভোগ করতে দেয় নি। সব সময় যারা সুখ দুঃখ সুখে জীবনকে ভোগ করতে দিয়েছে আর তার জীবনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে কলঙ্কের বোঝা। এর জন্যে রোহিণী কতটুকু দায়ী।

অতুল সৌন্দর্যরাশি নিয়ে অন্তরে বিস্তৃতির বোধে সে বালবিধবা। স্বামী যে কি বস্তু তা বোঝবার আগেই স্বামীকে হারিয়েছে। সেই বিস্তৃত প্রায় স্বামীর স্মৃতিকে নিয়েই তাকে সহস্র আচারের মধ্যে জীবন কাটাতে হবে।

যদি একটু এদিক-ওদিক হয় তবে গর আজকের সাহসকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু তার বাইরে? যার জন্যে পরীক্ষার সাহসের বীজ লুকিয়ে রয়েছে সে কি তবে বাইরের বৈদিক সমাজে তপস্বিনী রূপে জীবন কাটাবে। উপনিষদ পরাজয়ের সমাজ এটা বুঝতে বাকি নি। তাই রোহিণীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু রোহিণী নয় রোহিণী মত নারীর তবে চালিয়ে দেওয়া হোল অন্ধকার খোলা।

সমাজ কোনদিন নারীর নারীত্বকে স্বীকার করে নি। তারা নারীকে আজন্মকালই বড় করে দেখেছে। যেখানে নারী ঘুমান পরে তার নারীত্বকে তুচ্ছ করেছে সেখানে সমাজ তাদের বাহবা দিয়েছে। কিন্তু যেখানে নারী আপন সহজ ধারায় জীবনে সুখী হতে চেয়েছে সেখানে সমাজ দিয়েছে বাধা। সমাজ রোহিণীকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। কিন্তু ভেবে দেখবে না কি অবস্থায় পড়ে রোহিণী এমন কাজ করেছে। নারীর জীবনে ভালবাসার স্থান কতটুকু তা সমাজ বিচার করে দেখতে পারবে না। যদি পারত তবে রোহিণীর জীবন ব্যর্থ হোত না। নারীর জীবনে যেমন নীতির স্থান রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীর জীবনে সহজ সরল বৃত্তি ভালবাসার স্থান। কেউ কোনদিন এড়িয়ে অস্বীকার করতে পারে নি। অস্বীকার করতে চাইলেও জীবনের ডাক যেত ফুরে। মানুষ হয়ে পড়ত একা একা। তেমনি নারীকে বিচার করতে হোলে দেখতে তার মনের পরিচয় অন্তরের বিকাশ। যে নারী চিরকাল বঞ্চিত হয়ে এসেছে যে নারী, দুটো ভোলে কথা বলবার সময় আদরমাখানো সাহসে সে নারীর জীবনকে অবহেলা দিন কাটাচ্ছে। রোহিণীর সমস্ত কামনা ফুড়ে যে বাস করছিল সে গোবিন্দলাল। গোবিন্দলালের ক্ষমা এখন কিছু সে দেখেছিল, যাকে নিয়ে সুখে ঘর করতে পারবে, কিন্তু গোবিন্দলাল তা হতে দেয় নি। এই যে গোবিন্দলাল অস্বীকার করল এর সমাজের চোখে পড়েছে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে গেল গ্রামান্তরে নির্জনবাসে গেল। সে কি পারত না ভ্রমরের পাশে রোহিণীকে রাখতে? না। তাদের গোবিন্দলালের কাছেও সমাজ একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। সমাজের সমাজ চোখে পড়ে তত অসহায় নর-নারী তাদের জীবনকে উপভোগ করতে বাধা হয়েছে। সমাজের বিশেষত্বে পড়ে তত না নারী তাদের সুখের ঘর জীবনকে বিষিয়ে দিয়ে।

রোহিণী এবং গোবিন্দলাল এরা নিজেদের কাছে যতটা বেশি দোষী, সমাজের কাছে তারা বেশি দোষী। গোবিন্দলাল যদিও কিছুটা সমাজকে স্বীকার করেছে, রোহিণী সমাজকে স্বীকার করে নি। সে তার নারীত্বকে বড় করে দেখেছে। নারীত্বের কাছে সমাজ হেরেছে। তারা যদিও সমাজে পুরো ভেঙে সমাজের কাছে 'ডেক' সমর্পণ করতে পারে নি। তাই সে সমাজের কাছে দোষী। কিন্তু নারীত্বের কাছে সে কি দোষী? যে জীবনে কিছুই পেল না। যার হাসির ছটা ফুলের পরশে মলিন, যার কাছে বাসী পৃথিবী একটা কথার ঘর, তার জীবনে কিসের আশা? যে জীবনকে ভোগ করতে চায় নি, চেয়েছে উপভোগ করতে। যে কাছকে চায় নি, চেয়েছে ছোঁকে। তাকে সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মে অস্বাভাবিক মৃত্যুমুখে বরণ করতে হোল। তারা এ না হলে সমাজের নীতির ভোগ পরাজয়। তাই রোহিণীকে অতি সহজে হত্যা করে গোবিন্দলাল সমাজের কাছে সেবারের মত নতি স্বীকার করে নেবে নিল সমাজের বিধানকে। সেদিন ভিন্ন মৃত্যু নীল রোহিণীকে দেখে আমাদের দুঃখ হয়। সমাজের অন্যায় অত্যাচারে তার প্রস্ফুটিত জীবন যৌবনটি সবচ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অসময়ে জীবনের তার ছেড়ে বিদায় নিল। তার আবদারের অধিকার কতটুকু ছিল তা জানি না। কিন্তু যে জীবন ভোর অত্যাচার শুধু কই পেয়ে গেল। তার জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলবার ভোর কেউ রইল না। এই হোল আমাদের সমাজ।

প্রতিফলন

—অমল রায় চৌধুরী

(বিভিন্নমতি বিভাগ—১ম বর্ষ)

(১)

: হ্যা—ধীরা এইখানে লাইটা ফেলব।

: আচ্ছা ঠিক আছে।

। দেখুন, যদি আমিন খাঁর দর্শটায় সময় আমাদের গুটিং আরম্ভ হয়ে, তাহলে আপনি তার আগে একটু আসবার চেষ্টা করুন—

"কৃষ্ণার দং" নামে প্রসাদ চিত্র প্রতিষ্ঠানের তরুণ থেকে যে নতুন ছবিটা উঠছে তারই পরিচালক অমলেন্দু ঘোষ এক গাল হেসে শেষের কথাটা চিত্রনের দিকে তাকাতে তাকাতে এই সব কথা বললেন আমাদের বিশ্বাস অভিনেত্রী রাত্রি গুপ্তাকে।

রাত্রি গুপ্তা ভাগ্যকে খাঁচকটাকে ঠিক করে নিচ্ছিলেন। আবার পরিচালক অমলেন্দু ঘোষ রাত্রিকে বললেন: তাহলে আমরা আজিমের সেটে গিয়েই আসছেন তো?

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাত্রি গুপ্তা বললেন: দেখুন সাড়ে সাতটায় আগে আমা আমার পক্ষে ইন্সপেক্সান।

—আচ্ছা ঠিক আছে। দেখুন এই ছবিটা আপনার একদমই নিজস্ব হচ্ছে। যদি ছবিটা হিট……

—দেখুন, অমলেন্দুবাবু আমি যা কন্ট্রাক্ট হইল অর্থাৎ ছবি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মোট হাজার টাকা আমার চাই।

—সে তো নিশ্চয়ই।

—নমস্কার।

হাত তুলে নমস্কার করেই রাত্রি গুপ্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। অমলেন্দু ঘোষও তার প্রতি নমস্কার জানালেন।

(২)

স্বাধীনতার একটু মোক্ষমের বাইরে বলেই হয়—শ্যাম নিরালা এক পল্লী—যেখানে রাতের আলোছায়া একলা মোলাটে চোখ মিলে অন্ধকারের মাতামাতি দিনে হারিয়েছে, সেখানে আলো-আর-আঁধারে দুইপাশ হয়ে উঠেছে রহস্যময়। এই পাড়াতে চিত্র সেরা ইডিওতে "কৃষ্ণার দং" এর সেট পড়েছে। জ্যোৎস্নারাতে এই ইডিও চিত্রলেখা। বিরাট বড় ও সুন্দর। ইডিওর গেটের সামনে একটা লাক্সারিয়াস লোভা গাড়িখানা এসে দাঁড়াল।

: নমস্কার মিঃ গুপ্তা আপনার জন্য আমরা একজন অপেক্ষা করছিলাম। পরিচালক অমলেন্দু ঘোষ বাস্তবে বললেন। অবশ্য সেটে ছেয়ে। একটি সুসজ্জিত ঘরের সেট। অন্য দিকে সুটিং ক্যামেরা তার আলো যাবে, লাইট ম্যান, ডিরেক্টর, লাইট ম্যান সবাই তাদের স্ব স্ব কাজে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন। অন্যদিকে অমলেন্দু ঘোষ রাত্রি গুপ্তা ও অজিতের চৌধুরীকে আসনে বসিয়ে চলেছেন। অমলেন্দু ঘোষের আসনটা মাঝে দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। এই ছবিতে নায়ক অজিতের চৌধুরী ও নায়িকা রাত্রি গুপ্তা। এদের দু'জনকে নিয়েই আজকের শট গ্রহণ করা হবে। নায়ক-নায়িকার উভয়ের মেকাপ নেয়া।

অমলেন্দু ঘোষ অজিতকে বললেন: আপনি একটু অন্তরোলাতি চোখের এক্সপ্রেসান মুখে আনবার চেষ্টা করবেন। এইবার অজিতের ও রাত্রি সেটের মধ্যে একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াবে। পরিচালক বলে উঠলেন—লাইট রেডি, ক্যামেরা ম্যান রেডি। সমস্ত শক্তি সমস্ত আলো জ্বলে উঠল। পরিচালক অমলেন্দু ঘোষ ক্যামেরা দিয়ে দু'জনের পজিসান দেখা শেষ রাত্রি গুপ্তাকে বললেন: মাডাম্ একটু ডান দিকে ঘুরুন।

ঐ···ঐ···ঠিক আছে। জোরে পরিচালক বন্ধুদের—অলরাইট, বিগিন।

শব্দেরা যান বাদ্যযন্ত্রের চোখ ফেলে দেখতে লাগলেন ও যাদেরা এগিয়ে নিয়ে এলেন। অভিনেতা অভিনেত্রী চৌধুরী ও অভিনেত্রী রাত্রি গুপ্তা যাদেরার সামনে এগিয়ে এলেন। তারপর শুরু হলো তারাদের:

: আমি স্বপন, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে না। তোমরা তোমরা - তারার চোখ ছিন্ন ছেড়ে পড়ে রাত্রি গুপ্তা। অভিনেতা চৌধুরী বলতে থাকে: ছিন্না তুমি আমার ভুল বুঝো না। আমার আপত্তি ·····

: ও, বুঝেছি তুমি এতদিন শুধু আমার সঙ্গে ভালবাসার ভান করেছো।

এদিকে যিনি ডিরেক্টর বসছেন, তিনি শুধু হাত না মুখ নেড়ে কথা না বলে অভিনেতা যান ও নাটকারকে কি সব বোঝাচ্ছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ ও নিস্তব্ধ।

তারই মধ্যে রাত্রি গুপ্তা বলে উঠলেন: কেন? কেন? তুমি আমাকে এত দিন ধরে কেন ঠকিয়েছিলে?

এমন সময় নীরবতার বুকচিরে পরিচালক অমলেন্দু ঘোষ বলে উঠলেন-কাট।

আবার পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রী চৌধুরীকে বললেন: আপনি এই চাবলের সময় যাতা নীচু করে, দুঃখের ভেলো ফুটিয়ে তুলবেন। মাঝে মাঝে একবার শুধু আবার দুটিতে চিন্তার দিকে তাকাবেন।

নাটক যাদেরা তালো নাটক বলে ঠিক করে নিলেন। বেরি বললেন পরিচালক। আবার আলো জ্বলে উঠল। যে যার কাজ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠল "বিগিনে" অপেক্ষায় চারিদিক নিস্তব্ধ থামি একবার পরিচালক অমলেন্দু ঘোষ বললেন: রাত্রি দেবী। আপনার ডায়ালগটাই আবার বলবেন। তারপর থামিকটা সময় নিস্তব্ধ। তারপর বিগিন্।

আবার সেই ছবির কাজ, রাত্রিদেবী বলে চললেন — কেন?···কেন?···তুমি আমাকে এত দিন ধরে কেন ঠকিয়েছিলে? উত্তর দাও?···তোমরা বড়লোক তাই টাকা-টাকেই শুধু বোঝ। মনীষ্ কেমন ভোরে দিন তুমি পরিচয় গৌরীকে দেখতে দেখাও। তারপর একদিন লাখি মেরে ফেলে দাও সেই রঙিন খড়কে

পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ীই অভিনয় পাঠ করে চলেছে। নাটকারেরা ফেলে ফেলে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সময় পরিচালক বন্ধুদের বাড়ি। আলো আরো আরো কমে এল।

তারপর নবদের প্রসাধনা রাত্রি মনে পড়তে লাগল রাত্রি গুপ্তার কথা। সবশেষে একবারে বলতে লাগলেন —অপূর্ব! অপূর্ব!

আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচালক অমলেন্দু ঘোষ এগিয়ে এসে গুপ্তাকে বললেন—জয়েন, ওয়েল মিস্ গুপ্তা। আই কাট কংগ্রাচুলেশান।

মিঃ অভিনেতা চৌধুরীও অভিনেত্রী রাত্রিগুপ্তাকে অভিনন্দন জানালেন। নির্দেশক ও সহ-পরিচালক— সুবীর নাথার ও তারক গুহ অমলেন্দু ঘোষকে বললেন: আপনার যা ধরি ছিল তার চেয়ে ভালো তুলে ছাড়লেন মিস্ গুপ্তা।

এত প্রশংসা শুনে না শুনে থাকতে পারলেন না, তাই—ঠোঁটের দু-পাশে একটু হাসি দিলেন রাত্রি।

তারপর মিস গুপ্তা সকলকে নমস্কার জানিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলেন, গাড়ীটা একবার অন্ধকারের বুকচিরে একবার ধোঁয়া ছেড়ে আর ঔজন চিত্রা স্টুডিও যাইয়ে। তারপর·····

গাড়ীতে এসে নিজের মেকআপ ভরে মুখের ও শরীরের রংগুলো তুললেন। তারপর গাড়ীটা বলতে নিলেন, রাইটস্যাও। ভরে চারদিকে ভাল ফ্লেসিং আয়নার দিকে চেয়ে নিজের মুখের প্রতিফলনটা দেখতে লাগলেন।

মেকআপ ভরে কেউ বেরি শুধু রাত্রি গুপ্তা। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন—একটা বেজে গেছে। বিদেশের আর ইউনিট মোবস্টারকে আকুল করে টেনে নিলেন। তারপর মনে মনে ভাবলেন বিদায় পরে ইউনিট, দেবা ঔজন, বিদায় দাদা দেবা।

আজকের রাত্রি গুপ্তা আর অভীতের সেই রাত্রি গুপ্তা। অনেক তফাৎ। ইউনিট মাত্র দেড় বছর।

মাঝে মাঝে চৈত্র রাত্রির পাখনা ঝরঝর করে ঝরে পড়ে রাত্রি ঘনায়। ঘুম্মুরুর ঘুরঘুরানো উঠিয়ে দিচ্ছে।

জমাট সেই ছেড়ে আসা বিকালের কথা।

সৌমিত্র তাড়াতাড়ি পাশ করে বিলের ছেড়ে দিয়ে সায়ের অন্ধকারে ঘিরে ধরল। আর তাদের বাড়ীর পাশে যাদের ঘরটা ঝিনঝলা থেকে ছোট্ট খেয়াত তাদের সরল এক সাধারণ মেয়ে রাত্রি ওরফে ঝিনঝলা বাড়ীর এক ছেলের ভালোবাসার পাত্রার পড়েছিল। তারপর মেয়েটা খেয়ার সাইবার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেছিল। পারল না? পারত না সে ছেলেটাকে ঘিরে পালিয়ে যেতে? এই তো পুরুষের কৌশল?

আজ যদি সৌমিত্র আসে—না……না……সে আজ গাড়িওয়ান অধিকারী রাত্রি ওরফে—ঝিনঝল রাত্রি ওরফে। আজ সে লক্ষ……লক্ষ টাকার মালিক। কি সে আসবে ফেরে? তার সম্পত্তি জীবন ঘুরে আটাচ্ছে। আহ…একটা ছেলেকে ফেলে দিয়েছে অনেক নীচে।

দক্ষিণ দিকে একবার তাকাল রাত্রি ওরফে।

খেয়াল ঘাটে আসাইটা। বাইরেটা নিশুপ। আলকোহলিক ঝিরঝিরানো জলটা জমেছে। রাত্রিকে আসে সে ডাক দেবে। কিন্তু এখন রাত্রির অন্তরাত্মা তার বড় বড় অভীতের চিন্তা জমাট বাঁধে মাথায়—এই রাত্রিকে। যাই হউক ফেলে রাত্রি আসার ঘরে।

রাত্রিনি বাবা মোম নিয়ে বিছানায় ছিল। তারপর ঘরে ঢুকে পড়েছিল রাত্রি। বাবাকে দেখাশোনা করেছিল। আর ঔষধপত্র ঘরে টাকা রোজগার করেছিল। বাবা মারা গেছেন। ছোট্ট ঝিনঝলা ঘরে-আসেছাতে রেখেছিল। তারপর মোম এল পৃথিবী অধিনায় করার। মোম কিছু না ছেবে রেখে গেছিল ঝিনঝলা-টাকার মালিক।

মেয়ের মায়াদ মেয়েই ছিনিয়া নিয়েছে। প্রথম বইয়ের নাম করল রাত্রি। সর্বের অনুষ্ঠান প্রথমে হয়েছে। তারপর ধরে ধরে ঝিরঝিরানো আসে তার নাম।

বাবা মারার আগের সে একদিন অধিকারী রাত্রি ওরফে পরিচয় দল। বাড়ী হল, বাড়ী হল, ঘরের-বাইর…… সবই হল। কিন্তু যৌবনের ক্ষুধা মিটল না। সেই দুর্বিষহ ক্ষুধ-ক্ষণে যার যার অন্ত বিক্ষত হয়েছিল।

এখন সব বিষাদিত সৌমিত্রের সঙ্গে দুর্বারাজনে দেখা হয়েছিল এক পার্টিতে। সৌমিত্র বলেছিল: ক্ষমা কর রাত্রি। মোমাহ……

: তুমি আমাকে অপমান করতে চাও?

জলে বেরিয়ে গিয়েছিল রাত্রি। চোখ ভুল আর অবসন্ন মন নিয়ে শুয়ে পড়েছিল এসে।

আর মোম নিয়ে দেখা হয়নি দু'জনের। আজ দুটি সুখের বাক ভিন দুটিতে।

আবার একটা ঘটতির যৌবন চারদের অধিকারী রাত্রি ওরফে। ঘরের আলো নিভিয়ে। নীল। মেঘ চারিদিক থেকে ঘিরে উঠছে নিচ্ছে। যে ঘিরে জলে যায় সমস্ত জীবন। আসে মাঝে চারদের অধিকারী।

একজন বেয়ারা এসে বলল: ডিনিয়ি খেতে যা?

চুপচাপ আজ বেশনে উঠল যে: খোম একটু পরে নিয়ে চলো। খোম ঘরের বেয়ারার উপর রাগ করে উঠল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে নীল আলোটা নীচে গেল। অন্ধকার…… অন্ধকারের সেই নামল ঘরে। আকাশে কালোমেঘ ঝিঁঝিঁ ঘরে ঝড় শুরু হয়ে আসছে, ঝিনঝল করছে। কিন্তু অনেক পাশে যাবে রাত্রি ওরফে সৌমিত্র চৌধুরী।

—x—

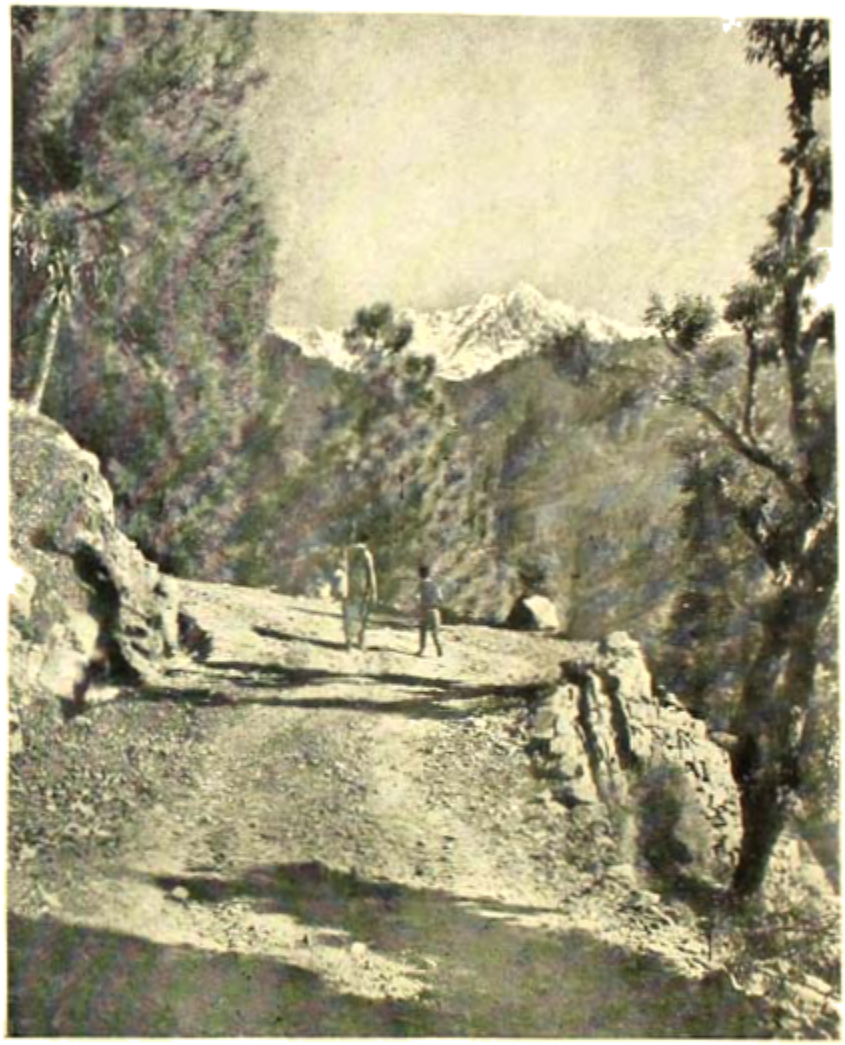

'In Tune with the Infinite'

Photograph : Dr. BIRESWAR BANERJEE, M. A., D. Lit.

(Lecturer in Dept. of Geography, C. U.)

THE UNIVERSITY STUDENTS' UNION, CALCUTTA

ASUTOSH BUILDING

CALCUTTA

Ref. No.....

Date 2/11/67

Vice Chancellor
Calcutta University

2/11/67

B. Malik

9th Nov. 1967

"FOR EVER YOUNG FOR EVER BRIGHT"

Narayan Chandra Rungk

Born : 29. 4. 43 Died 30 09, 67.

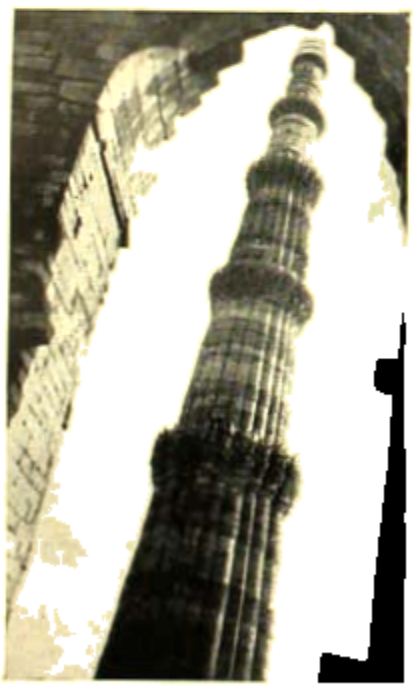

On being asked to play

Pradip Ghosh
Ist Year/English

I cannot take part in this drama :
Wavering, besides deep reluctance—
I forsake this fair chance.
I forget the speeches—the stop and the comma.

Metamorphosis

Utpal Chaudhuri
Ist Year, M.A. English

The cat sprawled on the table
Lazy-licking her brindled tail.
Come kitten, her dugs assail,
The scholar uncorked a phial.

Of red anti-soporific pills.
Opened at hand are Freud, Tagore and Marx.
The capitalists are a pack of sharks.
He thought of the love in Marabar hills.

"It is so late you have come."
"Yes, papa didn't let me go.
Water, rain—said he—is cat's foe
And made me stay at home.
But I have come tripping over creeks and bricks and trills,
From wormhood, through felinity, to meet you in Marabar hills."

Here we go

Dipti Chakravorty
2nd Year, English

Here we go round the prickly pear
Go round the prickly pear
Panting and pos-ing, crawling and craving
Some muttered words.....
You know there are some who always start
But in the vacuum perhaps reach nowhere.
Because
Here's dark and here's smog
And the corridor of Varsity stretches like a meaningless
Laughter.
Look! how under the first drizzle of the New Year
Earth grows old, with a necromancer's spell
Sun looks haggard and void
Air blows like a ghost breathing hot
And thunder roars silently all over the sky
Da, Da, Da.....
Only then you can feel
Life's a lurid explanation you explain
And can not explain
A huge vain cry, cry for the manna and
Death, oh death is the sad kingdom
Lost forever to the sacrilegious ghosts.
We, the georgics jousting on horseback, happily
Go round the prickly pear
Go round the prickly pear
Never touching the centre, alas!
Only with a shifted yawn
We dream the coffee-houses with young
Excited smokers beaming like new shoes
And gay, green smell of coffee-pots
Lights breaking through purses—bringing
A jejune shadow on the epileptic lips.
Suddenly you realise

Here is no Life
And no Death
no Smog
And no Sun . . . . . .
Here we, the bastards of God
Go round the prickly pear
Go round the prickly pear
Carrying life within us
Yet not Living
Kicking stones of the Varsity-lawn in Sun
Yet no light within
Hunching in the coffee-houses with a match-box of Atom
Yet not exploding.
Life, like a fetus, is, in the womb
Growing up always, with every stroke of hour
Yet can never be bred
For in the Gardens of Aesperides poppies are burning . . . . . .
For in the ghoulish dark corridors Vietnam vomits blood . . . .
While with a namby-pamby smile
You gently crush flowers in mellow fingers
Like a wanton God.

Love is a Stupid, Stupid Thing'

Bharati Roychowdhuri
Ist Year, English

Love is dealt only by a fool—
Men are so very cool,
Incapable of perceiving true love!—
Yes, I am a broken-heart, by Jove!
And it is the working of that rascal cupid
Who misleads the poor girls so stupid!
I want to warn poor girls like me from blunder,
And save them from false men who want to plunder.
Come on, be brave girls, and forget your lovers,
Do without men with false hearts under covers.
Bid farewell to Love and say.—
"See me no more you fool, go away".

Some stray thoughts on "The Tyger"

Anup Kumar Mukherjee
2nd Year M.A. (English)

An off-putting title—and I am aware of it. One of the main difficulties in coming to Blake's poetry is not to know where to focus attention. So formidable a mass of exegesis and comment has accumulated during the last generation, that on first approaching the poetry the reader is liable to feel baffled.

But why of all poems the Tyger? one might ask. To this I can say that The Tyger in miniature seems to illustrate the remoter significance that Blake's writing can be shown to possess. The world of this poem is typically Blake's symbolical world. The Tyger does not stand in the forests in the night. The forests belong to the night, the forces of darkness, the dream world of Albion. The tiger burns, suggesting simultaneously, in the words of Harold Adams,[1] "three visual images: the eyes of the tiger piercing through darkness like those of any cat; the tiger seen in the mind's eye in a glow of light, typical of symbolical religious art where the main figure seems to emerge from some vast, Supernatural glow: and the stripes of the tiger visualized as shooting flames, symbolical in Blake's painting of action, energy, purifying violence."

The tiger is a construction of the human imagination, a symbol, and Blake asks "what immortal hand or eye" is capable of shaping such a form? The eye in Blake's thought is a shaping force symbolising imagination; the preliminary answer to the question of the poem is that man himself shapes what he sees by means of his own powers of mental creation. But man, if he has created the tiger, is more than man as we usually we think of him. If man's imagination has created the tiger, who has Created the Imagination? It is at this point that yeats, dramatising mystery, might have ended his poem "Where got I that truth?" But Blake goes on to resolve the contraries. Does such a creature, he asks, come from "distant depths" from some hell or under world, from some hidden subconscious recess? or does it come from the skies, from heaven, from somewhere out in space? Is there in the tiger's eyes some form of immediate truth, or is it a horrific image out of a collective unconscious "the bright sculptures of Los's Halls"?

Blake asks what symbolical wings the person who created the tiger used in order to "aspire to this terrible and violent understanding which the tiger itself signifies. Here he invokes by image a host of mythological heroes. He who seized the fire is, of course, Prometheus, who brings knowledge to man; and the tiger represents such knowledge or revelation. From stanzas three and four we learn that the creator and aspirant is evidently a blacksmith.

And in stanza five, two obscure lines recall Blake's myth of the "Wars of Eden" which he calls the fall. When the wars ended, did this creator smile upon his work? The Creator referred to in this stanza is surely God, and we begin to see that the creation of the tiger, like Los's attempts to solidify and formalize the natural world, is a movement towards Apocalypse, that the blacksmith of "The Tyger" is equivalent

1. Harold Adams—Blake.

to the Los of the prophetic books, and that both God and man are really one, just as the tiger and the lamb are really one in the world of eternity.

"It is the Los in man -the worker, the artisan, the imaginative power -that is capable of creating even in the delusory fallen world images like the tiger on the anvil of intuition. He creates an ideational reality where things may be seen as they really are. He is fallen man's conception of God working in this world."

So far so good. Moreover the tiger is itself a mirror of man in his fallen state. He lives in a forest of darkness, a womb of nature. His identification and confrontation by Blake and Los is his symbolical leaf from the forest in the light of day. In the Prophetic books Blake says of man that he hides in the forests, and of the Eighth Eye of God that "he came not, he hid in Albino's Forests," when he is seen for what he is, he emerge into truth. To quote Adam's[2] "The eye which frames the tiger is also the Eighth Eye of God—the symbol of Apocalypse, the symbol of man's visionary powers.

Blake's poem is a series of real questions only in a limited sense. If we take "The Tyger" as a poem spoken by a horrified writer the questions betray urizen's delusions. To urizen, the Apocalypse must be frightening and mysterious. Actually the answers to his questions are implicit in the formulations of the questions themselves. To the visionary, the poem is really a series of answers embodying Blake's whole Apocalphyric creed in one momentary experience. In it the poet strikes a note of visionary frenzy and self-confidence. He, like Los facing Rahab, does not shrink from the task of confronting the terrifying delusion. In a letter Blake once wrote "I have travel'd thro' Perils and darkness not unlike a champion. I have conquer'd and shall go on conquering. Nothing can withstand the fury of my course among the stars of God and in the Abysses of the Accuser."[3]

The tiger stands as an image of Apocalyptic light in a world of darkness; and although it is an awful light, it is the kind of light necessary in the battle with the forces of darkness, a light of energy and righteous wrath to be confronted without fear and even with a paradoxical joy.

The commentators, however, each following up the allusions and associations that mean most to him, elaborate far beyond the poem. In the thought-movements, critics hold, The Tyger shows strong affinity with Yeats's "Second Coming" with all respect to them I might be said that there is an important difference. In Yeats's poem "the blood-dimmed tide is loosed" but not for any final battle, merely for the beginning of a new wheel. And though Yeats's poem suggests significant vision, that vision is strongly limited by the questioning of the poem's conclusion. Blake's major prophetic lyric, "The Tyger" ends with a question too, but that question is peculiarly rhetorical, the poem having provided the answer.

Be that as it may, a poem was to Blake, as it is to C. Day Lewis "a total image," microcosm of another image, the world. This image cannot be "expressed in general propositions". As Northop Frye has written of Blake, "The units of poetry are images rather than ideas, and a poem's total meaning is therefore a total image, a single visualizable picture."[4]

---

2. Hazard Adams—Blake.
3. Letter to Thomas Butt (Nov. 22, 1802).
4. Poetry and Design in William Blake "Journal of Aesthetics and Art Criticism. (Sept. 1951).

The Indian intellectual Scene : A Post-Mortem

Jyotirmay Ghosh
English 2nd Year

At the outset, the British-cum-European Cultural current was a releasing force breaking the fetters of the still lingering medieval feudal bent of thinking and approach to the arts. But the 19th century apostles of arts and literature were successful to absorb the European knowledge and culture wedded to the grand Indian inheritance. Bankimchandra's soul was enlivened with Shakespeare and nourished by comte. But it was a deliberate attempt to link up Shakespeare with Kalidasa when he compares and contrasts Desdemona and Miranda with Sakuntala. Michael Madhusudan was the first martyr to the aspiration of assimilating the total legacy of classical European poetry in his adventures of poetic performances. The obscene and obsolete tradition of Bharatchandra and 'Kabiallas' could not be broken by any other means other than Madhusudan's laborious study of Homer, Virgil, Tasso, Dante, Milton and other classical masters of Europe. They supplied him with the solid slabs of concrete replacing the easily-breakable clay-materials to erect the grand sepulchre for Meghnada and Ravana. What does Tagore mean is obviously suggested by making Gora, the hero, an Irishman symbolizing the spiritual heritage of Europe being brought up his foster-mother Anandamayee, the image of Mother India and ultimately being engaged with Sucharita, standing for India the Daughter. [Vivekananda has warned us time and again against the danger of blind copying of European biases and prejudices of signs of progress. What they preached, they practised successfully.]

In the socio-religious reform of Rammohun, Vidyasagar and Vivekananda we saw them inspired and enlightened as much by European ideas of humanism as by the great Indian Upanishadic-Vedantic thoughts. And not to speak of the Visva-Bharati, where in the inner recesses of Tagore's creative activity, this example of absorbing, assimilating and wonderfully making his own of the cream of the romantic school of poetic art and poetic philosophy, is to be found. He drew deep from the Vaishnava Padavalis, Kalidasa and the Upanishads as much as from Shelley, Keats and Wordsworth. The spirit of nationalism, apart from all other indigenous sources, owed its origin, if indirectly, to the gospels of French Revolution and the liberation movements in Ireland, Italy and from British bourgeois liberalism. In the broadest sense, the European cultural currents via British colonialistic refinery did to a great extent the same thing as the revival of Greco-Roman culture did to Renaissance Italy and other European countries of the period.

That was a formative phase and in that phase beneficial, healthy types of learn, and dependence were no faults, that was essential But now we claim to reach maturity in the cultivation of knowledge and arts. Is it true? The whole academic studies in philosophy, arts and sciences seem to be almost entirely derivative rather than original. With deepest respect to Vivekananda and Aurobindo and Radhakrishnan it must be stated that they can claim no such originality in philosophical outlook as is to be found in Marx, Hegel, Kant or Even in

Bergson, Bertrand Russel and Sartre. What they have performed in strictly speaking the traditional Hindu view of life and doctrines of the six great philosophical schools revivified and revived. In the spheres of Political economy sociology psychology and similar subjects we can names not a single individual who has contributed to the basic theoretical foundation of the sciences. After the great Sanskrit rhetoricians ('Alankarik' as) our widely learned intellectuals, D.Litts and D.Phils only echoed and quoted Plato, Aristotle, Longinus, Croce and Aristotle without daring to all anything new and original to that sphere. Nakedly speaking, in the sphere of sciences we have remained as stationary as in the age of bullock-carts, while the rest of Europe and America is developing at a speed of rockets.

This derivativeness, lack of originality have turned us tutelage to the European fashions and fanaticisms in the sphere of arts and literature. No new idea no new movement in the field of arts and philosophy has been initiated by Indian thinkers, intellectuals and artists for a pretty, long, long time. Any 'ism' in philosophy (creative evolution, existencialism and other diverse manifestations of rotten bourgeois idealism), in arts and literature (expressionism, cubism, surrealism, abstract art, 'Beat'-'Beatle'-'Hipi'-ism) all had their start sometime and somewhere in Europe. When they became pale, anaemic and faded, they are imported to India, we are intoxicated with these 'isms' and ideas. We, the so-called Indian intellectuals are excellent customers in the second-hand market of Euro-American culture. And the so-called learned professors, now and then visiting America are the hawkers of bourgeois decadence in the name of culture. This may sound somewhat slanderous. But fact is fact and truth is truth. The few possible exception prove the law itself. No we are no narrow minded parochialists or blind nationalists of the 'my country right or wrong' category. Our appeal is for initiating new ideas and movements in the fields of arts, aesthetics and sciences. We are against only the chewing of loan-words: we except to see some Indian intellectual chocolates being sucked by our benevolent Anglo-American donors. What we can and should give to them is not various types of intoxicating ingredients, 'Kamasutrya' and Mahesh Yogi: but something deeper and enduring to them and to the rest of the humanity. It is self-complacently advertised that Europe and America has lost or on the way of losing her soul. Nevertheless, she has a graceful vigorous, lighting and creative body. We by losing the physical vitality and vigour have lost beauty also. And we are taking for our supposed vedic and eternal, amidst the ugly share-marketeering of M.L.As. It is nothing but pure and simple 'Maya'.—'No person lacking in vitality will attain this soul' ('नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः')

Why this stationariness, parasiticality and derivativeness? Is it for that we are lacking in genius and talents? Is it true that Europeans suffer from the incurable disease of superiority complex and unwilling to recognize oriental genius? All of these may be partially true. But the real lies deeper into the deep-delved earth of economic-political structure of modern Indian state and society. Though we have won formal political freedom we have failed to attain economic independence. On the contrary, we are surrendering more and more to the neo-colonialists of America in the name of aids and assistances. Three five-year plans have failed miserably to regenerate the national economy of our country. The great Nehru legacy of mixed-economy is a hoax and non-alignment is a hybrid: The material base being such the superstructure of socio-educational-cultural system can be nothing but hotch-potch.

And finally since our ruling class is at least formally committed to democracy and socialism, it is recommendable that we should borrow less and less from the formal aesthetics of Croce and Eliot and I. A. Richards, and from the bour-

gross idealism in some form or other of the existentialists or pragmatists. We must strengthen our ties with the cultural-educational experiments and achievements in Soviet Russia, China, the East European countries and the newly-freed Afro-Asian countries. From the form-centric aesthetics of decaying bourgeois culture of the west, we must shift, the sooner the better, to the life-giving, animating content-based guidlines of socialist realism and revolutionary romanticism.

But keeping this socio-economic set-up intact all these attempts can not be fully realized. So simultaneously a new order of life is to be sought by hastening the Great Indian Revolution. And thereafter, with the emancipation of human creativity from all back-slides the real cultural revolution is to be brought about ushering in a new socialist civilization, independent, original, though at the same time perfectly in line with the great cultural inheritance of mankind.

Thoughts of Death in English Poetry

[redacted]
Ist Year, M.A., English

I

Death is the golden key that opens the path of eternity.—Milton

Death has often been sung in many a beautiful rhyme and poets and thinkers have realised the eternal bliss in the luxurious thought of death. Life has ever revealed to them a sense of mystery and so has the death itself in which life is finally realized and which draws the curtain over the colourful pageant of human drama relentlessly rolling on in the stage of life. We do not know what death is like. No one haunts again after death his left abode in flesh and blood or steals away from his world of Death into a dark wintry night to see his dear and near ones. The ghosts in "Hamlet", "Julius Caesar", "Macbeth" and "Richard III" appear on the stage but we are sorry they do never give a picture of it. Is it after death to sink into a final repose and to forget the troubled dream of life when no sound shall ever pierce through to disturb our last repose? We wonder if it is beautiful. Poets have idealized it but we are afraid of death as ever.

Death to our mind is something dread, horrible and awe-inspiring. It suggests the drop of our vital life, the complete isolation of our existence from this dream-like beautiful world. It smacks youth, fancies and dreams. Beauty flattens dies and dies at its grip hold. "The light that lies in woman's eyes" escapes at its cold touch and her eyelids close like petals of a dry withered flower never to open again. The silken tie of love breaks down and she is wrested away from her dear beloved. W. B. Yeats sounds fairly true to his poem "Under Ben Bulben",

Whether man die in his bed
Or the rifle knocks him dead,
A brief parting from those dear
Is the worst man has to fear.

II

How blissful an idea it would have been if all the blessed damsels after their death would have been sent into heaven and with a nostalgia look down the earth for the beloved with their long yellow hair like ripe corn laying along their back! But it is rather a fantastic fanciful idea. D. G. Rossetti's sister C. G. Rossetti evokes in her songs of death a reverse gloomy contemplative mood. In the sonnet "Remember" she suggests in a depressing tone that after death she would go far away into the silent land and yet how fondly she desires her beloved to remember her.

Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

In her wonderful "Song" which is more or less a counterpart to the former sonnet we are again told that after death she will never perhaps 'see the shadows', 'fell the rain', or hear the sweet nightingale chant her voice in melody.

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me,

Plant thou no roses at my head
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dew drops wet:
And if thou will, remember,
And if thou will, forget,
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember
And haply may forget.

The prevailing tone in the poem is one of sadness mingled with a gayful sportive fancy and we can hear a soft tender voice of a mournful lady who foresees death as if dissociating herself from the sweet association of her beloved and from all the beautiful things in the world of nature as well. These all songs of melancholy and death are intimately connected with a love for James Collison which remained all through her life unrevealed and unfruitful. But her genuine love for him becomes wonderfully pronounced as her thought in the former sonnet shifts a change in "Song". How affectionately now she tells him to forget her for, by simply remembering her after death, he may be threatened by a cloud of sadness for ever. Christina Rossetti's idea of death is again not idealized in a Wordsworthian vein, nor it has anything to do with the realisation of something of a "life after death"; but more it is a link in the chain of thought of a Keatsian or Shelleyan fanciful contemplation of death. It is rather an intermediate state between sleeping and waking, a half-conscious mood in which all memories are dim and even the strongest affections fade into faint shadows. Are not these lines couched in a half-sleeping and half-dreaming vein?

I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain;
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,

Or, did not Keats speak in the same vein in his famous nightingale ode?

Still wouldst thou sing and I have ears in vain—
To thy high requiem become a sod.

Or, did not Shelley contemplate in the same mood, though the thought here is more elaborate, sustained and effective?

Till death death like sleep might steal on me,
And I might feel in the warm air
My cheek grow cold and hear the sea
Breathe o'er my dying brain its last monotony.

III

Many exquisitely beautiful pieces of poetry in the romantic period are characterized by an occasional yearning for death. Wordsworth characteristically idealizes it in many of his poems. After the sad death of his dearest wife he realizes the mystery of death. Death has wrested her away from his bosom, he is overwhelmed with grief. But he has conceived the eternal truth that her soul remains immortal and invulnerable though her physical body suffers a death and annihilation.

She seem's a thing that could not feel
The touch of earthly years.
No motion has she now, no force;
She neither hears nor sees;
Roll'd round in earth's diurnal course
With rocks, and stones and trees.

The poet in his fond love of nature experiences that in all the tiny objects—'with rocks, and stones and trees' she has divinely mingled and become one and inseparable. The sudden death of his brother casts a very shocking blow on the heart of the poet and this experience for him is 'too deep for tears'. Wordsworth explores in the midst of air, meadow, grove and stream 'a still sad music of humanity' and he can now see a dark gloomy touch of mortality hanging heavy over all the beautiful spectacles of nature. The clouds sailing stately in the far-off blue sky

or circling round the setting sun would hold once before the dreamy eyes of the poet a spectacle of many-fold colours and a many tangled beauty, a happy gleaming association of 'purple' and 'gold' but now he finds in them the gloomy poetry of death.

The clouds that gather round the
setting sun
Do take a sober colouring from
an eye
That hath kept watch o'er man's
mortality;

IV

Shelley who is a born revolutionary and whose mind was ever overhung with wonderful dreams exhibits in many of his poetry a spiritual significance of death. Life and death are twin entities both to be realised in Man and Nature as well. In his "Ode to the West Wind" death is the symbol of a perfect regeneration and the wild west wind that drives and scatters the dead, withered, yellow, pale leaves into the dark grave of earth to quicken them with a new birth so that they can overwhelm with living hues and colours plain and hill, becomes at once a symbol of Destroyer and Preserver.

O, wind,
If winter comes, can Spring be far behind!

This trend of thought linked so long with Nature gets a sudden turn to the poet himself and as in the visible world so in the poet's soul he feels a strong similar impact of the west wind. His dead withered thoughts like inert ineffectual leaves may renovate the world and bring about an Utopia.

Gifted with an animal vivacity like his own west wind, revolutionary in spirit and bitterly opposed to the existing order of society, Shelley conceived that the whole world had no sympathy for him. In "Ode to Dejection near Naples" he tells us that he has 'nor hope, nor health, nor peace nor calm around'. To him "that cup has been dealt in another measure". The poet's mind for the time being is out of tune in the happy midst of the beautiful sights and sound of nature in the Bay of Naples. He feels very lonely and is seized by a sad yearning for death to put an end to all miseries on earth.

I could lie down like a tired child,
And weep away the life of care
Which I have borne, and yet must bear

V

Poetry of death and melancholy is very frequent in romantic age and perhaps no poet more than Keats ever indulged so much in 'the luxury of death'. His "Ode to a Nightingale" is a hymn of mortality. The opening four lines describe sensation analogous to death. In the first line the poet feels an acute pain in his heart but in the succeeding lines he brings a set of shifting moods in experience. He feels a numbness in sensation, he is dead and again he is not only dead but forgotten of all his previous existence in the world.

My heart aches, and a drowsy numb-
ness pains
My sense, as though of hemlock I had
drunk,
Or emptied some dull opiate to the
drains
One minute past, and Lethe-wards had
sunk:

From this dim vast vale of tears the poet makes an excursion into an elfin world of romance suggested by the Nightingale, a light-winged creature that enjoy an unalloyed pleasure in an ever green world. It is an ecstatic innocent Adamic world of eternal bliss and its charm is doubly enhanced by the intoxicating perfume of flowers and the ecstatic song of the Nightingale. The poet now feels the highest blissful mood in his life and to perpetuate it on for ever he is luxuriously seized by a happy yearning for death.

Now more than ever seems it rich to
die,
To cease upon the midnight with no
pain,

While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!

But soon Keat's mind suffers an oscillation and shifts a sudden change in mood as the association of death leaves a strong impact on him to idealize the bird. The song-bird will die but the bird-song will never. The poet begins to look upon the bird not as an individual one, but as an ideal type of all times. He will once lie dead on the ground but the bird will go on singing as usual over the grave of the poet. The poet will not be able to listen to its dirge-like song, having been as deaf to it as the turf of the earth.

Still wouldst thou sing, and I have ears in vain
To thy high requiem become a sod.

The longing for death in romantic poets has always a significant meaning as it is very much the immediate means of escape into a mysterious blissful romantic world where Youth and Beauty remain innocent and invulnerable. It, therefore does not mean an extinction of the poet from the existent world but rather an imaginative process or a view point of escape or complete detachment from the miserable world and to get himself completely dissolved into a blissful Adam's abode which otherwise is impossible. It is a dreamy death in waking state. And Keats here is only 'half in love with easeful death' for, a total death, he is afraid, may well bring for him an extinction from the universe.

I have been half in love with easeful death

and the other half of the poet's self is completely aware of the miseries, pains and sufferings which as a man he has a part to bear.

VI

Now let us come to the great victorian poets, Browning and Tennyson whose poetry of death always indicates a spiritual significance. Browning suggests that man's death in the world sings the marches of a new perfect life afterwards.

The last of life for which the first made:

Here we have a Browning who is primarily a thinker of life not a passionate singer of love and youth, nor the painter of subtle emotions in life. How beautiful yet touching is the picture of death of a woman strangled by her own deranged lover who claims that she dies, as if, a painless cheerful death. She fades on the earth like a soft tender rose; or, she rests on the dewy earth 'as a shut bud that holds a bee'.

No pain felt she:
I am quite sure she felt no pain.
As a shut bud that holds a bee,
I warily oped her lids: again
Laughed the blue eyes without stain.
And I untightened next the tress
About her neck: her cheek once more
Blushed bright beneath my burning kiss:
I propped her head up as before,
Only, this time my shoulder bore
Her head, which droops upon it still:
The smiling rosy little head,
So glad it has its utmost will,
That all it scorned at once is fled,
And I, its love, am gained instead!
Porphyria's love: she guessed not how
Her darling one wish would be heard.

It is the poetry of highest excellence which reminds us of a Shakespearean art. These lines are touched to their finest issues, having in them a beauty of soft emotion that primarily strikes the sensitive chord of a reader's soul. We have again an exquisite vivid pictorial impression of a dead woman resting her drooping head over her deranged lover's shoulder.

VII

There are some obvious traces of the cheerless gloomy aspect of life in Tennyson's earlier poems. But immediately afterwards his later poetry shifts a change from the idea of death to a life-after-death contemplation. In this "In Memorium" this essential idea of an after-life which sounds rather metaphysical can be clearly noticed.

My own dim life should teach me this,
That life shall live for ever more
Else earth is darkness at the core,
And dust and ashes and all that is.

Tennyson suggests that death is the end of physical existence but like his contemporary Browning, he feels at the same time that life would be meaningless, ignoble and intolerable if there is no immortality of soul.

VIII

A sense of weariness and frequently a death-wish are derived by W. B. Yeats in some of his early poems and readers may have the impression of reading the works of an old poet, grown wearied (and marching towards death) by the cheerless toil of the age. They are at times marked by subdued atmospheric effect of colour and music. His sense of weariness draws him into a desire for death and we have a Yeats essentially romantist and escapist at heart. The poet's frustration in love has lent a very tender and pathetic utterance to many of his lyrical pieces. In "He wishes his beloved were dead", he fondly desires his beloved 'lying cold and dead' when his previous cruel heart will be lulled to silence and the poet will lay his head on her soft bosom to perpetuate the spiritual love for ever.

And you would murmur tender words,
Forgiving me, because you were dead:
Nor would you rise and listen away,
Though you have the will of the wild birds,
But know your hair was bound and wound
About the stars and moon and sun:
O would, beloved, that you lay
Under the dock-leaves in the ground,
While lights were paling one by one.

Yeats looks on Death as an enemy, he seeks to conquer Death not by choosing to die, but by choosing to live: he struggles against Death and time and if he is vanquished at last, he does not succumb to horror. This he finely incorporates in "The Wandering of Oisin" and this view of death may again be sought in some of his earliest poems. But in his later poetry it is more dominant and we read such lines in his short little poem "Death".

Confronting murderous men
Casts derision upon
Supervision of breath;
He knows death to the bone—
Man has created death.

But again a spontaneous sense of joy which is the germ of life comes out radiately in "The Wanderings of Oisin"

And if joy were not on the earth,
There were an end of change and birth.

Then mock at Death and Time with
glances
And waving arms and wandering
dances.

IX

Tagore: the greatest romantic poet in Bengali literature also reveals his love for death in several exquisitely beautiful pieces of poetry. Tagore has realised in death a sense of mystery, an immaterial power to lift humanity upward into blissful immortal world of everlasting joy and to bring a communion with the Almighty Spirit that rolls through all things. And Tagore once said "It is the same life that shoots in joy through the dust of the earth in numberless blades of grass and breaks into tumultuous wave of leaves and flowers. It is the same life that is rocked in the ocean cradle of birth and of death, in ebb and flow. Because I love this life, I know I shall love death as well."

Poetry of Sincerity

—A Study of Dr. D. H. Lawrence's Poetry

Sant Kumar Bandyopadhyay
2nd Year, M.A. English

"Art for my sake" was the credo and categorical imperative of D. H. Lawrence. Lawrence, like a stern formalist, never intended to pursue pure and simple art. Art came naturally and inevitably to him. The leading motif of Lawrence's art was to make his thoughts felt by others. His deeply-stirred feelings and well-conceived thoughts have expressed themselves in different literary genres; indeed, 'mysake' is a pregnant phrase pointing the impulse behind Lawrencean art. Art that is created for the creator himself best serves in producing catharsis in others.

To D. H. Lawrence ethics, the composition of poetry as that of other literary varieties, was a voluntary action. Throughout his literary career, Lawrence was in quest for an "answer to his blood, direct without any tribbling intervention of mind, or moral, or what not." His poetry embodies the revelation of a candid man. According to the sophisticated criteria of any twentieth century poetics, D. H. Lawrence is no poet. He, perhaps, suffers from, if I am permitted here to put Eliot's vituperative epithet to Lawrence's mentor Blake, "meanness of culture." But Lawrence, in striking resemblance with Blake, offers "eternal struggle of art against education" by "his profound interest in human emotion and a profound knowledge of them." Lawrence's poetry is a veritable type of sincerity—simplicity complex. In a letter to Catherine Carswell, Lawrence justifies his aim of jettisoning the embroidery of poetry . . . . "the essence of poetry with us in this age of stark and unlovely actualities is a stark directness, without the shadow of a lie, or a shadow of deflection anywhere." Poetry is not in the pomp and polish: but poetry is in the directness of expression and dissemination of felt thought.

Lawrence was a lonely artist, making his way through the mazes of life to grapple with matrix of art. No school of poetry could bound him for a long spell of time. He, half-reluctantly and half-enthusiastically associated himself with both Georgian and Imagist Schools of poetry: but the bound in each case proved tenuous and short-lived. The instinct-led Lawrence was only bound by his "demon"—the passionate sincerity.

To approach Lawrence from the point of view of a post-aesthete or a technical perfectionist is to throw him into a wrong focus. Our assessment of Lawrence as a poet should be strictly confined to the computability that he has been able to achieve between what he intends and what he performs as a part.

D. H. Lawrence, the Romanticist, a conscious individualist, has his own concept a poetry which he formulates and modifies in his treatises such as Introduction to the New Poems, Review of the Georgian poetry and various letters to his friends and admirers. The careful study of them reveals the distinct pattern out of which Lawrence's poetry emerged. The pattern further shows how Lawrence's time-bound poetry first out into the level of time-lessness.

Let us first see what Lawrence observes in his Introduction to the American Edition of New Poems:

"The poetry of the beginning and the poetry of the end must have that exquisite finality, perfection which belongs to all that is far off. It is in the realm of all that is perfect. It is of the nature of all that is complete and consum-

mate. The completeness, the consummateness, the finality and perfection are conveyed in exquisite form . . . . Perfected by-gone moments, perfected moments in the glimmering futurity, these are the treasured gem-like lyrics of Shelley and Keats.

"But there is another kind of poetry: the poetry of that which is at hand! the immediate present. In the immediate present there is no perfection, no consummation, nothing finished.

"There is poetry of this immediate present, instant poetry as well as poetry of the infinite past and the infinite future. The seething poetry of immediate Now is supreme, beyond even the everlasting gems of before and after."

These chunks from his Introduction testify to the conscious intent and clearly-outlined objective of Lawrence's poetry. The sensitive child of a miner father and a tender mother, Lawrence saw enough of life—life sordid, life beautiful, life meaningless and life meaningful appeared to him like a tremendous paradox. The search for meaning of life led him from one shore to another—evanescent phases of life and fluid moments of existence made a deep impact on him. He could not help recording the experiences of those fluid moments in his poetry and novels. D. H. Lawrence is a sincere poet who seeks in adequate words the equivalence of his intense experience.

Lawrence's Early poems, like his early novels, "Sons and Lovers", "Rainbow" and "Women in Love", are practically documentation of the slices from his own life. These poems have grown out of raw experiences and raw emotions—the expressions, therefore, bear the ruggedness of raw elements. Mother-fixation and Miriam-attraction constitute the focal-point of interest in these poems. "Discord in childhood", "Baby Running Barefoot" are the filiation from a mind deeply absorbed in child's view of life. The poem, Aware is an ecstatic utterance of the on-coming of love in life:

"Slowly the moon is rising out of the ruddy haze,
Divesting herself of her golden shift, and so
Emerging white and exquisite, and I in amaze
See in the sky before me, a woman I did not know,
I loved but there she goes, and her beauty hurts my heart:
I follow her down the night, begging her not to depart."

Love is always accompanied by anguish. Fulfilment is haunted by the fear of frustration. The Friar's note of caution in Romeo and Juliet should be a constant reminder to every lover: "Oh! These violent delights have violent ends."

Lawrence was inextricably attached to his mother. The plaintive rapture at his mother's death flashes forth in many a poem of this period. The poem, Sorrow, in particular, is an unmistakable testimony to his deep mood of melancholy.

Interspersed with these poems in which runs the common thread of either childhood, or Mother or Miriam, there are other poems in this volume on various themes and moods such as Dog-Tired, Cherry Ripe, The Drained Cup, The Collier's Wife, Whether or Not, Piano and others.

All these poems form a variegated mosaic of Lawrence's subtle sensibility. Whatever may be the theme, each of them is an emanation from a mind taking joy in sensuous contemplation. The immediate sense-experiences are caught up and shown brighter by the vivifying imagination of Lawrence. Among the stray poems in this group, Piano stands out remarkable: it approximates the highest of formal beauty. The period in which these poems were composed can be designated as a period of Lawrence's intense exploration into life and art. His review of anthology of Georgian poetry records the artistic endeavour of Lawrence and his Georgian colleagues: "The Georgian poets are not poets of passion but they are passionate poets. The time to be impersonal has gone. We start from the

joy we have in being ourselves, and everything must take colour from the joy. "The urge for joyous contemplation is the hallmark of a pure work of art. The objective figuring forth of the joyous contemplation is possible when there is a cleavage between what Eliot calls "man that suffers and mind that creates." Blake suffered, Lawrence suffered in their personal lives but they had elasticity of temper to contemplate joy in the creation of beauty.

In Lawrence's second collection of poems, "Look we have come through!", the autobiographical element largely preponderates. By making an understating declaration, Lawrence sets all speculations at rest about this book: "After such struggling and loss in love and in the world of men, the protagonist throws in his lot with a woman who is already married. Together they go into another country, she perforce leaving her children behind. The conflict of love and hate goes on between the man and the woman, and between these two and the world around them, till it reaches some sort of conclusion, they transcend into some condition of blessedness."

In his poems like "Humiliation", "A Young Wife" and others, Lawrence expresses his strong desire of clinging to the lady whom she loves. The poem, Humiliation begins with a touching address to his beloved:

"I have been so utterly proud, and so
long alone.
Do not leave me, or I shall break.
Do not leave me.
What should I do if you are gone again
So soon?
What should I look for?
Where should I go?
What should I be, I, myself.
"I?"
What should it mean, this
I?
Do not leave me."

This is really a piece of Lucidity and spontaneity. The love experience moves on another dimension in his poem, "A Young Wife." Lawrence, here, is almost Keatsean in his feeling of pain at the excess of joy. The extremely sensitive area of pain and joy is brought before us with keenness of touch:

"The pain of loving you
Is almost more than I can bear.
I walk in fear of you.
The darkness starts up where
You stand, and the night comes through
Your eyes when you look at me."

The male-female relationship was at the central focus of Lawrence's mind at this stage of his artistic development. The cardinal point of Lawrence's philosophy of life is that the fulfilment of human beings lies in the fullest development of spirit and senses. The complete growth of a person is impossible if his or her spiritual or sensuous life gets thwarted. Life reduces itself into a nullity if it knows only one way traffic. Lawrence harps on this theme both in his novels and in his poems. Later, in his plunge into the lives of animals, Lawrence got confirmation of his thought and declares: "All existence is dual and surging towards a consummation into being." The light and the darkness, the Sun and the Moon, the male and the female are the two hemispheres of the earth. Polarity, Lawrence considers, makes for the totality of life. In these poems, the iterative images of the Sun and the Moon, morning and night, Rose and the darkness signify the pattern of duality. "Tenderness" and "Beauty" are the twin motives presiding over Lawrence's Early Poems and Look We have come through!

Soon after Look! We have Come through!, Lawrence liberated himself from his own cloistered cell and made a voyage into the outer world in drawing out the profounder meaning of life—the meaning of a common link in all created beings and the meaning of common existence. Lawrence, the personal artist, strove to rise to an impersonal level. His restlessness of mind at the time of his desperate search after

meaning has been mirrored in his letter to Katherine Mansfield:

"My dear Katherine,

One thing I know, I am tired of this insistence on the personal element, personal truth, personal reality. It is very stale and profitless. I want some new non-personal activity, which is at the same time a genuine vital activity. And I want relations which are not purely personal, based on purely personal qualities; but relations based upon some unanimous accord in truth or belief and a harmony of purpose, rather than of personality."

Poems of Birds, Beasts and Flowers show Lawrence's interest in the hidden mystery of animal life. Lawrence has done something really unique in English poetry in probing into the sexual aspect of animal life. It is the distinct Wordsworthian element in Lawrence that leads him to explore into "unknown modes of being." In one of his letters, Lawrence makes clear his intention: "We want to realise the tremendous non-human quality of life—it is wonderful. It is not the emotions, nor the personal feelings and attachments that matter. These are only expressive and expression has become mechanical. Behind it all are the tremendous unknown forces of life, coming unseen and unperceived."

The poem, 'Snake' is the finest flower of this collection. After years of experience, Lawrence came to realise that the predicament of human life was due to man's growing alienation from the total instinctive existence that included human beings and non-human beings like the snake, the tortoise, the bat, the kangaroo, the humming bird, the circus elephant and others. The poem, Snake attempts a sort of rehabilitation of the Snake which has been degraded by the Bible. The typical Lawrencean theme of conflict between education and instinct finds expression in this poem. The situation presented in the poem is highly dramatic and symbolic. Smoking etna and Sicilian July are terms of high symbolic suggestion; the first one signifies unpredictability and the latter, violence and turmoil usually associated with Sicily since the days of Napoleon. The dramatic conflict between instinct and education is very pronounced. The poet, first under the domination of his instinct, has a feeling of unbounded joy for his meeting with the Snake;

"But must I confess how I liked him,
How glad I was he had come like a
guest in que
To drink at our—water-trough."

But at the next moment, his "accursed human education" gets the better of his instinct and makes him hit the Snake with a Clatter. Soon the poet regrets and a sort of spiritual agony overpowers him. He remembers the Albatror, the victim of the Ancient Mariner's inexplicable rage. Its killing disturbs and virtually breaks an order—the order of love—prayer—mercy flowing from man and ending at God. The poet atones for his misdeed and realises the pettiness of his mind. The pettiness of the poet is emblematic of the pettiness enveloping the whole of human society. In this poem, man's instinct of possessiveness is satirized. Lawrence's deliberate use of unwarranted "my" in such phrases as "my water-trough", "my snake" are undoubtedly shafts of satire. This poem illustrates D. H. Lawrence's movement towards the impersonal level—his individual self merges with the community of beings. Other poems in this collection, for example, the Fish Man, Bat, Fruits and Flowers are notable instances of Lawrence's searching insight into the dark and occult chambers of sub-human life. These poems are, broadly speaking, Lawrence's plea for man's close rapport with natural, instinctive life.

The next collection of poems, entitled Pansils represents the strange psychosis of D. H. Lawrence. This volume owes its significance to the fact that it is the meeting ground of two modes of attitude, disillusionment and religious faith. The mechanisation and rapid industrialisation of the twentieth century assumed before D. H. Lawrence a menacing posture and he felt that the industrialised civilization was a colossal enemy for the survival of humanity. The utter

disenchantment with up from the inner recesses of the poet's heart :

I

Our day is done ;
We wade, we wade, we stagger, darkness rushes
between our stones.
We shall drown.
Our day is over
Night comes up

(Our Day is Over)

II

O, start a revolution, somebody !
not to get the money
But to lose it all for ever
O ! start a revolution, somebody !
not to install the Working Classes
but to establish the working classes for ever
and have a world of men."

(O ! Start a Revolution)

The craze for money and the ignoble haste are the direct off-shoots of this highly mechanised society. "Money-madness", "Kill Money", "Ignoble Procession", "No Joy in Life", "There is no Way Out" and other poems are monologues of a mind in conflict, a mind in disarray.

But Lawrence is not a poet of unrelieved gloom. Instinct with a sense of wonder and gifted with expansiveness of mood, he is buoyed up, after moments of drooping, with hope of regeneration. His God does not fail him. The seeds of mystical hope are sown in some of the poems of Pansies :

I

Shall I tell you again the new world,
The new world of the unborn day ?
It is Resurrection
The Resurrection of the flesh.

(The New World)

II

A Sun will rise in
I shall slowly resurrect
. . . . . .
A Sun in me
And a Sun in heaven,
And behind that, the immense Sun behind the Sun,
The Sun of immense distances, that fold themselves together
Within the genitals of living space.

(Sun in me)

The movement of thought in this collection is anti-podal—the thesis—anti-thesis pattern of this book leads to the synthesis of Lawrence's Last Poems. In this volume, Lawrence emerges on to the highest point of his imaginative vision. The apprehension of life beyond, the expansion into a refreshingly vivacious world of the unknown rouse him into a consciousness of affirmation. The feeling of bitterness is palliated by a sense of wonder. The Ship of Death is a poem of culmination—culmination of a poet's vision :

"Now it is autumn and the falling fruit
and the long journey towards oblivion."
. . . . . .
"Build up the ship of death, for you must take
the longest journey to oblivion."
"We are dying, we are dying, so all we can do
Is now to be willing to die, and to build the ship
Of death to carry the soul on the longest journey."

These lines give us the suggestion of a mystical rebirth. D. H. Lawrence is a mystic in a special sense—the sense that he explicitly elaborates in his poem, Mystic :

"They call all experiences of the senses mystic, when the experience is considered,
So an apple becomes mystic when I taste in it
the summer and the moon, the wild welter of earth and the insistence of the Sun
All of which things I can surely taste in a good apple.

Poetry of D. H. Lawrence does not narrate : It communicates the vital thoughts surging within his breast. Whitman and Rimbaud, Wordsworth

and Hardy might have cast influence on him—these influences, are, however, assimilated and integrated with the artistic creed of Lawrence. Lawrence's poetry has the lineament of pure emotion.

"Pure poetry" is a slippery phrase that may be picked up by the hostile critics of Lawrence in their effort to prove that technical virtuosity of which pure poetry is the product does not seem to be the strong point of Lawrence. Much ink has been spilt over the question of Lawrence's lack of technical nicety. Blackmur's essay on "Lawrence and Expressive form" is a devastating attack on Lawrence's "fallacy of the faith in expressive form." There may be a grain of truth in such an accusation. But the spontaneous expression of sincere thoughts does not clog the movement of the poetry; it rather brightens it. In literary criticism, no definition is an article of a rigid constitution—pure poetry is not exclusively the mistress of musical metaphor.

Pure poetry is more than mere claptrap—it is the culmination of heart-to-heart colloquy. Pure poetry is participation poetry—a joint endeavour of the poet and the readers. Significant ideas expressed with "full-throated ease" invest the language of poetry with significance. The language of poetry may differ from one poet to another; but the language is never inadequate to a poet, if he is a poet at all.

Memorability is the test of poetry that defies the taint of time. Lawrence's poetry is memorable because it is meaningful poetry couched in spontaneous language issuing out of a highly sensitive mind. Lawrence's poetry breaks the bounds of time and chimes with the rhythm of time-less art. Poetry, based on the rhythm of a time contributes a distinct note to the universal orchestra. "Art for my Sake" is not a callow phrase: its deepest essence consists in the artist's continuous striving for reaching out to an impersonal level. Lawrence attains this level through ladders of sincerity and simplicity.

William Wordsworth's Philosophy of life and nature

Syamalendu Sinha Roy
(English)

Apparently poetry and philosophy seem to us to be different. But at bottom poetry is the most philosophical of all writings according to Aristotle. Where science or the material world fails the philosophy or the poetry begins. So the sphere of poetry or philosophy is greater and wider than that of science. It deals with both the world internal and external i.e., spiritual and material with the subtlety of thought and expression. The end of poetry is to attain beauty which finds its confirmation in Truth or vice versa,- and here lies the art. Life and Nature become art when they reach the perfect harmony,--the quintessence of the Beautiful.

To the poet life appears not as a detached unmeaning phenomena which dazzles us by its brilliant variety but as a complete whole which to the ordinary man seems otherwise. So, the poet's philosophy of life is greater and more elevated than that of the ordinary man.

Wordsworth's poetry is precious, because his philosophy is sound. His poetry is informed by ideas which fall spontaneously into a scientific system of thought. To say wordsworth's philosophy of life, there comes the idea of his philosophy of nature too, (Pantheism) : because in him we find that life and nature are inter-related eternally. To Wordsworth life is incomplete if the influence of Nature is not prevalent. Nature is valued for its power of stimulating and echoing the life within. Poetry is essentially a 'criticism of life' as Mathew Arnold calls. The greatness of a poet lies in his powerful and beautiful applications of ideas to life. And when we come across a poet like Wordsworth who sings,

> Of truth, of grandeur, beauty, love and hope,
> And melancholy fear subdued by faith,
> Of blessed consolations in distress,
> Of moral strength and intellectual power,
> Of joy in widest commonalty spread—

then we have a poet intent on 'the best and master thing'. . . . . he deals with life because he deals with that in which life really consists.

The atmosphere of the contemporary society in which Wordsworth's speculative mind is nourished, has been charged with the spirit of romance. But he is not romantic in the strain Shelley, Keats, Scott, Byron, Coleridge, Southey, Cowper and Campbell etc., are : Shelley weaves out his dreams and myths and remains rapt in vision and becomes a 'spirit' (To a skylark) and also wishes to be 'the trumpet of prophecy' (. . . West Wind) ; Keats seeks his beauty in Grecian Urn and loves the life of sensation rather than of thought ; Scott wants to peep into the veil of enchanting past ; Byron, the romantic puzzle, is essentially the poet of instinct rather than of imagination ; Southey, Coleridge, Cowper and Campbell—all are fond of pictorial aspect, the colour and forms of nature. But it is Wordsworth who feels the pulse of nature, clothed in heavenly splendour in co-existence with humanity. His mind does not fly away 'to the last point of vision' like Shelley to create his own heaven : his eyes are on the dewy ground, the platform of humanity. This conciliation between the mundane and the spiritual is perfect in itself and has a Universal appeal ; the poet like Wordsworth is 'true to the kindred points of heaven and home'.

As an interpreter of nature Wordsworth holds the first place unchallenged. Nothing is too small to escape his attention. He expresses with absolute fidelity what he has seen—'what is deep and essential in nature.' Nature is to him 'the embodiment of Divine Spirit' and this is the fundamental principle in his philosophy. His natural intensity is tempered with classicism. But why does Wordsworth worship nature? He penetrates with his own x-raying vision into the deep recesses of greater life of the world and with the light of his consciousness he realises that nature is the great teacher; there is a great spiritual communion between the indwelling soul of the Universe and the soul of man. He sees both the aesthetic and moral side of nature and life. He deals with the ideas—

'On man, on Nature, and on human-life.'

Voltaire most truly remarks, 'no nation has treated in poetry moral ideas with more energy and depth than the English nation.' Wordsworth has the all-inclusive vision of life. In 'Prelude' he reveals a strange world and the deeper we dive into it the stranger it becomes. It abounds with philosophy. There is a sweet union of philosophy and poetry in 'Prelude'. "Wordsworth's power of super-sensual perceptivity is a direct perception of eternal reality, the distinctive mystical experience which is called ecstasy or Samadhi, which in 'Tintern Abbey' "the Serene and blessed mood"—and from this inner experience is born poetry—"the spontaneous overflow of powerful feelings . . . . . recollected in tranquillity". What he sees in nature is not its beauty but the life. All he sees, feels and hears,

"Was but a stream—
That flowed into a kindred stream—a gale
Confederate with the current of the soul".

in his "Immortality Ode" we find him saying—

"There was a time when meadow, grove
and stream
The earth, and every common sight,
To me did seem
Apparell'd in celestial light,
The glory and the freshness of a dream."

Here we see his vision of the earth is bathed in a divine radiance and his philosophy of life reaches its perfection in the best stanza of this Ode:

"Our birth is but a sleep and a forgetting:
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar:
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home;"

In 'Excursion', he expresses his feeling:

"Nature was my guide,
The nature of the dissolute."

To contemplate 'the aspect of nature' is to enter into the divine community of all being and it comforts him highly.

Wordsworth is not only a poet but also a seer and a mystic. He has caught a vision of the life into the things which finds expression in the following lines:

"It is my faith that every flower
Enjoy the air it breathes."

'Between the Spirit in Nature and the mind of Man, there is a pre-arranged harmony (according to Wordsworth)" says Stopford Brooke, "and it is this harmony that enables nature to communicate its own thoughts to man and to reflect upon them until an union between them was established." Then in 'Tintern Abbey' Nature seems to have cast a spell upon him from the very early in life and it is a poem of self-disclosure. The 'coarser pleasure' and the sensuous love in nature of his two earlier stages of life becomes spiritualised and he reaches a sort of transcendentalism—"a sense sublime of something far more deeply interfered' with 'a motion and a spirit that impels—

All thinking things, all object of all thought,
And rolls through all things'.

In the middle of this poem 'Tintern Abbey' he reveals a deeper humanism, a sublime realisation of life and reality with all its passions and emotions: he hears

"The still and music of humanity
Nor harsh nor grating, though of ample power
To chasten and subdue."

This shows that the true poet is influenced by a power deeper than his own individual appeal and his 'Lucy gray' is a great success in this connection. From understanding comes appreciation and from appreciation love. So 'Nature, never did betray the heart that loved her'. Nature is to him 'the anchor of his purer thoughts, nurse guide, guard him of his heart and soul of all his moral being'.

The Governor's Role in New Perspective.

Jayitish Gobin Ray
5th Year, Political Science

Ever since independence, the Governor's role was not a matter of deep concern for political leaders and constitutional lawyers of India as has now become immediately after the fourth general election. The fourth general election has hoisted a green signal for the beginning of a new political era in our country. As a result thereof, India has peacefully achieved "a silent constitutional revolution." In the election, the voters have expressed their clear verdict to come out of "the octopus control of the twenty years of uninterrupted one-party rule". As has been remarked in the reports of 'the London Times', the fourth general election is "a great electoral earthquake" through which "India is acquiring the substance of democracy".

Out of the sixteen states participating in the fourth general election, the Congress Party fails to secure an absolute majority in the eight states. Even at the centre, its majority is not as comfortable as it was during the last fifteen years. Of course, at present, this situation has changed to some extent. In some states, the non-Congress Parties have come down from power as a drastic result of defections and the conspiracy of the reactionary forces. In the bye-election of Haryana, the Congress Party has regained its commanding position. Yet upto now, it is clear that the image of the Congress Party has lost its past glamour and the party is no longer to a position to enjoy a country-wide over-whelming majority that it enjoyed even before the fourth general election.

Of course, in the background of this newly emergent picture of Indian politics, it is necessary to have a re-thinking on the role of the Governor. For a long time, the post of the Governor as such had no importance. Apart from very few instances, the Governor did not have to play any conspicuous role in the political affairs of the states. In the opinion of Acharya Kripalani, a great political leader and a well-known parliamentarian of India, the big palaces of the British Governors have now turned into the places of enjoyment of leisure of the old and infirmed politicians, defeated in the elections. According to Mr. H. V. Kamath, the expenditures for the maintenance of these powerless nourished puppets with great eclat like the British period are more than the expenditures for the State Legislatures. Also, many of our politicians and constitutional lawyers are of opinion that the office of the Governor is "an anachronism in democracy". But there have some bitterness in these statements. The office of the Governor is not inconsistent with the democratic principles as a democratic country requires a constitutional head. We have given the term 'Governor' a swadeshi form—'Rajyapal'. Also, we should not abolish the office of the Governor simply on the ground that it was the creation of the British imperialists. Because, the educational institutions where we go for study, the Legislatures where we sent our representatives to raise our demands and needs, the Corporations and Municipalities where we sent our representatives to elevate our local problems and difficulties, the Courts where we go for justice, the hospitals where we go for medical help are all the creations of the British imperialists, should we

abolish all these ? Or can we abolish them ?

But in spite of all these factors, we cannot overlook the inner implications of the above statements. Under the Constitution of India, the Governor is appointed by the President of India. His constitutional position bears a close resemblance to that of the President at the centre. Although under the provisions of the constitution, the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor and the Council of Ministers shall conduct the governmental affairs of the state in the name of the Governor, yet the Governor has no independent role to play. The office of the Governor is important only in so far as it serves as a link between the centre and the State.

As has been mentioned above, the Governors are appointed by the President of India. But the appointments are done under the recommendations of the Prime Minister. So in practice, the party-thinking and the party-considerations put pressures in case of these recommendations though the founding fathers of our Constitution desired that there should not be any such pressure. As a matter of fact, the system of appointment was recognised in our Constitution on the ground that such a man will be appointed as a Governor who is above politics and renowned in the fields of education, art, literature or a man of great ability, respect and personality. But during the last twenty years, the Congress Party used the office of the Governor as a reward for Congress leaders, defeated in the elections or retired from politics and as a device of isolating them from the internal party-fights. As a result of it, excepting the few cases like late Dr. Harendra Kumar Mukherjee, Dr. Zakir Hussain, Mrs. Sucheta Kripalani and Mr. K. M. Munshi, the Governors are not the men of expected qualities. Even in these exceptional cases, the Governors had previous connections with the Congress Party. In 1952, the opposition parties, under the leadership of Mr. T. Prakasham, received the majority support in the Madras Legislative Assembly. But at that time, the Governor of Madras called Mr. Rajagopalachary to form the Ministry instead of calling Mr. T. Prakasham. Also in 1957, in Kerala, the Governor, in order to put the Communist Ministry in an inconvenient position, appointed an anti-Communist Anglo-Indian as a member of the Assembly. Even after the fourth general election, the Governor of Rajasthan called Mr. Sukhadia, to form the Ministry though at first his party did not have the majority support, Mr. Sukhadia was invited to form the Ministry as the leader of the biggest party of the State. But is there any such provision in our Constitution that the leader of the biggest partly will be called to form the Ministry ? The Constitution points out clearly that only the leader of the party which have the majority support in the Assembly will be called by the Governor to form the Ministry. Furthermore, even Mr. Ajit Prasad Jain, the ex-Governor of Kerala confessed that in the contest of Indira-Morarji for Premiership, he was involved in the anti-propaganda of Morarji. Hence, despite Mr. Chavan's propaganda that "people who had understanding of social forces and working of human minds and who commanded respect of the people were selected", there is no denying the fact that the Governors who have chosen so far are not the respected non-partisan men.

It is to be noted in this connection that in the draft Constitution which was placed before the Constituent Assembly at first, it was mentioned that the Governors will be elected by the people of the States. But in the final Constitution, this clause was changed and the prevailing system of appointment was recognised. The founding fathers of our Constitution favoured this system of appointment on grounds of national unity and solidarity as well as on the ground that by this system of appointment, it would be possible for the Central Government to retain the control over the States. But those who were against this system of appointment, argued that in future it might be the case that the Governor may act against the will of the Ministry as a result of which there will arise a constitutional crisis and that was exactly what

happened in Kerala in 1959 when the Nambodiripad Ministry, in spite of enjoying the majority support, was discharged in accordance with the report of the Governor, sent to the President under Article 356 of the Constitution. Very recently, in West Bengal, the United Front Ministry has also been discharged by the Governor, Mr. Dharamvira, without the trial of strength in the Assembly. Apart from discussing the controversial point of whether Mr. Dharamvira's action in this case is justified or not, I think I would not be unjustified if I say that the Governor should be elected by the people of the State itself. Because, whenever under the Constitution, the Governor has the power to dissolve the Ministry, the members of which are democratically elected and the Ministers shall hold office during his pleasure, should it not, therefore, be the rule that he will be elected by the people themselves?

But gone are the happy days of Congress. The political wind of the country has started to flow towards a reverse direction. The fourth general election has marked "the destruction of the Congress monolith". For the first time since India owns freedom, "the Congress colossus" has lost the ability to dominate the country as a whole and India has entered into "a testing ground for rival ideologies". The debacle of the Congress Party in the fourth general election foreshadows that the continuing constitutional crisis in the States is in the offing.

At this turning-point of Indian politics, the Governor's role has received much more importance than it had ever before. At present, the Governor will have to play an independent role not only in the State politics but also in matter of sustaining the link between the centre and the State. He will have to deal with the non-Congress government on a neutral outlook and to try to understand its problems with sympathy and honesty. In the state, where non-Congress government prevails, it will be his duty to go on according to the will of the Ministry and to place its will sympathetically to the Centre. He must be a man of ability, personality, sincerity and respect and have "understanding of social forces and working of human minds". Also, he should watch the condition of the State and have a well-understanding with the non-Congress governments. Under the circumstances, the Governor is no longer a powerless nourished puppet of the Central Government and hence the office of the Governor should not be used as a reward for Congress leaders, defeated in the election or retired from politics or as a device of isolating them from the internal party fights.

Separation of Judiciary and Executive

Anoop Kumar Barua
IIIrd Year, Philosophy.

There is no denying that complete separation of Executive and judiciary functions is a vexed problem and is in the focus of attention for over a century and a half. The combined judicial and executive service prevalent in many states of our country is not the invention of the Government. It is due to the survival of the growth of institutions that arose under the Sovereign Company of merchants. So far the history is concerned we are all aware of the fact that as soon as the British Parliament began to exercise control over the affairs of the East India Company, then under Regulation II of 1793, it has laid down that "the collectors of the revenue must not only be divested of the power of deciding upon their own acts but render amenable to them to the court of judicature". The regulation explicitly maintained that such affairs would be 'subject to a personal prosecution for every deviation from the Regulations' and, that, "The Revenue Officers must be deprived of their judicial powers".

There is a noticeable tendency to blanket protection to executive action. Here in our country, we are accustomed with the customary conjunction of protecting government servants for all their enactments believed to be done in good faith and thereby including officers to cite examples of more frequent misuse of power and arbitrary action including firing and lathi charges, than ever before. This is usually done in the name of "Emergency" or "Expediency" and it is not uncommon to find in modern statutes and acts making provisions. And this is happening in an independent republic.

It is an irony that every party pleads for the separation of judiciary and executive as enshrined in our constitution. But they do not take the initiative to materialise the issue in question.

Mockery of the Principle

Since 1886 the Indian National Congress gave vent to the execution of the Principle. Years rolled by and in the year 1937 they deviated their attention and publicity declared that the Principle should come to the background with the formation of responsible governments in the state. Such a representation of thought was no doubt detrimental to the country's interest. Since then efforts that are being made for the separation of two functions amount only to the mockery of the Principle.

Nature of Executive Power

Ours is essentially a Parliamentary form of democracy which owes its origin to the British, the business of Government involves a variety of processes. An analysis of the executive power itself would reveal the innate relationship between the legislature and executive processes. The judiciary and the legislature are functionally and ideologically akin though methodologically and operationally they are different. The relationship between the executive and judiciary arises when executive orders are challenged as a violation of law or the constitution, or vindictive, malafide, excessive or perverse.

Necessarily it creates a climate of conflict. The Supreme Court has attempted to give a

more positive definition by stating that executive function comprises both the determination of policy and its execution, initiation of legislation; maintenance of order; promotion of Social and economic welfare; direction of foreign policy; and in fact, the carrying on, or supervision of, the general administration of the State.

Vicious Circle

The District Magistrate as laid down in 1861 "Means the Chief Officer charged with the Executive Administration of the District" and further, "The administration of Police though vested in Superintendent of Police.....is exercisable under his general control and direction". So it is clear that the District Magistrate is not only responsible for the maintenance of law and order but also the head of Criminal justice in his jurisdiction. Rightly in Hindi he is styled as "Ziladish" "God of District". Gandhiji once wrote that he was both the prosecutor and the judge. Sir Frederick Halliday, President of the Committee to enquire into Police Organisation in India reported in 1932 that "In all the Magistrate is constable, prosecutor and judge" ..... "the danger of injustice under the circumstances is not in a few cases, not in any proportion of cases, but in every case".

If this is the actual picture of the Pre-independence era, it is more than certain that the District Magistrate exercises far more power than ever before and in a sense he may be said to be exercising more powers than a Governor. The phenomenal advance of science and technology ever since the last two world wars and methods of mass control paved the way to large dimensions of the executive power. It is a pity that though the legislature encourages this growth of power and by thus patronising digging its own grave in the shape of challenge from the executive which finds it difficult if not impossible to control the executive and its myriad manifestations.

In fact it is the executive to-day which is now doing the most crucial and practical part of legislation. Because of the growing complexity and volume of legislation, the Parliament has no time, equipment and technical skill to keep pace with the work. Rightly it is said that the executive is putting all the flesh and blood to the skeleton produced by the Legislatures and the Parliament.

The Collector should be deprived of his magisterial powers and powers to hear appeal in revenue cases. It is expected of him to be merely a collector of revenue and in case of any over exercise of power it is the duty of the citizen to seek redress in a court of law, only the appointment of judicial Magistrate is not enough. The Police department should not be under his direct control. The Police Organisation should be the sole authority in affairs pertaining to police action. These suggestions will not see the light of the day if there is no change in law, but there is no reason why it cannot be done. In this connection it may be argued that there may be substantial increase of arbitrary behaviour of the Police force. But the case is quite different in so far as the Police Officer in India has never been a popular figure and citizens are more afraid of him than a Goonda. Moreover he cannot also be charged for his excesses for the District Magistrate would always shield him of course a Police Officer may be imprisoned for dereliction of duty as per Police act although it would be difficult to cite an example of such action. But Why? Suppression by third degree methods etc. are normal feature of the Indian Police force which maintains a list of witnesses station-wise who are supposed to be omnipresent and ever-ready to give false evidence.

Happy Symbiosis

The administration of Justice, the vital role of the judiciary, is now-a-days a duty belonging exclusively to the State. During the early day the country lacked judicial organs and, indeed, the administration of justice was not regarded as a function of the State.

The judicial power has not been expressly vested in the judiciary under the Indian Constitution. The judicial is in a handicapped posi-

tion with the judicial power vested upon the agencies and instrument-alities having neither judicial training and equipment, nor there is the climate to observe and follow the norms and Principles of adjudication.

The judiciary according to the Constitution of India, has to perform a two-fold function. It adjudicates upon disputes between citizens, that being a part of the traditional work assigned to the judiciary all over the world. It performs the more stern task of deciding the validity of legislative acts and executive actions. The Constitution of India has guaranteed certain fundamental rights to the citizens of India and it prescribes limitation within which the functions and powers must be exercised. In discharging this two fold function the Indian Courts are like watch-towers guarding the liberty and fundamental rights of citizens and also as laboratories for testing the validity of legislative and executive matters.

The problem of relationship between the judiciary and the executive depends on the judicial control and judicial review of the increasing volume of executive legislation and administrative law. The outcome is significant resulting in the formation of administrative tribunals of various sorts such as the labour and industrial tribunals, the income-tax and company tribunals on the line and pattern operating in France as "Droit Administratif!" The Administrative tribunals are a half way house between the orthodox judicial procedure of the regular courts and executive machines of carrying out and implementing statues and legislation. So far the administrative tribunal is concerned the judiciary faces the problem of standardising the procedure before the administrative tribunals. The existing variety of administrative procedure has been vehemently criticised which arises out of sheer despair of the aggrieved parties as well as the courts and the tribunals.

In the Indian Constitution there is no provision of total and complete severance of judiciary and executive functions. Hence there is the clearest Directive Principles of State Policy in Article 50 of the Constitution directing: "The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the Public Services of the State". The decision taken in the case between Nripendra Nath Bagchi vs. Chief Secretary of the Govt. of West Bengal, reported in A.I.R. 1961 Calcutta-1 and affirmed on appeal by the Supreme Court in A.I.R. 1966 Sec. 447 is relevant in this connection.

No Britisher inspite of his policy of exploiting India ever dared to oppose the reform. Sir Barnes Peacock, Vice-President of the Governor-General in Council who was pioneering and patronising the Police Bill said that "The Combination of Executive and judicial functions was a temporary measure" and soon there would be, "Total and complete severance of these two functions". In 1888, Lord Dufferin, the then Viceroy of India termed it "A Council of Perfection".

A year later i.e., in 1899 under the leadership of Lord Hobhouse a memorial was submitted to the Secretary of State for India. This attempt was backed by the ex-Chief Justices, ex-Judges of High Courts of India, ex-members of Governments of India, Bombay and Madras. Unfortunately enough this noble endeavour proved fatal due to the unsympathetic treatment by the Britishers for reasons political.

The judiciary is the guardian and custodian of the constitution and is the interpreter and arbiter of the Constitutional Rights and obligations. It is the machinery through which the fundamental rights and the life, liberty and property of the citizens are protected and defended. The judiciary has taken a liberal and progressive outlook in the interpretation of statues and Act specially in the field of labour and Social Welfare legislation.

Judicial power is hierarchical and in the hierarchical series there are different grades with original, appellate, revisional and superintending powers which provide its own checks and balances. The judicial power accepts limitations of its self-correcting processes, of the three organs of the Government, the judiciary is the

most conservative, the executive is the most precipitous. The judicial mind, the training, the judicial methods of investigation and adjudication and in fact the whole judicial outlook is not adjustment of this desirable conservatism and considers it as the eternal sentinel for the continuity of life and the general custodian of law and order in Society. It also extends and enlarges the expressions of life, their content and limits. The judiciary is the apostle of applied law and liberty and not like the rest theoreticians about legal freedom and legal Philosophy.

The judiciary came in conflict with the executive in matters relating to the problem of acquisition and control of property. This resulted in the amendment of Article 31 of the Constitution and its connected provisions. This incident took place on the eve of the commitution, when the late Prime Minister Mr. Nehru attempted to warn the judges in his speech in the constituent Assembly on September 10, 1949 in the following words:

"We honour our judges and respect their independence, but I warn them, we will tolerate no legal quibbles on their part, they must not stand in our way. No law, no judge is going to come in our way in the abolition of the zamindary system". It is heartening to note in this connection that the judiciary was firm in its stand and finding no other way out the Government amended the constitution to tide over the difficulty created by the judicial verdict.

The slur of the combination of the two function which still continues unabated poses onslaughts in the shape of the crushing of the people, if nothing else!

India is free now. So we can hope with Tennyson that "Freedom's battle once begun though vanquished oft is ever won". Amid the clamour of multiplying and contending interests, the Quiet Voice of the Philosopher, reminding us of such elementary Principles as justice and liberty, may teach us more wisdom and resolve more of our doubts than the mere statistician. Justice is heaven knows, imperfect enough in its application, but at least "it is an everfixed mark. That looks on tempest, and is never shaken" Incessant abstract meditations of the thinkers than the trials and errors of the doers is more effective to keep the ship steady accross troubled waters. There is no doubt that a hair splitting juristic imposition upon the executive will stifle the executive action. At the same time it is also expected that the executive must have regard for the basic mandates of the policy and purpose of the statutes and legislations or the imperative commands of the constitution of India. For the success of the doctrine it is categorically imperative for both the functions to bear mutual wisdom, respect and appreciation of the condition in which the two has to act with conscious self-restraint on either side.

Employee-Management Relations in industry

Dr. D. Ganguly, M.Sc. (Cal.), Ph.D. (Lond.)
Head of the Department of Psychology, C.U.

If we look at an industrial organization, we find that two distinct groups of people are at work : (1) Management and (2) Labour. Their points of interest being different, they maintain differential attitude towards the organization. At the beginning of the 19th century the individual employer used to determine the law of industry for his particular plant, subject only to the vague control of the competitive system, more in the pattern of feudal outlook. The striking changes in industrial relations which have taken place since that time, may at first glance, appear to follow no uniformity, still they reflect deep seated economic and social forces which have for a long time directed the course of the principles and practices of industrial relations in countries which have to depend very much on industrial economy.

The spread of education, scientific advancement and fuller industrialization brought in a consciousness of the fundamental human right among the people. Labour unions were formed to protect the rights and interests of the working class and to negotiate with the management for collective bargaining. Trade Union movement gradually gained momentum with the orientation of our socioeconomic outlook.

A number of experiments, attitude surveys etc. of outstanding nature have been done on human relations in this field. Some diagnosed the source of aching at one place, some at another. Some have prescribed a system to be adopted for the betterment of the relations, some, with a little bit of its modification, hope for a lasting amity between the groups. The early attempts to define the status of labour were concerned primarily with wages and hours of work and with the protection of the life and health of the workers. Modern systems of industrial relations have become more and more concerned with elaborate definitions of the status of labour in the factory and in industry as a whole, with attempts to insure labour interest against the economic insecurities created by modern industry and with an infinite variety of devices for regulating the division of the product of industry and for redistributing the areas of industrial control. However much the attempts have been made to ease the conflict arising between the groups there remains still the evidences of misunderstanding resulting to mutual distrust.

India is fast changing from agricultural form to industrial pattern. We are still passing through the first phase of industrialization which the Western countries have already gone over. It is advantageous for us now to take a decision as to the system of industrialization which will work with minimum amount of conflict and for maximum realization of the purpose of life.

Capitalism thrives in exploitation depriving the human rights on equality. So long as the society would permit such a negation, no system however scientific will be able to irradicate the points of conflict between the groups. Concept of the industrial 'Capital' in its present form basis itself on the idea that it would not wane under any circumstances while giving energy to enterprises. It would, on the other hand, allow, if possible increment in its dimension. From our knowledge of the nature, any energy utilized for a purpose undergoes transformation

with the reduction in the extent of the original form. But the 'Capital' as it is defined by its practice in the present set up does not brook any reduction, in stead, it thrieves to increase in bulk by curbing the legitimate due on other heads. It is obviously against all natural laws. In spite of its artificiality this system now rules our industrial set-up. It is natural therefore, that there remains an apprehension of the manifestation of discontent in any form at any time as this conception of 'Capital' is fundamentally based on human discrimination. Against such possibilities what system of industrial set-up should be in India, adopted for the irradication of conflict in industrial relations? I believe, for better social adjustment we should redefine the present concept of 'Capital' on the basis of the total amount of work necessary for harnessing natural resources for human benefit, in place of the monetary symbol that the term carries. The system based on the new definition would ensure total employment and equitable distribution of benefit. As a consequence irritation for discrimination would gradually disappear making individual existence meaningful to the society.

In maintaining human relations with least conflict, decentralization of industry is a prerequisite. It is possible by having heavy, medium, cottage and agricultural industry perfectly synchronized and co-existent with each other. This type of distributory industrial set-up would form a homogeneous pattern where social distance between individuals will be minimized to the last. Such a state would cafilitate close identification among individuals because of commonness and uniformity in the way of living. This identification in the ultimate analysis is the mortar of all human relations.

Introduction to an Italian edtion of 'Capital'

From Maurice Dobb (Cambridge)

Karl Marx, Il Capitale, Libro Primo, trad. Delio Cantimori. Editori Riuniti, Roma, 1964. The English version (which is being simultaneously published by the Journals Science and Society and Marxism Today on the occasion of the centenary of the first publication of Das Kapital) is reproduced here by kind permission of Editori Riuniti.

Das Kapital is, I suppose, the most controversial work on Political Economy ever to have been written. The subject of more and sharper controversy even than was Ricardo's Principles, it has probably met with wider extremes of praise and denigration than any other work of its kind. More frequently refuted than most economic theories—and when not being refuted it was as often as not in academic circles ignored—it has survived to be accepted over a large part of the contemporary world as the authoritative interpretation of capitalist society. Even in the last decade of the nineteenth century a foremost critic could say that 'Marx has become the apostle of a wide circle of readers, including many who are not as a rule given to the reading of difficult books' (Böhm-Bawerk). Despite the passion his doctrines have aroused, however, there are those among his academic critics who have estimated his intellectual contribution soberly. Joseph Schumpeter, for example, in his monumental History of Economic Analysis, says of Marx that 'the totality of his vision, as a totality, asserts its right in every detail and is precisely the source of the intellectual fascination experienced by everyone, friend as well as foe, who makes a study of him'; and elsewhere that 'at the time when his first volume appeared there was nobody in Germany who could have measured himself against him either in vigour of thought or in theoretical knowledge'.

The two concepts that have been the special centres of controversy have been those of property-income as surplus-value, or the fruit of exploitation, and of the historical development of capitalist society towards revolutionary transformation into socialism. The former could be regarded, perhaps, as a development of the so-called 'deduction theory' of profit to be found in Adam Smith (where it was no more than a surplus theory in embryo, and some would say no more than a hint): or possibly as a more rigorous and systematic version of ideas already current among the so-called 'Ricardian socialists'. The latter concept, in itself an application of Marx's general view of history and of the role of class conflict as the motive-force of historical change, sharply contrasted with prevailing views of economic progress; since these, even when tinged as they often were with fears about the approach of a 'stationary state', held no inkling of an historical role for the working class. Such a role was quite foreign to bourgeois conceptions, and its introduction was at once transforming and to traditional notions distinctly shocking.

Proper understanding of both these concepts depends on an appreciation of the boundaries of political economy as Marx envisaged them. The tendency of modern economic analysis since the last quarter of the nineteenth century has been to narrow its focus to a study of the

exchange-process, i.e. of the market and of market equilibrium under various hypothetical conditions. In gaining precision of formulation it has achieved a fairly drastic narrowing of scope and of range. Conditions of production have been narrowed and failed down to the assumption of given supplies (or supply-conditions) of disembodied productive factors and of given technical coefficients or so-called production-functions; and in so far as any kind of process of production appears, it does so implicitly as a unidirectional flow of primary factors into final consumer goods (in terms of which are so-called "imputation" of prices to intermediate goods and factors—the Austrian School's *zurechnung*—alone makes sense). Anything to do with property-ownership, or any distinction between the propertied and the propertyless, is relegated to the category of social or sociological factors, excluded from the domain of economic theory per se, and not affecting the formal structure of that theory (merely affecting, perhaps, the value of some of the variables involved). As is well-known, the shape assumed by a theoretical model is itself a selection of the facts and the events to be studied; hence however impeccable or elegant its logic it can represent a biased selection which may distort our vision of the real world, instead of illuminating it. One result of the increasing formalisation of economic theory in recent decades has been to render its analysis of market equilibrium almost entirely quantitative in character, leaving little or no room for qualitative differentia, and certainly no room for differentia of a so-called socio-economic kind. What Marx called the 'fetishism of commodities' is thus able to ripen behind this imposing facade to an unnatural degree. It is hardly surprising that a relationship such as 'exploitation' or the characterisation of income as a 'surplus' should cease to have any meaning within this context; and that even so sympathetic a critic as Mrs. Joan Robinson should dismiss the notions of exploitation and surplus value as moral judgments masquerading as economic concepts.

By contrast, Marx conceived the bounds of political economy more widely than this—as indeed was true of classical political economy, without in its case such explicit formulation. For him the 'social relations of production' were included as well as the 'productive forces' and the conditions of exchange. This followed from his historical approach to the analysis of capitalist production and his historical conception of the mode of production as the basis of a given society and 'the true source and theatre of all history'. Qualitative characterisation of relationships was as important as was a solution of the quantitative problem of value and of the derivation of prices from values. From the standpoint of causation, especially of movement and change, such characterisation was essential; and a constant preoccupation of his analysis was "to penetrate through the outward disguise into the internal essence and the inner form of the capitalist process of production" behind the market appearance with which the epigoni were content.

If we take the terms 'exploitation' and 'unpaid labour' as a socio-economic description of a relationship (and not per se a moral epithet), then it is hard to see how its correctness can be disputed. Few if any would, I think, question the description of the income of feudal lords as having its source in the appropriation of a part of what was produced by others—the product of "a subject peasantry" to use the historian Marc Bloch's phrase. (Marc Bloch says: "whatever the source of the noble's income he always lived on the labour of other men".) Surely, anyone who denied this would be concealing or distorting a major feature of an economy based on serf-labour? To apply a similar characterisation to property-income in a capitalist society is to assert that in this respect it bears a major analogy with previous types of class society, and this despite the fact that all economic relationships have a contractual form governed by the market. In other words, owners of capital continue to 'live on the labour of other men', even

though politico-legal compulsion to work for a master is replaced by the economic compulsion which a propertyless status involves. Are not these economists the word-jugglers and the obscurantists who have sought to deny such a proposition with the aid of various types of 'productivity theory', conjuring their denial by imputing the activities of a machine or the chemical properties of land to the passive renter who happens to be their owner?

Some have supposed, wrongly I think, that the characterisation of profit as surplus value is somehow derived from the labour-theory of value; the two standing in relation to one another as the premise and conclusion of a syllogism. Thus the two theories are sometimes regarded as inheritors of Lockean notions of natural right—the natural right to own the product of one's own labour. This is, I believe, an incorrect interpretation. Rather was it a case (as Marx himself explained it in Value, Price and Profit) of reconciling the fact of surplus value with the classical notion that in a regime of free trade and free competition all things exchanged at their values: a reconciliation which he achieved by separating labour-power from labour; the former being a commodity which itself had a value, depending upon the value of what was needed for its replacement, or for subsistence. If there was some premise from which the notion of surplus value was derived as a conclusion, this was the definition of 'producer' and of 'productive' in terms of human activity.

The theory of value of Marx stood essentially in the classical tradition, although in its formulation by different writers of the classical school there were ambiguities and some lack of clarity, as well as the well-known differences between Adam Smith and Ricardo on this matter. There is no doubt that it was Ricardo who stood closest to Marx—an affinity which we can appreciate the more now that we have Ricardo's unpublished and previously unknown paper on 'Absolute and Exchangeable Value'.[1] What this theory of value essentially did was to explain conditions of exchange in terms of conditions of production, and hence in the final analysis to represent the prices of production as determined (in the 'normal case' and under conditions of free and perfect competition) by the amount of labour which their production cost, together with the technical conditions of their production as expressed in what Marx termed the 'organic composition of capital'. This derivation of exchange relations from conditions of production was, again, wholly consonant with his general conception of history, and with the leading role played in this by the mode of production. It was, indeed, a direct application of this historical conception, and represents the organic link between the two that enables one to speak of his economic theory as being in this sense historical and which illustrates the essential unity of his thought.

It is precisely this claim that the structure of prices can be derived from conditions of production that has evoked the most strenuous denials from economists of the subjective, or utility, school. And the charge that Marx's attempt to demonstrate this (and hence his theory of profit as surplus value) foundered on a crucial contradiction was what enabled his leading critic, the Austrian von Böhm-Bawerk, to proclaim confidently 'the close of the Marxian system', thereby leaving the field open for an explanation of prices and incomes simultaneously in terms of Utility (vide Böhm-Bawerk's own well-known theory of interest on capital as dependent on the different subjective valuation of present and future goods). In Volume I of Capital, as is well-known, Marx tackled the problem of surplus value on the assumption that commodities exchange at their values. At this stage his

[1] Published in Volume 4 of works and Correspondence of David Ricardo, ed. Sraffa. Cambridge, 1951. The paper is unfinished, its writing having been interrupted by Ricardo's fatal illness and death.

analysis is concerned only with the most general features of capitalism, and it is on these that he fixes attention. Expressing it in modern terminology, one could say that analysis is conducted at this stage at the most macroscopic level. He is not concerned at this stage with individual products and industries, but with the 'social relations of production' which determine how the total product, viewed as a whole, is divided between the classes. It is only in Volume III, at a later stage of approximation, that he concerns himself with more of the detail of the picture—that he introduces conditions affecting the relations between different industries and comes closer to differentia that become visible and important at a more microscopic level of examination. In particular, he takes account of differences in the technical conditions and in the so-called 'organic' composition of capital' in different lines of production, combined with the necessity (given conditions of capital-mobility between industries) for a uniform rate of profit on capital, irrespective of where capital is used. Under these conditions, for reasons which are sufficiently familiar, 'prices of production', as the normal (or long-term equilibrium) prices at which products exchange, diverge from values: profit being equalised by a process of 'redistribution of total surplus value' between different branches of industry.

In subsequent Marx-kritik it was upon the relation between these prices of production and the Values of Volume I that attention came to be focused. The theory of surplus value was constructed on the assumption that commodities exchanged at their values; yet it transpired in Volume III that exchange in capitalist society was on the basis not of values but of prices of production which diverged from values. What then was left of the theory of surplus value and all that was prendant on it? This was 'the Great Contradiction' which, according to Böhm-Bawerk, lay at the core of the Marxian system and was the source of its inevitable dissolution. ('The Marxian system has a past and a present, but no abiding future.') What point was there in speaking of two levels of approximation, or two stages of analysis, if the second could not be derived (given the additional data introduced at this second stage) from the first? This could not be done in the manner indicated by Marx; and if it could not, then Marx's theory provided neither a theory of profit nor a theory of prices; and an explanation both of profits and of prices must be sought elsewhere. It was demonstrably untrue that conditions of production determined conditions of exchange.

In subsequent discussion of this question the problem of deriving prices of production from values (or of the later approximation from the essential data postulated in the earlier approximation) was called the Transformation Problem. This discussion was both intermittent and remunerative; it was confined to a mere handful of cognoscenti, and was very little known either among Marxists or among non-Marxian economists. But on the outcome of it the force of Böhm-Bawerk's apparently telling criticism of the theoretical structure built up in the three volumes of Kapital, and especially in the first and third, can be said to have turned. On this issue Böhm-Bawerk, usually so perspicacious, had contented himself with a disdainful dismissal of the particular solution indicated by Marx, and had not stopped to enquire whether the character of the problem was such as to make it likely or unlikely that an alternative solution to it could be found. It is, indeed, clear that Böhm-Bawerk's method of argument was altogether too simple for the nature of the problem in question, and that he had really no notion of complex determination implied in the proposition that 'the values stand behind the prices of production' and 'determine these latter in the last resort'. It is true that the particular arithmetical examples which Marx uses to illustrate

[1] Zum Abschluss des Marxschen Systems, 1896

the derivation of prices of production from values are inadequate and incomplete—a fact of which he himself was aware (as evidenced in a passage in the Theorien uber den Mehrwert).[1] Moreover, the simple contention that 'on the average' prices of production and values, profit and surplus-value came out equal, was quite insufficient. Like much else in Volumes II and III this was unfinished work, and in this unfinished state it was open to some, at least, of the objections which Böhm-Bawerk and later Bortkiewicz levelled at it. This incompleteness consisted in the fact that only the outputs were transformed into prices of production, while all the inputs (including labour-power) continued to be expressed in terms of value. Obviously this is not sufficient: as Marx himself saw, the inputs themselves must also be transformed into price terms (the elements of constant capital and wages as the price of labour-power, which itself depends upon the price of workers' subsistence, or so-called wage-goods). If inputs are so transformed, both the rate of profits and the prices of output will be affected thereby. It follows that the rate of profit will not be the same (except in a special case) as the rate of profit that was formed out of the surplus value of the value situation (by averaging); and in Marx's arithmetical examples it would be different from the rate of profit with which he constructed his prices of production. But it does not follow that the new rate of profit cannot bear a definite relation to the old rate of profit (i.e. of the value situation) and hence to the rate of surplus value as defined in the theory of surplus value. Nor does it follow that in this situation of complex interdependence, where output prices depend on input prices and output prices reciprocally influence input prices, a single set of magnitudes cannot be found for all the variables which satisfy the postulated conditions. The solution if it can be found will be like the solution to a set of simultaneous equations, and the possibility of finding one will depend, formally, on similar conditions.

It was the merit Bortkiewicz in the first decade of the present century to have shown that such a solution was, indeed, possible in the simplified case of three sectors or industries, producing respectively elements of constant capital (the Department I of Marx's reproduction scheme at the end of Volume II), wage-goods and luxury goods consumed exclusively by capitalists.[2] This he did with the aid of the condition (a condition of so-called 'simple reproduction') that the outputs of each category were equal to the incomes devoted to their purchase (namely, replacement expenditures on constant capital, total wages and total surplus value). It was a curiosity of this Bortkiewicz solution that it was independent of the conditions of production of the third sector producing for capitalists' consumption: the solution depended exclusively on the conditions of production in the other two sectors.[3] This, he

[1] Theorien, Vol. III, pp. 100—7 and 111; also cf. Capital, Vol. III, Eng. ed. Kerr, Chicago, pp. 190-194.

[2] L. von Bortkiewicz, 'Marx's Fundamental Theoretical Construction in the Third Volume of Capital', and 'Value and Price in the Marxian System' in Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik and in Archiv für Sozialwissenschaft, 1907 (both articles appearing in the same month of July); trans. into English respectively in Paul Sweezy's ed. Böhm-Bawerk's Karl Marx and the Close of his System, New York, 1949, and in International Economic Papers, No. 2. Bortkiewicz's solution had, however, been anticipated (as he himself acknowledges quite handsomely) by the Russian writer W. K. Dmitriieff in a little-known work of 1904 (a 'remarkable work', presenting 'something really new', according to Bortkiewicz). Dr Sweezy deserves the credit for starting a discussion of this solution (in his Theory of Capitalist Development) among English-speaking readers.

[3] Or, more strictly speaking, 'on those amounts of labour and those turnover periods which concern the production and distribution of the goods forming the real-wage-unit' (Bortkiewicz).

claimed, was not just a formal result, but demonstrated that profit was the fruit of exploitation (or as he preferred to put it, in the manner of Adam Smith, it had the nature of a 'deduction') and had nothing to do with the productivity of capital.

> If it is indeed true that the level of the rate of profit in no way depends on the conditions of production of those goods which do not enter into real wages, then the origin of profit must clearly be sought in the wage-relationship and not in the ability capital to increase per division. For if this ability were relevant here, then it would be inexplicable why certain spheres of production should become irrelevant for the question of the level of profit.[6]

This Bortkiewicz-solution in terms of three sectors was, in essence, a three-industry, three-product solution. Alternatively it could be thought of as yielding the average price of production for each sector and hence demonstrating that these average prices could be derived from the data of the value-situation (i.e. conditions of production measured in terms of labour), while leaving the individual prices of particular prices within each sector undetermined. It was intuitively obvious, of course, that if a solution were possible for the three-product case, it could be found in all probability for any larger number of products. For some time, however, an actual demonstration of this remained lacking—a lack which may perhaps be regarded as an adverse reflection upon the 'creative Marxism' of Marxist economic thinkers of the period. The first such demonstration (to the knowledge of the present writer) that a more general solution was possible for any number of commodities—for the n-product case—was provided by Francis Seton (of Oxford) in an article in the Review of Economic Studies for 1956-7.[7] The conclusion was that his analysis had shown the 'logical superstructure' of Marx's theory 'to be sound enough': a demonstration which some may think acquires additional conviction from the fact that the writer was at pains to dissociate himself from the implications of Marx's theory of surplus value.[8] Such a demonstration (worked out, indeed, in its essentials many years earlier) is also implicit in the equations which form the crux of the derivation of prices from conditions of production and the ratio of profits to wages in Part One of Piero Sraffa's Production of Commodities by Means of Commodities (cf. esp. Chapter II). The upshot of discussion over more than half a century accordingly is that Marx was quite correct in supposing that prices of production as the actual 'equilibrium prices' of a competitive capitalist economy could be regarded as being determined by the conditions and relations of production, including in the latter the basic exploitation-ratio which in value-terms is expressed as the rate of surplus value. The logical structure of Marx's analysis of capitalist production, and the unfolding of this analysis from the level of value-theory of Volume I through to the theory of prices in Volume III, remains intact after a century of vehement, sometimes acute but more often far from understanding, criticism. And in its qualitative characterisation of the essentials of capitalist society and of its driving-force, can there be much serious doubt that it provides an insight that no economic writing of other schools has done?

A mere Introduction cannot do justice to the numerous special aspects of these three volumes that are deserving of comment; and the present Introduction would become tedious if it attempted to do so. One general remark, however, about Marx's method can perhaps be made:

[6] 'Value and Price in the Marxian System', Eng. trans. in International Economic Papers, No. 2, p. 33; cit. in the present writer's Economic Theory and Structure, London, 1955, p. 280.

[7] Volume 24, 1956–7, pp. 149–60. The article is entitled 'The Transformation Problem'.

[8] He considered a denial of factor-contributions other than those of labour, on which the doctrine of surplus value rested, to be 'an act of fun rather than of genuine cognition', ibid, p. 160.

namely, that while his interest and purpose in this work were primarily theoretical, he resembled Adam Smith in the extent to which he mingled theoretical generalization and abstract reasoning with historical data of a more concrete and detailed character. This was manifestly part of the central design of the work and was fully consonant with his general attitude towards the relation of theory to actuality: the combination of the two served to reveal the general in the particular and to establish the categories of his thought as representations of the essence of real activity not abstractions empty of life. Thus we have in parts of Volume I richly factual excursions into reports of early-nineteenth-century factory inspectors and government 'blue books' about working conditions and the payment of wages and the effects of machinery; also the well-known historical data on the methods of 'primitive accumulation' in Part VIII. In Volume III there are the historical excursions into different forms of rent and the distinctive types of social relations of which they are the expression; into Merchant Capital, rich in detailed hints and suggestions (it is here that we find the brief reference to the 'two roads' of transition to bourgeois methods of production; also the pregnant phrase about 'the way in which surplus value is pumped out of the direct producers' constituting always the explanation of the 'relation between rulers and ruled'); also data about interest and credit with its references to Thomas Tooke's famous *History of Prices* and *An Inquiry into the Currency Principle*, to official inquiries into the financial crisis of 1847-8 and to evidence before the Select Committee on Bank Acts.

But one cannot pass over altogether without mention three topics which, in addition to his theory of value and surplus value, have been the object of comment and controversy. First, there are his references to the impoverishment of the working class in Chapter XXV of Volume I; the chapter entitled 'The General Law of Capitalist Accumulation'. This is the origin of the so-called 'tendency to absolute impoverishment of the working class' which has occasioned so much questioning and discussion, both as regards its correct interpretation and its accordance with statistical evidence about the trend of wages.[1] Secondly, there are the chapters in Volume III on the Falling Rate of Profit and on counteracting tendencies. These occasioned much debate as to the place this tendency has, if any, in his theory of periodic crises and in his conception of the long-run historical destiny of the system as a whole; also on whether he conceived it as necessarily overbearing the influence of the counter-tendencies (a matter on which he is silent, and at any rate offers no proof that it must in all circumstances be the more powerful).

Thirdly, there is the famous schema of reproduction in the third part of Volume II: a set of arithmetical tables which depict in a two-sectional or two-departmental form the equilibrium relations needing to be observed under conditions of 'simple reproduction' and 'expanded reproduction' respectively, and in doing so indicated the improbability of such conditions being maintained except 'by accident' in a system characterised by 'anarchy of production'. The two sectors or departments were those producing respectively means of production and means of consumption: the former for replacement of (or under expanded reproduction additions to) constant capital each department (i.e. to meet the needs of 'productive consumption'), and the latter to cater for the personal consumption of capitalists and wage-earners. In each department the gross output was broken-down into its main value-constituents, namely using-up of constant capital (raw materials, plant and equipment), expenditure on wages (variable capital) and surplus value. It followed, of course, that in simple reproduction (with zero saving) the gross output of Department I (means of production) must

[1] I have given my own opinion about its interpretation in *Teoria economica e sviluppo*, Roma, 1960, pp. 365–71, and will not make any comment here.

equal the sum of the used-up constant capitals of both departments. Correspondingly, the gross output of Department II (means of consumption) must equal the sum of the wages and surplus value of both departments. Hence, exchange between the two departments must consist of an amount of means of production from I equal to the replacement-needs of constant capital in II against means of consumption from II equal to the sum of wages and surplus value in I. Unless this equality is maintained (v + v in I = c in II), there will be excess production in one of the two sectors without a market in the other. The equilibrium conditions for 'expanded reproduction' were a more complex extension of these conditions. Since the publication of the Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie (Rohentwurf) of 1857-8 which contains a preliminary version of the schema, we know that this notion of setting out the structural inter-relationships of production in a tabular form was present to Marx's mind at a relatively early stage, before the actual publication of his Kritik der Politischen Oekonomie (in 1859). It is interesting to note, moreover, that the schema in the Grundrisse, in its breakdown into sectors, distinguishes production of raw materials and of machinery among means of production, and among means of consumption between production of necessaries for workers and surplus products (or surplus-producers) for consumption out of surplus value.

It can be readily seen that the schema constitutes an embryonic, two-sector form of a modern input-output matrix, of which the totals of rows and of columns bear a necessary relation to one another. This analysis is, indeed the actual ancestor of the latter, since it directly inspired the Soviet method of balances in the 1920's, and as we now know the basic idea of the more complex input-output matrix of Leontiev was derived from these balances. One could say, indeed, that much of present-day thinking about dynamic problems not only represents a long-overdue return to the forms in which economic problems were envisaged by the classical economists and by Marx, but is inspired directly or indirectly by the Marxian method, in particular by his structural analysis of reproduction.

The reproduction schema was also the centre of attention in the various discussions between rival interpretations of Marx's theory of crisis, most notably in Rosa Luxemburg's theory, which started from a critique of the theory of expanded reproduction and laid emphasis on the so-called problem of 'realisation' of surplus value. Similarly with the strongly opposed theory of Tugan-Baranovski, which stressed the possibility of a non-contradictory process of expanded reproduction. In a certain sense it is true that the under-consumption which formed the emphasis of certain theories is simply another facet of over-production. This would be true, for example, of the equilibrium relationship between the two sectors, which we have just mentioned; from one side the failure to observe this relationship could be regarded as deficiency of demand, and from the other side as an excess of supply. But this is merely to say that any exchange-transaction has two sides. What is really important is the source from which any rupture of the equilibrium conditions of exchange originates. If pressed further, the two-facet notion can constitute an illusory way of reconciling what are real differences of emphasis regarding the originating factors, and tend to blur essential features of Marx's approach. As in other parts of his theory, the bias latent in his analysis here was certainly to focus upon causal factors within the structure and relations of production rather than upon factors within the process of circulation or exchange per se or than upon demand-factors which have their roots in the psychological propensities of individual consumers.

It was in November 1866 (as Franz Mehring tells us) that 'the first bundle of manuscript' of Volume I of Das Kapital was sent off to Hamburg, to 'a publisher of democratic literature' called Otto Meissner. This was followed five

months later by the remainder of the manuscript which was taken to Hamburg by Marx in person. The final proof-sheets were corrected on 16th August 1867—'at two o'clock in the morning' as he told Engels—and returned to the printer. The preface to the first German edition is dated 25th July of that year. Publication was early in September.

This first volume was the product of work over nearly two decades—work interrupted and rendered intermittent both by illness and by political preoccupations, including the foundation of the First International. His acquaintance with the English economists of the classical school dates back to his days in Paris in the middle '40's (after the closing-down of the Rheinische Zeitung which he had edited). But intensive study and writing about political economy and capitalism dates from his domicile in London from 1850. Here it was that he made the Reading Room of the British Museum his workshop; his writing being mainly done at home—at first in the cramped Soho lodgings occupied by his family for six years and after that in modest but somewhat more capacious and pleasing surroundings in the neighbourhood of Harvestock Hill. Already in April 1851 we find him writing to Engels: 'I am now so far that I have finished with all the drudgery of economics. After that I shall work on my book at home and pitch into some other science in the Museum. It is beginning to bore me. The science of political economy has made no fundamental progress since the days of Adam Smith and David Ricardo.' But this mood was not to last for long, and he was very soon back at the study of the history of political economy in the British Museum. His intention of completing work on the book at an early date, however, was frustrated. 'Especially as the time at my disposal,' he explains, 'was cut down by the imperative necessity of working for a living'. In December 1857 he writes: 'I am working like mad all through the nights at putting my economic studies together.' This product, as a kind of interim product or first instalment, the Zur Kritik der Politischen Oekonomie in 1859. But again nine years later it was: 'as for my book, I am working 12 hours a day writing out a fair copy' (Letter to Kugelmann, 15th January, 1866); and a few months afterwards he complains: 'I cannot work productively more than a very few hours a day without feeling the effect physically.... Besides that my work is often interrupted by adverse external circumstances' (Letter to Kugelmann, 23rd August 1866).

It seems to have been by the beginning of 1866 that the design of the first volume, and the intention of publishing it separately, took shape in his mind. In that year he writes to Kugelmann that 'my circumstances (physical and external interruptions without intermission) make it necessary for the first volume to appear separately, not both volumes together, as I had at first intended' (Letter of 13th October 1866). He goes on to explain how 'the whole work is divided':

Book I The Production Process of Capital
Book II Circulation Process of Capital
Book III Form of the Process as a Whole

adding that 'the first volume contains the first two books'. According to Mehring, it was between January 1866 and March 1867 that the final writing of the manuscript for Volume I was done.

As is well-known, Marx was not to complete the other volumes during his lifetime. These were to bear the subtitles 'The Process of Circulation of Capital' and 'the Process of Capitalist Production as a Whole', and were to be published by Engels, Volume II in 1885 two years after Marx's death, and Volume III in 1894. These parts of the manuscript were left on his death as incomplete drafts and in some cases only notes, which Engels pieced together in the two volumes as we know them. 'At best one single manuscript (No. 4) had been revised throughout and made ready for the printer'. In his Preface to Volume II Engels decribes this material as 'fragmentary' and 'incomplete in various places', unpolished as regards language—'careless, full of colloquial, often rough and humorous, expre-

sions and phrases' ; 'thoughts were jotted down as they developed in the brain of the author' ; 'some parts of the argument would be fully treated, others of equal importance only indicated', while at the end of chapters were often 'only a few incoherent sentences as milestones of incomplete deductions'. It was in this Preface, incidentally, that Engels gave a foretaste of what Volume III would contain by saying : 'As a matter of fact, equal capitals, regardless of the quantity of annual labour employed by them, produce equal average profits in equal times. Here we have, therefore, a clash with the law of value, which had been noticed by Ricardo himself, but which his school was unable to reconcile.'

Rosa Luxemburg's comment* on these two posthumous volumes is worth quoting :

> In these circumstances we must not look to the last two volumes of Capital to provide us with a final and completed solution of all economic problems. In some cases these problems are merely formulated, together with an indication here and there as to the direction in which one must work to arrive at a solution. In accordance with Marx's whole attitude, his Capital is not a Bible containing final and unalterable truths, but rather an inexhaustible source of stimulation for further study, further scientific investigations and further struggles for truth.

His work on the history of economic thought, upon which we have seen that he had started in the early '50's, was not to appear even during the lifetime of Engels, who was to outlive Marx by some twelve years. At one time this work was intended as a sequel to the Kritik, and was described by the heading of 'critique of political economy'. Later it was designed to form the fourth volume of Das Kapital : and the manuscript of it apparently formed part of the general manuscript of 1861-3, and to have been written between January 1862 and July 1863. It was left for Karl Kautsky to publish it as Theorien über den Mehrwert in 1905. More recently the manuscript of this work was purchased by the Marx-Engels-Lenin institute in Moscow, which, after reworking the manuscript issued in 1954 a new edition, according to a different pattern from that of Kautsky, and one said to be closer to that of Marx's original design.

* In the passage she contributed to F. Mehring's Karl Marx : the Story of his life, Eng. trans. by Edward Fitzgerald, London, 1936, p. 371.

Parvez Saheb

By Abdur Rauf
(Lecturer in Modern Indian Languages (Urdu)
Calcutta University)

Parvez Saheb is no more! A beaming face, radiant with inner joy, always inspiring confidence in others, is no more! With him have departed some of the finest qualities of a feudal age which he had inherited by birth and which he had assimilated unconsciously. A poet of a very high calibre, rubbing shoulders with the greatest of his contemporaries, Parvez Shahidi remained an humble man, taking interest in the affairs of his friends, relations, lovers, pupils, as if they were a part of his own self, their joys and sorrows being the main theme of his conversation. He dedicated his serious thoughts, his passionate feelings, his agonies and sorrows to poetry, and lightness and cheerfulness to his friends. He would welcome any visitor with gleams on his face. His voice would become louder and eyes brighter if the visitor happened to be a close associate, of course, the closer the associate, the greater the volume of voice and brighter the eyes. He lived his childhood and early youth in opulence since he was born in a family of zamindars of Azimabad, noted for its culture and affluence. 1910 is the year of his birth.

In his early childhood he was educated according to the syllabus of the Dars-e-Nizami which system of education introduced to him the tenets of the Muslim faith and the fundamental of the Persian language and literature. This brief introduction served as a basis for his further scholarship and literary culture. Under the influence of his parents he joined the Chishtia order and became the disciple of a pir saheb.

Taste for poetry was ingrained in his nature. He composed his first ghazal when he was hardly ten years old. Poetry and preparations for examination went side by side. He passed the Matriculation examination of the Calcutta University in 1925 as a private candidate; and M.A. examination of the Patna University in Urdu and Persian in 1934 and 1935 respectively. In the meantime his ancestral property suffered great set backs and began to wear out rapidly because of the mismanagement by unworthily Managers. Moreover, his emotional attachment with some one was not favourably rewarded. He came down to Calcutta in 1935 to start his life afresh and scratch the past memories (As he has revealed in his foreword to the Taslise-Hayat). He became a school master and then a Head Master. He passed the B.T. Examination in 1938. From 1941 to 1946 he served at the Midnapore College as a professor of Urdu. He joined the Surendranath College Calcutta in 1947 in the same capacity where he served till 1949 when he was imprisoned for his association with the Communist Party of India. He was released in 1951 but to his utter surprise he found that he had lost his job. After some time he was appointed Head Master of the C. M. O. High School. He had this post till his appointment as a lecturer in Urdu at the Calcutta University in 1958. He died on the 5th May, 1968, as a University Teacher. Parvez Saheb struggled throughout his life just to procure his bare livelihood so that he could give his best to literature and poetry. He not only wrote poetry but also

POET PHILOSOPHER LOVER

E. H. PERWEZ SHAHEDI

Born on. 21st. Sept. 1910.
Died on. 5th. May. 1969.

Who mentions DEATH ?
TRUTH never dies
Stings of death fades to nothing
To the strong willed Eyes.
Time Eternal writes no wrinkle on the acute brow
No scissors can cut the Intimate relation of the SOUL
Lo !! the hapiness longing lingering
Stares in the face of LIFE

"Perwez Shahedi"
English rendering by
"Waheed Arshi"

lived it. In the midst of constant worries, he kept smiling and tried by relating to them co-incidences and stories full of wits and humours. While sitting in the staff room of the Calcutta University he made witty remarks and told us to suit the occasions. A few of them are here.

(1) Lamenting the death of 'Dagh', Bekhud Dehlvi pointed out to Sael Dehlvi mournfully that after Dagh Delhi had become barren and there was no poet worth the name "Ab Kaun Raha" murmured Bekhud" EK main hun aur tum ho" (Who else is left now excepting myself and yourself).

Sael nodded politely. Then after a short pause Bekhud continued in a low and soft tone. "Aur tum bhi Kaya :" (And what is there in you too).

(2) Late in the night a poet was giving a finishing touch to his Ghazal. A thief entered his room. He cast hurried glances at the belongings of the poet but could not find anything worth stealing. He was just going to leave the room when the poet saw him. "Welcome friend where are you going?" shouted the poet. "Come listen to my taza (fresh) ghazal." The thief had no alternative but to listen to him. When the poet had finished recitation, the thief put his hand into one of his pockets and took out a bundle of papers. He turned to the poet and appealed to him "This time you please listen to my afsana (short story) which I wrote during day time."

Parvez Saheb used to say that the thief and the poet had good relations afterwards.

(3) A certain journalist always favoured the parties which could give him monetary benefits. People complained that it was unjust on the part of this particular journalist to favour wrong parties and have no regard for the nation. The journalist said very politely "After all, my wife and children are also members of the nation, I change my policy for them."

It is nothing short of miracle that Parvez Saheb, living in a precarious condition in Calcutta, wrote master pieces in Ghazal and composed poems which stirred the literary world. By their themes and style his poems "Tulchhat" (Dregs) 'Be Chehrgi' (Facelessness) and Shahr-e-Guftaar (City of speech) have no parallel in the whole history of the Urdu poetry.

He shall live in the poets to come since the great masters of poetry lived in him.

He sang of truth, love and beauty. Communism gave him an impetus, it was a whip, not an anchor. In "Tulchhat" Parvez has revealed a great truth. It represented the spiritual anguish of his age. He says that lovers of wine are thirsty but the wine is so polluted that they cannot drink a drop from it. The poet points out to the frustrated lovers that even in the past the wine of life had not been free from pollution. The lovers of wine in the past could not detect this pollution where as the present lovers can. The lovers are perturbed. They are thinking in terms of renouncing the wine for good. The poet tells them that not renunciation but purification is the correct solution. In the concluding lines of the poem he says.

Khum se jab chhan ke pahunch jaega paimano men,
Lalagun lala-e-nasaaf nazar ayaiga
Har qadah saghar-e-shaffaf nazar ayaiga.
Bastian maari badal jayengi maikhanon men.
Maye gulrung zamane ki sadaqat hogi
Uski Tulchhut bhi latafat hi latafat hogi.

Translation : When the wine of the jar (after having been filtered) will be poured into the goblet, it will look scarlet bright just like tulip. Every cup will have the shape of a shining goblet. The whole of the human habitation will be changed into a big tavern. The rose-coloured wine will become the truth of the age and even its Dregs will have excellence and beauty.

He believed in the great role of labour and its contribution to culture and civilization.

How beautifully he paints the belief in one of his verses.

Bani hai intezab-e-shauq dharkan qalb-e-aalam ki
Uge hain kisht-o-dahqaan se rukh-o-kaakul ke afsaane.

The throbs of the heart iron has turned into restlessness of love, the stories of faces and tresses have sprung up from the fields of the farmers.

Parvez's poetry represents a vast canvas which requires deeper studies.

He had great regard for his contemporary Bengali poets and literateurs. He very often remarked that his Bengali admirers gave him inspiration to live.

Parvez Saheb loved his friends and admirers and he loved them in such a way that everybody thought that he was closer to him than others. Personally I welcome this rivalry as it is a healthy one and I wish it could continue.

Khuda junoon ka tere sihula daraz kare
(May God widen the range of your frantic love.)

Parvez Saheb has left behind him his collections of poems, Raqs-e-Hayat (published), Tashi-e-Hayat (in print) and Simina, his ten-year old daughter, his only issue, for whom all of us have good wishes.

Long live Parvez Saheb.

Jam-e-aabe hayat deta hai waqt har aarif-e-haqiqat ko
Kaat sakti nahin koi qainchi rooh ke rishta-e-rafaqat ko.

(Times gives the goblet of elixir to one who knows the Truth; no scissors can cut through the bonds of comradeship that exists between one soul and another.

(Reprint from "Struggle".)

एकता

कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र-संघ की सामयिकी

१९६७-६८

सम्पादक :
सोमेन घोष

देवमुनि उपाध्याय
सम्पादक : हिन्दी विभाग

अकथ

आज का युवक हर चीज से असंतुष्ट है, उसे इस वातावरण से ही चिढ़ हो गई है जिसमें वह जी रहा है। आज 'देश के भविष्य' के सम्मुख ही कोई भविष्य नहीं है। वह स्थायि नहीं रोजगार चाहता है। दोषपूर्ण शिक्षा-पद्धति, अनिश्चयता, बेरोजगारी, कुंठा और निराशा के मध्य आज का युवक घुट-घुट कर साँसें ले रहा है। उसे अपनी साँसों में भी एक प्रकार की असना दृष्टिगोचर होती है। उसके साथ विश्वासघात होता है। उसके सामने गर्व करने को कुछ भी नहीं बच रहता है। पर क्या 'असन्तोष की सन्तान' पथभ्रष्ट है ? नहीं ! दिग्भ्रमित भले ही हो पर पथभ्रष्ट नहीं है।

आज का रचनाकार इन्हीं परिस्थितियों के मध्य जीता है। असन्तोष, अनिश्चयता, कुंठा, संत्रास, घुटन विश्वासघात और निराशा (बीच-बीच में आशा भी) इसकी रचना के माध्यम से समय-समय पर अभिव्यक्त होती रहती है। अज्ञेय के शब्दों में –

'मुझे अस्तित्व मिला, पर अस्ति नहीं ; अवाधा मिली, पर आस्था नहीं। यह न होने का दर्द ही मेरे होने की पहचान है—जितनी भी वह है। यह मेरा बेमुंहा मुलौटा ही मेरा मुख है। इसीलिये हर चीज के पहले अ-जोड़ कर ही मानो मैं अपने को दिलासा दे पाता हूँ कि वह है : अ-कहानी मेरी कहानी है, अ-कविता मेरी कविता ; अकथा मेरी कथा है, असमंजस ही मेरा सामंजस्य है।"

'एकता' आपके सम्मुख है। इसमें आज की परिस्थिति कहाँ तक प्रतिबिम्बित हुई है, यह आपको देखना है—परखना है।

और अंत में पंचम वर्ष के सुरेन्द्र प्रताप सिंह और डॉ. दियाग के बहीर अपनी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता ; जिनके सहयोग के अभाव में पत्रिका शायद समय पर नहीं निकल पाती। छात्र संसद के पदाधिकारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने पहली बार हिन्दी-वर्ग को ४८ घण्टा देकर अनुगृहीत किया है।

—सम्पादक

....और सफ़र खत्म हो गया

● दिग्गकान्त शाही

परवेज़ साहब नहीं रहे। बहुत मुश्किल है मन के लिए यह मान लेना कि अब वह हँसता हुआ ममता से भरा चेहरा नहीं दिखेगा, जो तकलीफ की घड़ियों में अपने-आपको और दोस्तों को भी, शेर पर शेर सुना कर हिम्मत बँधाता था, झुकने और टूटने से इनकार कर देता था। न जाने कितनी बार उनके मुंह से यह शेर सुना है—

"खत्म होकर रहेगा सफ़र ही तो है,
खत्म-वत्म ही सही रहगुजर ही तो है।"

जमाने की टेढ़ी-मेढ़ी राहों पर चलने के अभ्यासी परवेज़ साहब ज़िन्दगी को भी सफ़रसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। सफ़र में कठिनाइयां आती ही हैं, उनका क्या शिकवा करना। कितने सहज भाव से उन्होंने जीवन के दुःखों-कष्टों से विचलित हो जाने वाले मन को ढाढ़स बँधाया है। लेकिन आज जब परवेज़ साहब हमें छोड़ कर चले गये हैं, तो लगता है कि ये पंक्तियां भी मानों अपना आपा खो बैठी हैं। किन्तु नहीं, यह शायद मेरी ही कमजोरी है, आंखों में तैर आने वाले कुहासे के कारण इनकी रोशनी धुँधली लग रही है, इनकी लौ धुँधली नहीं पड़ी है। राहा जलाने वाला चला गया है किसी और लोक सफ़र पर किन्तु वह जल रही है और जलती रहेगी, हमारे मन का अन्धेरा दूर करने के लिए।

परवेज़ साहब उम्र में मुझसे अठारह-उन्नीस साल बड़े थे, पर वे उन लोगों में नहीं थे जो अपने छोटों को आजीवन छोटा मान कर और दूर रख कर ही अपने बड़प्पन को सुरक्षित मान पाते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके आने के पूर्व ही मैं उनकी कविताओं से और उनसे परिचित हो चुका था। जब वे विश्वविद्यालय में आये तब तो बहुत ही जल्दी में उनके करीब आ गया। क्लास लेने के बाद उनको घेर कर उनसे कविताएं सुनना, तरह-तरह की समस्याओं पर बहस करना मुझे बहुत प्रिय था।

परवेज़ साहब बहुत कुछ थे—राजनीतिक नेता, विद्वान् प्राध्यापक, स्नेही मित्र किन्तु सबसे पहले वे कवि थे। मेरा यह सौभाग्य है कि उनके इस रूप को कुछ थोड़ा-सा समझने का मौका मुझे मिला था। उसी रूप की एक झलक इस लेख में देने की कोशिश मैंने की है।

परवेज़ साहब जहां बैठ जाते थे मजलिस जम जाती थी। लतीफे भी वे बहुत मजेदार सुनाते थे। हँसना और हँसाना उनके लिए सहज सिद्ध था। लेकिन यह हँसना-हँसाना भीतरी दर्द को छुपाने का बहाना-मात्र था। वे इस बात को भली-भांति जानते थे कि दुनिया उनके साथ रोयेगी नहीं, उनके दर्द पर भी हँसेगी। फिर ग़मगीन चेहरा बना कर हास्यास्पद बनने से क्या लाभ? अपने दर्द की ज्वाला

को उन्होंने हँसी के हिम से ढंक रखा था। उन्हीं की एक रुबाई है—

"चेहरे को शिशुपना कुछ बनाना ही पड़ा,
उठते हुए दर्द को दबाना ही पड़ा।
समझा था कि मेरे साथ रोयेंगे,
लेकिन यों हंसे और मुस्कराना ही पड़ा।"

परवेज साहब का दुनियादारी विश्वास था कि बिना बाहरी दुनिया को समझे भीतरी दुनिया को नहीं समझा जा सकता। जब समाज में विषमता और स्वार्थपरता का नंगा नाच हो रहा हो तब कवि एकान्त में कल्पना का स्वर्ग बना कर, उसमें रमे रहकर अपना सच्चा परिचय पा और दे सकता है, इसे वे असम्भव मानते थे। अपने काल्पनिक दुःख पर या किसी के मातम पर आंसू बहाने वालों से उन्होंने पूछा था—

"इन आंसुओं की हकीकत को कौन समझेगा—
कि जिनमें मौत नहीं, जिन्दगी का मातम है।"

और जिन्दगी का मातम मनाने वाली इन्हीं व्यवस्था, पीड़ाग्रस्त आंखों में खुशी की चमक लाने के संघर्ष में उन्होंने अपने-आपको, अपनी कविता को समर्पित कर दिया था। कम्युनिज्म के प्रति उनका आकर्षणात्मक लगाव इसीलिए था कि उन्हें लगा था कि इस व्यवस्था के माध्यम से इन भीगी आंखों के सपने साकार हो सकते हैं, आहों से जले हुए सूखे होठों पर मुस्कराहट लौट सकती है। उनके राजनीतिक मतभाव से असहमत होते हुए भी अपीड़ित जन-मात्र के प्रति उनकी सच्ची आन्तरिक सहानुभूति और उनके न्यायोचित अधिकारों को वापस दिलाने के लिए उनके जीवन-व्यापी संकल्प एवं संघर्ष के प्रति मैं श्रद्धानत था, हूँ और रहूंगा।

अपने इसी विश्वास के चलते उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम को भी बाहरी दुनिया से काट कर अपने छोटे से संसार में सीमित हो जाने का बहाना नहीं बनने दिया। उनका प्रेम उन्हें दुनिया से काटता नहीं, जोड़ता था। रोमानी प्रेम में डूबे, दीन-दुनिया से बेखबर मनुजों की मृत्यु कामना को प्रेम का आदर्श मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उनका प्रेम उन्हें जीने के लिए प्रेरित करता था। उनकी प्रेमिका की स्मृति उन्हें एवे-दुनिया से जूझने की शक्ति देती थी। किस मीठे अन्दाज से उन्होंने कहा था—

"सौंपे पास कभी तेरी याद ने न दिया,
शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने न दिया।
कम से कम मैं तुझे दुनिया को सुना सकता था;
पर तेरी याद ने वे काम भी करने न दिया।"

अपनी प्रेमिका से उनकी मांग यही थी मेरे जीवन में तुम अपना आकर्षण भर दो ताकि मैं इस क्रूर समय को भी बदल कर उसे अनुकूल—सदय बना सकूं:

"मेरी जिन्दगी में अपने खिलखिलाते भर दो,
वक्त उसे जालिम को मेहरबान बनाना है।"

धार्मिक अन्धविश्वास और उसकी आड़ में पलने वाली कट्टरता, व्यावसायिकता तथा साम्प्रदायिकता के वे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कुछ बहुत तीखे शेर लिखे हैं धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ। वे स्वयं उस परिवार से आये थे जो कट्टर धार्मिक था। उन्होंने मुझे बताया था कि आरम्भ में वे भी बड़े धर्मविश्वासी थे, किन्तु धीरे-धीरे वे धर्म के प्रति विद्रोही हो उठे। वहां उनसे मेरा विरोध था, धार्मिक अन्धविश्वास और धर्म एक ही वस्तु नहीं है। मैं यह मानता हूं कि रूढ़िमुक्त धर्म चेतना मानव के लिए अत्यन्त कल्याणकर है। जो हो, चर्चा परवेज साहब के विश्वासों की हो रही है और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने विश्वासों

को निर्भीकतापूर्वक व्यक्त करने के कारण उन्हें बहुत बार अपने समाज का कोपभाजन बनना पड़ा था, किन्तु वे विचलित नहीं हुए। केवल अपने ही सम्प्रदाय में सम्पूर्ण सत्य होने के दावे के कारण ही साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलता है। इस मनोवृत्ति पर कटाघात करते हुए परदेशी ने एक बहुत चुटीला शेर कहा है :—

"शेख अंधेरे में आये हैं पश्चिम की तिमन,
जैसे सारा उजाला उधर ही तो है।"

धार्मिक कर्मकाण्ड और विधि-विधान के मध्य कई बार मानवीय चेतना कुण्ठित-सी हो जाती है। सभी कुछ अलौकिक ही अलौकिक साबित किया जाने लगता है। इस चेष्टा का उपहास करते हुए परदेशी ने लिखा था—

"आईने भी सिर्फ फरिश्ते नजर आये,
जाहिद ने कभी चेहरा-ए-इन्सां नहीं देखा।"

बेचारे जाहिद को इन्सान का चेहरा कभी दिखा ही नहीं। यहाँ तक कि आईने में भी उसे फरिश्ता ही दिखाई पड़ा। भला ऐसे लोग मानवीय दुःख-दर्द की दवा क्या कर सकेंगे। इस विषय पर उनका सबसे विध्वंसक शेर है—

"जाहिदों रिन्दों ने आखिर काम का पैदा किया,
तुमने हिम्मत की तो ले दे के खुदा पैदा किया।"

जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी धारणा के अनुसार काम-काज की दुनिया अधार्मिकों द्वारा ही विकसित हुई है, धार्मिकों ने बड़ी हिम्मत की तो ईश्वर की सृष्टि की जो निरर्थक ही नहीं हानिकारक भी है। इस शेर को सुनकर मुझे चोट पहुँची थी। मैंने कहा था : परदेशी साहब सारा उजाला मार्क्स को ही नहीं मिल गया था, धर्म के दूकानदारों की बात जाने दीजिये, लेकिन इन सारे सन्तों-भक्तों की व्यक्तिगत साखी को आप कैसे नकार दे सकते हैं। ईश्वर और धर्म को कूड़े के ढेर पर नहीं उड़ाया जा सकता। और वे मुस्कराते-मुस्कराते गम्भीर हो गए थे। व्यक्तिगत विश्वासों की टकराहट में बहस की गुंजाइश नहीं रह गयी थी।

स्वाभाविक रूप से विज्ञान के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। और वे विज्ञान को कविता का विरोधी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि विज्ञान के नये आविष्कारों, नये कारनामों के कारण कवि की कल्पना को पर लगाने के लिए नये-नये क्षेत्र मिलते हैं। अन्तरिक्ष विजय से प्रभावित होकर उन्होंने कहा था : —

"यहाँ अंशुमन ने की है कुछ अजब अन्दाज से करवट।
कहाँ तक फैलती जाती है दुनिया मेरे ख्वाबों की।"

मनुष्य के इस नये पराक्रम से नये अन्दाज से ही गई चाँद-सितारों की करवटों को देखना भी सम्भव हो गया, कवि के सपनों की दुनिया और भी विस्तृत हो गई। और जिस दिन मनुष्य का बनाया हुआ यान चाँद पर उतरा था उस दिन बहुत से लोगों ने आशंका प्रकट की थी कि अब कविता का खात्मा हो जायेगा क्योंकि अब चाँद-सा मुखड़ा कहना शायद सम्भव न रह जाये। किन्तु परदेशी साहब की प्रतिक्रिया बिलकुल भिन्न थी, उन्हें लगा था कि पराये को भी अपना बनाकर साइन्स ने शायर के जैसे सारे सपने चुरा लिये हैं खुद साइन्स शायरी करने लगा है। इस आशय की उनकी दिलकश रुबाई सुनें—

"खुद चाँद लगा तमों की माला अपने,
तारे जो पराये थे, बने हैं अपने,
ऐसा लगता है जैसे साइन्स ने आज,
शायर के चुरा लिये हैं सारे सपने।"

प्रगतिवादी कवि होते हुए भी परदेशी साहब अपनी कविताओं में अभिव्यंजना कौशल का बहुत

ध्यान रखते थे। उनके बहुत अधिक न लिखने का एक कारण यह भी रहा कि वे अपनी कविताओं को सपाट और नारा मात्र होने से बचाना चाहते थे। लिखते समय भी और लिखने के बाद भी अभिव्यक्ति में सुन्दरता और परिपूर्णता लाने की सतर्कता वे बराबर बरतते थे। न तो सब-कुछ खोल कर रख देने में ही उनका सौन्दर्य-बोध सन्तुष्ट होता था, न पहेलियाँ बुझाने में। उनका एक शेर है —

"न कह ये किस्सागो अफ़साने सब हुस्नो जवानी के,
तसव्वुर के लिए कुछ छोड़ दे तू भी कहानी के।"

सहृदय पाठक की कल्पना के लिए कवि को कुछ छोड़ देना चाहिए, उनका यह सिद्धान्त "अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च शस्यते" (वाणी का अर्थ कुछ प्रकट कुछ छिपा हो) के पुराने सिद्धान्त के बहुत निकट पड़ता है।

उनके कहने के ढंगपन का मुलाहिजा फरमाया जाये। बहुत बार हमलोग बाहर से आने वाली समस्त सम्भावित बाधाओं व विपत्तियों का विचार कर उनके प्रतिरोध की पूरी तैयारियाँ कर लेते हैं, किन्तु अपने मन में ही पलने वाले उद्वेगों की विस्फोटक शक्ति का अनुमान नहीं कर पाते। व्यापक धरातल पर कहें तो किसी व्यवस्था के भीतर पलने वाले अन्तर्विरोधों से अनजान रह कर उस व्यवस्था के समर्थक परिवर्तन की बाहरी शक्तियों का मुकाबला करने की बड़ी-बड़ी तैयारियाँ करते रहते हैं, किन्तु ये चेष्टायें भीतरी तूफान के सामने कितनी कमजोर साबित होती हैं। इस सत्य को किस खूबी के साथ समुद्र की लहरों और किसी के प्रतीकों के माध्यम से परवेज ने कहा है—

"भाँपे तो बहुत आपने हर मौज के तेवर,
किसी में जो पलता है वो तूफ़ान नहीं देखा।"

इसी तरह प्रबल जन-आन्दोलन के समक्ष सुविधा-भोगी वर्ग की केवल-मोगी नौकरशाही के सहारे बचने की चेष्टा की तुलना तेज तूफान के समय रेशमी झीलों के अन्दर रहने वालों की खूँटियों और एसियों के तनावों पर अवलम्बित सुरक्षा-भावना के साथ करते हुए उन्होंने कहा था—

"तूफ़ाने-तुन्द में ये रेशमी खीमे न ठहरेंगे,
कहाँ तक आसमानोंगे बफ़ादारी तनावों की।"

राह तो हमें अपनी खुद बनानी है और हमारी राह धरती पर ही बनेगी, उसमें ये सितारे, ये ग्रह-नक्षत्र क्या कर सकते हैं? भला इस पागलपन में परवेज मुशिफा कैसे हो सकते थे कि जमीन की बात आसमान से पूछने जाते। क्या बाँका अन्दाज है कहने का—

"हम अपनी रहगुजर कहकशों से क्या पूछें,
जमीं की बात भला आसमाँ से क्या पूछें।"

परवेज साहब ने अपनी कविताओं में आप बीती या जग बीती को ही उजागर करना चाहा था। जग बीती को वे आप बीती का विस्तार ही मानते थे, तभी वे कह सके थे कि दूसरों की आँखों में झाँक कर भी वे अपने चेहरे की तलाश में ही संलग्न हैं। जिन्दगी और शायरी के सहारे अपने को समझने की चेष्टा करने वाला यह कवि हठात् ही डाग्मैटिक नहीं हो सकता था, जिससे वह अपने सूत्रों को ही नहीं दुहराता रह सकता था अपने और दूसरों के आचरणों को भी गौर से देखता-परखता था। समाजवाद की कसम खाते और साम्राज्यवादी की शक्ल हथियार करते चीन के रवैये से परवेज साहब को सख्त सदमा पहुँचा था और जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी आपसी फूट के कारण दो टुकड़ों में

बंट गयी. तब भी उन्हें बहुत ठेस लगी थी। इस प्रवंचना के कारण उनके जैसे आत्मवान् समाज-सेवी को भी मटकाव और अकेलेपन का अहसास हुआ था। उनका दुखता दिल इस वर्तनाक शेर में फूट पड़ा था—

"रास्ते के पेचोखम में खो गया है कारवाँ,
मीर है गमख्वारों की कौन किसका साथ दे।"

मजा कोई यह समझे कि यह शेर भी उसी का है जिसने कभी कहा था—

"दो चार ही कदम पे कदम जिनके डगमगाये,
अच्छा यही कि वो न कभी मेरे साथ आयें।"

किन्तु मनुष्य पर उनकी आस्था अडिग थी, और यह आखिरी दम तक अडिग रही। यह गिरता-पड़ता आगे बढ़ता मानव अपनी लघुता में भी बहुत महान् है, परदेस के ही शब्दों में···

"मरी है जान इन जर्रों में, जितने आफ्ताबों की।"

बहुत ही प्यारा इन्सान था परदेसी। उससे असहमत हो लो, लड़ लो, झगड़ लो : किन्तु अलग नहीं हो सकते। प्यार की बफादारी के वे कायल थे। मतभेद अपनी जगह है, दिल का मिलाप अपनी जगह। दिल से मनोमालिन्य की आशंका को भी वे अपराध समझते थे, और फिर मनोमालिन्य होना भी कैसे? उसने दिल में गुबार के लिए कोई जगह तो छोड़ी ही नहीं है। भगवान से उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी तमाम असहमतियों के बावजूद बहुत सचाई से उनके लिए, अपनी ओर से उनका शेर दुहरा रहा हूँ—

"मैं और मुहब्बते कदूरत, ये जुर्म है,
तुमने जगह भी छोड़ी है दिल में गुबार की।"

(ज्ञानोदय से साभार)

परित्यक्ता की पाती

उमाचरण महापित्रा
द्वितीय वर्ष हिन्दी

●●

(१)

ओ सम्बोधनाधारी !
आयुन पड़-पड़कर मर गए सहते थे जिनको आलम्बनी
क्षितिजों तक तो दीख रहे थे चेतना के पास अनुगामी
कंगूरों शिखरों से तल पर उतरा नहीं साध्य-समर्पण
आवश्यकता थी? नहीं विचारा? ओछित मार्गों का तर्पण
दर्पण में का अक्स टूट गया बन-बन बिखरे बिम्ब कई
समेटती पुतुपुर !

(२)

अभिमन्त्रित रे !
कुहरे के शब्द-कोरा में कनक ज्योति-से भासित-से
दिखा गए शब्द, रूप, रस की वय गन्धित पगडंडी
पर विवेक के रहे तूणीरों में कर लक्ष्य शिखंडी
चक्रव्यूह चाहों का रच प्रीत का भोला अभिमन्यु
पंगा, पड़ा, गड़ा, मिटा ; समय का शापित कौरव-वासु
चिर स्थापित रे !

(३)

मौन मुख !
बह गई नदी, रुक गई लहर, विपर्यय की वेला
नियति ने गति के साथ यही खूट खेल पुनः खेला
पूरक और रेचक को ध्येय रहे हैं कुम्भक क्यों
संख्याओं के चमत्कार से दूर रहे गुणक क्यों
तिमिर घने, जिसका परसपेय पिये अकेला सूर्य-
मुखी फूल !

(४)

राहगीर !
पिघले शीशे, खौलता लोहे की गंभीर
अकड़ी जिह्वा, अभिव्यक्ति-द्वार लोहारी पीर
बादों के पंजर का छितराता पंख कीर
आज तलक न हल हुआ रागमुक्त अन्वेषक
समीर खण्डहरों की गतमाया का प्रेषक
वाचीर !

(५)

प्राह सत्य !
इस इमारत के ईंट-गिर्द
[इमारत अवयवों की लिङ्गकियों की]
मधुमक्खियों संचित विष के छत्तों की
बोझली परिवेश रही
जिसमें थे शब्द, पर नहीं कथ्य हैं
परित्यक्ता पक्ष सखी!

●

एक अलग टुकड़ा

● शम्भुनाथ
प्रथम वर्ष – हिन्दी

बाहर पर लौटते समय वह दो दिनों के लिए ठिठक गई थी। इस साल मार्च के महीने में ही कालबैशाखी के जोर पकड़ लेने के कारण दिन भर आसमान मटमैला रहता है और रह रहकर गर्म हवायें चलने लगती हैं। बिस्तर पर बहुत देर तक वह सिकुड़ी रही। थोड़ी देर पहले कहा था कि बदन में जोर का दर्द हो रहा है, मलें जैसे फट पड़ेंगी।

'सुनीता चलो देवी ने बुलाया है।' निम्मी आकर उसे झकझोरने लगी। "बहन! होड़ो न" वह गठरी बनकर पड़ी हुई थी। निम्मी को गुस्सा आया और उसकी तथा पेट के सारे हिस्से पर गुदगुदाने लगी। सलवार-कमीज पहने रहने के कारण वह एकदम बच्ची जैसी लग रही थी। सुनीता ने कहा भी था कि पिछली बार के आने पर जितनी बड़ी लग रही थी निम्मी और अब जैसे बढ़ने के बजाय घटी होती जा रही है।

तंग आकर तो सुनीता उठ बैठी। उसके चेहरे पर आलस का भाव था तथा बाहर घूमने के लिए जाते समय जो कपड़े पहने थे, वे चिड़मुड़ा गये थे। वह उधर कर निम्मी की ओर लपक पड़ी। वह हंसते हुए भाग गई थी। कमरे में सुनीता अकेली छूट गई। उसने देखा कि एक खुली हुई खिड़की से बरसा की फुहार आ रही है और धीरे-धीरे चारों तरफ अंधेरा छाता जा रहा है। वह जाकर खिड़की के करीब आन घूमकर खड़ी हो गई। छोड़े के सीखचों को पकड़कर सड़क पर देखने लगी, जहां बसें बहुत तेजी से चल रही थी और पुकी फुट पाथ पर अोवर कोट पहने हुए कुछ लोग आ-जा रहे थे। एक रिक्शा खड़ा था किसी डेम्पगोस्ट के करीब, जहां घुटना भर पानी जमा हुआ था। उसे ऐसा बोध हुआ कि वहां किसी व्यक्ति के आने का इन्तजार कर रही है, किन्तु अन्ततः अपने को टटोल कर पाया कि यह उसका भ्रम था। केवल दो दिनों के लिए वह यहां आयी हुई है और अपने किसी भी मित्र को इसकी सूचना नहीं दी। बल्कि इसकी जरूरत नहीं समझी।

भीगते हुए ही तुम्हाई लेकर वह पीछे की ओर मुड़ गई। चेहरे पर पानी काफी मात्रा में चिपक गया था, किन्तु इससे उसे ताजगी की ही अनुभूति हो रही थी। तौलिए से मुंह पोंछ कर वह अंगीठ के पास जाने की तयारी करने लगी। हिमी तभी कहीं से रोते हुए आ रहा था। लड़खड़ाते हुए एक जगह गिर पड़ा और ऊंचे स्वर से रोने लगा। सुनीता उसे गोद में उठाकर पुचकारने लगी।

'क्या हुआ बिल्ली···? किसने मारा···बोलो···।'

उसके एक गाल को आहिस्ते चूमकर उसे अपने हाथों पर झुलाने सी लगी।

'अच्छे बच्चे नहीं रोते, क्या बोलो आइसक्रीम···।'

आश्वस्त में डूबे हुए क्षणों में उसने अपने को ठीक से देखा। उसी की वह लड़कों की तरह किनारे ही मांग करती थी और सोम हरबार उसे इसी बात पर टोक देता था। एक और आग्रह थी उसे, सूख जाते होठों पर बीच बीच में क्रीम फिराने की और

संयोग से सोम भी ऐसा किया करता था। तब वह किसी छोटी और दुबली-पतली थी, सोम भी तब कितना सीधा दिखता, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। छोटी-सी उम्र में ही नोमेंस और सार्त्र की बातें केवल पढ़ा ही नहीं थी थी, समझकर वह इन पर बहस भी कर सकता था।

काफी हाउस का उसका वह बोहेमियन चेहरा सुनीता की आँखों में तैर गया। झुरझुराकर वह कमरे से बाहर निकल गई। गोद में सुन्ना था, जो सोता सा प्रतीत हुआ। बरामदे में आते ही अंदर के कमरे से ज़ोर से बातें करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हो सो उसके बारे में ही बातें हो रही थीं। कैसी लड़की है उसने महीनों के बाद लखनऊ आई, एक ऐसे शहर में, जहाँ शादी के पहले तक की उम्र इसी जगह के लोगों, यहीं की सड़कों, पार्कों और हीवारों के बीच बिताई थी। यहीं उसने पहचाना आदमी कितना अन्तर्मुखी और अपनी पूरी जिन्दगी को केवल उपलब्धियों के बीच फेंक देनेवाला होता है, सोम की तरह : और कितना उच्छृंखल और बाचाल होता है, अपर्णा की तरह। एक शोख बंगालिन का चेहरा उसकी आँखों के सामने उभर आया, जो उसके साथ ही पढ़ती थी। कैसी होगी वह? कालेज स्ट्रीट के मधोहाई चेहरे और वह उस वैसाखी गर्मियों के शुरू होने से पहले की। सब कुछ कितना पुँधला पड़ गया था।

सोम ने पूछा था—'किसको किसको खबर कर दूँ तुम्हारे आने का?

'दो दिन ही तो रहूँगी। रहने दो चुपके से आई हूँ, चुपके से चली जाऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा।'

अन्तिम बात उसने बहुत कातरता से कही थी। वह ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ निन्नी की है। ऐसे बोलती है जैसे आसमान सिर पर उठा लेगी। कुछ सोचती हुई वह झाड़न रूम के दरवाजे पर टंगे पर्दे को हटाकर भीतर घुसने लगी। सोफे पर अहूल, पड़ोस की मिसेज़ चोलानी और निन्नी बैठी हुई थी।

'आओ आओ सुनीता यहाँ बैठो। किल्ली सो गया क्या?'

'ना अहूल बहुत परेशान किये हुए है, इसी तरह घर पर भी हमलोगों को तंग कर देता है।'

'खैर आने दो बच्चे ऐसे ही होते हैं। सोम नहीं आया अभी तक।'

वह एक कुर्सी पर बैठ गई। निन्नी ने किल्ली को अपनी गोद में ले लिया था और वह सहमी हुई सी कमरे के फर्श को देख रही थी, कितनी चिकनी है, सचमुच।

'अरा इसे पकड़ो, मैं बगल वाले कमरे की बत्ती जला कर आती हूँ।' निन्नी बोली।

'हाँ काफी अन्धेरा हो गया होगा अब।'

किल्ली कुर्सी के एक पैर से खेलने लगा, सुनीता उसका एक हाथ पकड़े हुए थी। ●

बातें नहीं, जैसे होमगुल हो रही हो।

अंदर बोल रहे थे कि वह बहुत असमय चली आई है। यहाँ मौसम बहुत तेजी से बदलता है, अगर शरीर को इसका अभ्यास नहीं हो तो बहुत सम्भव आदमी बीमार भी पड़ जाय। पिछली बार जब आयी थी, तो जाड़े का समय था। उस समय की धूप यहाँ बहुत सुखावनी होती है और मन करता है कि इसके टुकड़ों को शरीर में चुनो-चुनो कर सेंक दूँ। सोम को उसकी आदत के मुताबिक यह बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी

कि यह विक्टोरिया है, यह लेक···यह चौरंगी की मार्क्वीज़ है। और यह ··· ···

'तुम मुझे पत्र क्यों नहीं लिखते ?'

'वैसे ही जो मैं लिखूंगा, तुम पढ़ नहीं पाओगी।' वह बहुत बेरुखी से उत्तर देता। जब वे साथ पढ़ते थे तो सोम की वह बहुत मदद किया करती; किन्तु आगे चलकर कैसा अपने को एक अपराधी सा महसूस करने लगी थी। शादी करके रायपुर चले जाने के बाद वह थोड़े महीनों के लिए उसे भूल गई थी और तभी तक उसे मालूम नहीं था कि शुरू से ही सोम उसे चुपचाप कितना प्यार किया करता था, फर्स्ट ईयर में ही यह जान लेने के बावजूद कि उसकी मंगनी हो चुकी है। और आज वह एकदम टूट कर बिखर गया प्रतीत होता है। कई कारणों से उसकी मनचाही प्रतिमा छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो गई हो जैसे। उसके बेटी अगर अच्छे खाते-पीते परिवार के नहीं होते, तो वह मामूली-सा सौ रुपयों पर कहीं चपक बन जाता और तब कभी कोई आशा नहीं थी कि मेज की फाइलों और चौकोर कुर्सों की जकड़न से मुक्त होकर कभी वह वैसा आदमी भी बन सकेगा, जैसा कि बहुत पहले उसने एकबार कहा था—मेरे मन में बहुत चाह है सुनीता, कि दुनिया को मैं वैसा कुछ दूं, जैसा कोई नहीं दे सका है अब तक।

और निम्मी बतलाती कि टेबुल लैम्प की रोशनी में वो कितनी रात तक वह पढ़ा और लिखा करता। वैसे इस बात पर बहुत चिनगुड़े थे, किन्तु उसे खुशी होती कि सोम अपने को बहुत सुगठित रूप में तैयार कर रहा है। वह ठीक ही बोलता है कि लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं ठीक ही, क्योंकि वह अजीब व्यक्तित्व का आदमी है। अजीब इसलिए कि वह जो कुछ भी है, उसे देखकर आसपास के लोग अजीब ही कहेंगे।

किसी विक्टोरिया पर रहा था और मंजुल उसे पुचकार रहे थे।

—'क्यों राजा बेटे, कब पूजा हमारे शहर में।'

संदर्भ से बिल्कुल कटकर यह मुखरा पड़ी। दोनों हाथ उठाकर किसी को पास आने को स्थिर कर रहा था।

'माम माम···!' उसके मुंह से अस्पष्ट रूप से निकला। वह हथेलियां थपथपाने लगी। निम्मी आकर 'ब्लाइंड-गर्ल' खड़ा लाई और स्थिर होकर किसी के सामने रख दी।

ट्रान्टिक के झूले के बीच वह निरन्तर घूम रही थी। घूमती जा रही थी। किसी इसे देखने लगा। सुनीता भी एकटक उधर देखती रही। एक ही ढंग से कुछ और उसके दिमाग में घूम रहा था और वह परेशान होने लगी थी।

मंजुल ने टोका—'भुवनेश्वर से ही वे रायपुर चले गये न! उसके रुकने के लिए क्यों नहीं कहा ?'

'वैसे ही उन्हें बड़ा जल्दी थी। अब तो उसके में मेरे परिवार का कोई नहीं रहता। उससे छोटे भैया की शादी हुई है, वे भी पिताजी को लेकर बम्बई चले गये हैं। वहां उन्होंने एक फैक्टरी खोली है न···!'

सुनीता ने बहुत धीरे-धीरे सब-कुछ कहा। मिसेज चोखानी फिर आने को कहकर चली जा रही थीं। पूछने पर मालूम हुआ किसी कालेज की प्रोफेसर हैं और बातों ही बातों में निम्मी को कुछ मदद भी दिया करती हैं। अपने भाई की तरह निम्मी भी हिसाब में बहुत कमजोर है और बहुत मुश्किल से पास मार्क आते हैं। उसके सीनियर

उतरते समय एक और व्यक्ति के पदों की आहट सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के लिए दोनों ओर से आवाजें रुक गईं थीं और फिर तेजी से किसी के ऊपर आने का एहसास हुआ।

अचानक जो आकृति आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई, वह सोम की थी। बरखा में वह कुछ भीग गया था और उसके चेहरे पर स्पष्ट बेचैनी के चिह्न थे।

डैडी ने कहा—'कितना भीग गया है, कपड़े तो बदल लो!' वहीं से घर वापस मुड़ गया। सुनीता सोचने लगी कि सोम आकर अपने कमरे में देखेगा कि उसके सामान कितने अस्त-व्यस्त हैं। सब डिम्पी का किया धरा है। वह मन ही मन बहुत क्षोभित हो जायगा, क्योंकि एक वैसे ही डिम्पी के प्रति उसके मन में उपेक्षा की भावना बनी रहती है। घर के सारे लोग उसे पुचकारते हैं, उससे खेलते हैं, लेकिन सोम हमेशा अलग-थलग बैठा रहता है, अगर डिम्पी उसकी गोद में रहता है।

कहीं वह भीतर भुन-भुना भी जा रहा हो……। डिम्पी के माध्यम से उसका गुस्सा उसके बाप के प्रति है, यही बहुत तेज।

●●

सुबह नाश्ता कर लेने के बाद से बदली छटने लगी थी। अखबार के मोटे हरफों पर एक उड़ती हुई नजर फेंक कर वह सोम के कमरे में चली गई। वह फर्श पर स्याही से बेढंगी आकृतियाँ बना कर काटता जा रहा था। इस पर कटा हुआ उसका अपना नाम भी था। सोम खिसककर उसने बहुत बुरी तरह फर्श से खरोंच दिया था। वह कुर्सी के पीछे खड़ी थी, सोम को हो तो इसका आभास मिल गया हो; लेकिन उसके सामने भी पहले की तरह बनाने-बिगाड़ने की क्रिया चल रही थी।

हठात वह रुक गया और पीछे घूमकर देखने लगा।

'अरे तुम, खड़ी क्यों हो? बैठो तो सही। अब से आई हो, एकदम चुप बनी रहती हो।'

'वाह! अपनी बात को दूसरों पर थोप देना बहुत चालाकी से सीख गये हो। चुप मैं हूँ या तुम बने बैठे हो! वह हँसते हुए कोठी और सोम के सामने ही मेज पर बैठ गई।'

वह अपने सूखे होंठों के बीच से मुस्कराया, लेकिन इसमें अब पहले जैसा तीखापन नहीं था।

'तुम्हारे घर पर ठहर कर कुछ बुरा तो नहीं किया!' खखलिखा कर हँसते समय उसके चमकते हुए दुधिया दाँत दिखने लगते थे। सुनीता ने गौर किया कि हर समय सोम की ऐसी हालत बनी रहती है या केवल उसके चकचका जाने पर ही बेचैन हो उठता है वह। ऐसी क्या बात हो सकती है कि सोम के जैसा इंटलेक्चुअल भी किसी जगह इतना नरम हो कि एक जरा-से धक्के में वह पूरी तरह टूट जाय। वह जानती थी कि तब भी उसने कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया। सिर्फ एक वह नहीं छूता है।

सोम अभी तक चुप था।

'बोलते क्यों नहीं……?'

'मैं सोच रहा हूँ कि तुमने इस तरह का प्रश्न पूछा क्यों?'

सुनीता अपने में लज्जा का अनुभव करने लगी।

'सॉरी……!'

'यैट्स आल राइट……।'

जैसे कोई रिकार्ड घूम गया हो और क्षण भर बाद दोनों को इस पर अफसोस होने लगा। सुनीता

को कल की बात याद आई जब मंजरी सोम के बारे में अपनी धारणा बदल रही थी। वे जैसे सोम से बेतरह डर गये हों, वही उनके मन में स्नेह का भाव नहीं था उसके प्रति। उनका गला फँस गया था, जब वे बतला रहे थे कि किस तरह एक आदमी को इतने करीब से गड्ढे में धँसते हुए देख रहे हैं और वह जब अपना बेटा हो तो .....।

'बहुत सारे सपने थे सुनीता, लेकिन मैं शुरू से देख रहा था कि इसके लक्षण ठीक नहीं हैं। मैं अपनी ओर से क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता।' उन्होंने कहा था और सोफे की पीठ पर सिर टिका लिया था। सुनीता अपराधी की तरह सब सुन रही थी। ऊपर और कुछ नहीं, केवल म ..... पा ... ट ... हत !

'सोम और कब तक शादी नहीं करोगे ? डैडी का कहना तो मानना चाहिए।'

वह एक बारगी ओर से हँस पड़ा। उसके मन में जो कसक उठ रही थी, सुनीता समझ गई, परन्तु अपने चेहरे पर वह कोई भी प्रतिक्रिया स्थापित करना नहीं चाहती थी।

'क्यों, तुम्हें चिन्ता कैसे... ...?'

सुनीता सहम गई।

'वैसे ही पूछ रही थी, तुम्हारा इस तरह टूटते जाना मुझे बर्दाश्त नहीं होता।'

डिम्पी को गोद में लिए हुए निन्नी आ रही थी। वह बुरी तरह रो रहा था। सुनीता ने देखा सोम की आँखें भयानक रूप से जलने लगी हैं, जैसे देख कर। वह डिम्पी को अपनी गोद में लेकर बाहर निकल गई।

'सच, जब से आया है, तब से पता नहीं क्यों रो रहा है।' सुनीता सोच रही थी।

'शायद अपनी देही के लिए रो रहा हो, अगली बार उन्हें यों अकेले छोड़ना क्या.....।'

तब से ही वह सोच रही थी कि अगली बार से वह चलेगी या नहीं। अभी तक वह कोई निश्चय नहीं कर पाई थी।

वह मुस्कराई ..।

'कल आठ बजे सुबह वाली ट्रेन से रवाना हो जाओगी, समझीं न निन्नी . ...?'

'धत्, क्या आज ही जाने की रट लगाने लगी। चार-पाँच रोज और ठहर जाओ ....मैं तो नहीं जाने दूँगी।'

सोम कमरे के भीतर से सब कुछ सुन रहा था। उसे इच्छा नहीं हुई कि बाहर निकल कर कुछ बोले।

.....निन्नी ने बच्चों के तरीके से सुनीता का कमर बाँध लिया।

'अरे छोड़ो तो सही, गिर पड़ूँगी ....। कल जरूर जाना है निन्नी, नहीं तो वे नाराज हो जायेंगे। देख ही रही है, मुन्ना कितना परेशान कर रहा है। चौबीस घण्टे केवल रोना.....।' वैसे वह यहाँ इससे भर रुकने की सोच कर आयी थी।

'अभी तो कुछ घूमना भी नहीं हुआ। क्या फायदा मिला यहाँ आकर ..।' निन्नी चबूतरे पर बैठ गई। सुनीता रेलिंग के पास खड़ी होकर मन ही मन सोचने लगी कि सचमुच क्या फायदा मिला शादी में यहाँ रुक कर....? अपने मन को टटोल कर पाया कि उसके प्रति वह मीठी संवेदना एकदम कट गई है जैसे .....। यहाँ इस घर में भी लगता है कि कोई सड़क पर खड़ी हो और आस-पास से गुजरते जा रहे हों अपरिचित ही अपरिचित। यही किसी बड़े मकसद में खो जाने का एहसास हो रहा था। इतना बड़ा शहर...।

और सामने बेबस देख रही है एक आदमी को, जो हांफता हुआ नाना प्रकार से अपने को नष्ट कर रहा है। अपनों की भीड़ में फंसा हुआ।

सोम पहले की तरह उदास है।

सुनीता को पुराने लोग याद आने लगे।

चल कर पूछूं क्या कि अपर्णा, बलराज, सुधीर, इला आदि कैसे हैं? किस तरह गुजर-बसर कर रहे हैं वे सब। ऐसा भी कोई है, जो बहुत नजदीक में हो.....? तुम तुम.. तुम...। ना... ।

'नहीं तो विकी, वह देखो कितने सुन्दर फूल हैं वहां बगीचे में। वहां देखो, वह बनती हुई नई कोठी।'

गुड बाय.....। हिलते हुए हमाल। दस आठ बजे वह विदा ले लेगी सब से। ट्रेन एक जोर की सीटी देगी और सोम दौड़ पड़ेगा कम्पार्टमेंट की खिड़की पकड़े हुए। हाथ से सलामें छूट जायेंगी—जहां ट्रेन गति पकड़ लेगी और वह हांफने लगेगा.....।

× × ×

सोम ने वही पुराना जवाब दिया था—'कोई साथी बना लूंगा सुनीता, तुम चिन्ता मत करो।'

प्लेटफार्म पर शोरगुल काफी था। कम्पार्टमेन्ट के भीतर का एक कोना बुरी तरह चिटका हुआ था, वह उसे ध्यान से देखने लगी। वह सोचने लगी कि विभी के ढेरों के पूछने पर वह क्या यही जवाब देगी कि काल बैसाखी के कारण ठीक से घूम नहीं सकी। कालेज स्कार्फ के नीले साटन का बेबस एक पच्चर लगाया था उन्होंने और जैसे पानी की सतह पर कई स्मृतियों के बिम्ब तैर गये हों।

'ऐसा लगता है सोम, तुम एक टुकड़ा बनकर रह गये हो।' उसने अपने से ही कहा, लेकिन गहराई से सोचा कि यह स्थिति कितनी पीड़ादायक होती है।

'फिर जरूर आना सुनी...। गाड़ी छूटते समय सोम ने कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्षण भर बाद प्यार से उसने विभी का गाल थपथपा दिया। वह अपलक देखने लगी।

'पुराने सभी साथी ठीक है न...?'

मुस्कराते हुए सोम ने कहा—'सभी चंगे हैं...।'

सुनीता ने जैसा सोचा था, इसके विपरीत सलाम पकड़ कर सोम दौड़ नहीं रहा था। शोरगुल पर खड़ी पार्थ बनकर स्थिर वह देखता।

●

"गीत"

● रसिक बिहारी शुक्ल

द्वितीय वर्ष – हिन्दी

निःशेष क्या न होगी सौंदर्य की पिपासा ?

बीते अनेक दिन हैं बीती अनेक रातें,
वापस न फिर मिली है बीती अनेक बातें,
वह जानते हुए भी कुछ सोचता है मुझको,
यद्यपि मिली धरोहर दुःखात्मिनी निराशा।
काहे लिये हृदय में सन्देह हो चुकी है,
गुंजार कर सके जो वह शक्ति खो चुकी है,
बन मौन पुष्प का वह सौंदर्य देखता है
बोझा भ्रमर हृदय में लेकर अपार आशा।

छलती हुई शिशिर से वह ज्योति जल रही थी,
घेरे पतंग सेना उसको, मचल रही थी,
जल कर गए बचे जो वे छटपटा रहे थे,
यह रूप का विमोहन वह मृत्यु का तमाशा।
प्यासे स्वरूप के ये जो हैं अशान्त भारी,
बन मस्त हंस रहा है सौन्दर्य का पुजारी,
अविचल अजर अमर वह कल्पान्त तक रहेगा,
उसके न पास आती वह नागिनी हताशा॥

बौना आकाश

● देवमुनि उपाध्याय
द्वितीय वर्ष, हिन्दी

इस बौने आकाश के नीचे,
सारी धरती तप्त है।
नदी नाले सब सूख गये हैं,
चारों तरफ परछाँयाँ पड़ गई हैं
एक गर्म प्रवाह,
धमनियों में बह रहा है,
होंठ के बिम्ब पर स्याह की खाती
छाया आ बैठ ली है।
मंजूषा में भर कर,
अपने सारे मन्तव्य-
बहती नदी में बहा दिये,
अब शेष सिर्फ,
गर्म लोहे के सलाखों के बीच,
धमनियों से उगलती,
आकांक्षाएँ रह गई हैं,
जो सारे परिवेश को—
दबोचे जा रही है।

दौड़ती तस्वीरें

● रामलखन सिंह
द्वितीय वर्ष, हिन्दी

फुटपाथों पर दौड़ती तस्वीरें,
अस्त व्यस्त संज्ञाएं,
गर्दन टेढ़े किए,
एक टक घूरती हुई,
परपर-सी आँखें
खोजती हैं,
कुछ पाने के लिए,
मुस्कराने के लिए,
दुखते पावों को सहलाने के लिए।
पर जो मिलता है उन्हें,
उससे—
छिल जाते हैं पाव,
मछली सी आँखें—
बाहर निकल झाँकने लगती हैं,
शायद मिल जाय कहीं—
संजीवनी-बूटी।

नये साल का बधाई-पत्र

● गुरुवस्तु, पंचम वर्ष, हिन्दी

संध्या को थका-हारा आफिस से लौटा तो श्रीमतीजी ने निवेदन किया, नया वर्ष आ रहा है, इसलिये दो-तीन नये साल के बधाई-पत्र खरीद लेते आईयेगा। एक अपनी बहन को भेजना है और शेष दो सहेलियों को।"

मैं ने कहा, "बधाई-पत्र की क्या आवश्यकता है? एक-एक पोस्टकार्ड ही डाल दो।"

बिगड़कर बोली, "पोस्टकार्ड ही क्यों, रंगीन पत्र ही क्यों न डाल दें?"

मैंने उन्हें मनाते हुए कहा, "भई हमने तो यूं ही हंसी की थी और सरकार ने उसे 'सीरियस' तौर पर ले लिया है।"

श्रीमतीजी तुनक कर बोलीं, "यह अपनी हंसी आप अपने पास रखिये। मुझे तो कल केवल तीन बधाई-पत्र ला दीजिये।"

मैं चुप हो गया। यह सोचकर कि शायद मेरी चुप्पी से श्रीमतीजी भी मौन हो जायेंगी और दिन-भर के थके-हारे बोझिल मस्तिष्क को थोड़ा आराम मिल जायेगा।

लेकिन हुआ इसके विपरीत। श्रीमतीजी ने फिर 'आल इण्डिया रेडियो' की तरह अपना वक्तव्य आरम्भ कर दिया। हां, इस बार उनका गरजना स्वर थोड़ा धीमा अवश्य पड़ गया था। जिस प्रकार किसी उद्दण्ड छात्र को पीटने के पश्चात् भीरु अध्यापक किसी अज्ञात भय से उसे प्यार से समझाने लगता है, उसी प्रकार श्रीमतीजी हमें समझाती हुई बोलीं, "आपको तो बात-बात में बिछली सूझती है। न जाने क्यूं आप हर बात को हंसी में टालने की कोशिश करते हैं! अब नये वर्ष के अवसर को ही लीजिये। नया वर्ष आ रहा है। मेरी बहन और मेरी सहेलियों ने इस नये वर्ष से कितनी आशायें लगा रखी होंगी। क्या इस अवसर पर हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी आशाओं के प्रति अपनी शुभकामनायें प्रकट करें?"

"क्यों नहीं, क्यों नहीं?" मैंने श्रीमतीजी की हां में हां मिलाने में ही अपनी भलाई समझी।

"तो कल फिर मेरे लिये बधाई-पत्र ला रहे हैं न?" अपने वक्तव्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंच कर श्रीमतीजी ने पूछा।

छुटकारा पाने के लिये मन में तो आया कह दूं कि ले आऊंगा। लेकिन फिर अपनी वास्तविकता का ध्यान आते ही कहना पड़ा, "वादा नहीं कर सकता। अवकाश मिला तो ला दूंगा।"

इस पर भी वो सन्तुष्ट नहीं हुईं। मुझसे पक्का आश्वासन सुनना चाहती थीं। उनका बस चलता तो शायद 'रेडियो-स्टाम्प' पर ही लिखवा लेतीं। मैंने फिर वही वाक्य दोहरा दिया, कि समय मिला तो लेता आऊंगा।

खैर, किसी तरह उनसे छुटकारा मिला।

दूसरे दिन नहा-धोकर 'आफिस' जाने लगा तो 'आल इण्डिया रेडियो' पर फिर वही घोषणा आरम्भ हो गई कि "देखिये, बधाई-पत्र आना भूलियेगा मत।"

श्रीमतीजी को किसी प्रकार सन्तुष्ट किया। आफिस पहुँचे तो देखा, दस मिनट लेट हो गये हैं। बड़े साहब बौखलाते हुए बोले, "काम करना है तो ठीक से कीजिये और सही समय पर आफिस आईये। आज आपके नाम के आगे 'ए' लग चुका है। अब आप घर जा सकते हैं।"

मन को किसी तरह समझा-बुझा कर घर लौट आया। और घर ही क्या सकता था?

मुझे इतनी जल्दी आया देख श्रीमतीजी कुछ हैरान अवश्य हुईं, पर मेरे बैठने के पहले ही पूछ बैठीं, "ले आये मेरे बधाई-पत्र?"

"नहीं!" संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर उनके सामने अपने अपराध की स्वीकृति करते हुए कहा, "मेरी के लिये आफिस' से आज निकाल दिया गया है। बड़े साहब पर अपना 'इम्प्रेशन' तो खराब हुआ ही, एक दिन का वेतन भी हाथ से चला गया। इसी चिन्ता में तुम्हारे बधाई-पत्र लाना भूल गया।"

"जी तो मैं पहले ही से जानती थी," दराज से तीन रंग-बिरंगे बधाई-पत्र निकालते हुए वे बोलीं, "इसलिये अभी-अभी मैं स्वयं जाकर इन्हें ले आई हूँ!"

मैं क्या उत्तर देता? चुपचाप पलंग पर बैठ गया। दुःख भी हुआ, इस बात पर नहीं कि वे स्वयं बधाई-पत्र ले आई थीं बल्कि इस बात पर कि मेरी नौकरी की उन्हें तनिक भी चिन्ता नहीं थी। इधर मेरी नौकरी को खतरा उत्पन्न हो गया था, और उधर वो अपनी बहन को बधाई-पत्र भेजने पर तुली थीं।

तब श्रीमती जी ने एक कार्ड पर हर्ष सुनाते हुए लिखना शुरू किया, 'अपनी प्यारी बहन मधु को!' मानों हम यह सुनकर जल रहे हों, ऐसा सोचकर फिर उन्होंने ऊँची आवाज के साथ लिखा, 'ईश्वर करे यह नया वर्ष तुम्हारी झोली में खुशियों के रंग-बिरंगे फूल खिला दे।'

सुनकर चुप रहा। मन में कहा, 'पहले अपनी मुरझायी बगिया में तो फूल खिला लो।'

वास्तव श्रीमती जी हमारी खामोशी को हमारी पराजय समझ गयी थीं। इसलिये घड़ी-घड़ी वो बधाई-पत्र हमारे सामने नचा रही थीं।

इसी समय डाकिया श्रीमती जी के नाम एक तार दे गया। वे उछलती हुई बोलीं, "देख लेना मेरी बहन ने मुझे नये साल की बधाई का तार भेजा होगा। सब आप ही की तरह कंजूस थोड़े ही है।"

झट कर पढ़ा। मधु का ही तार था। लिखा था —

'कल पर मैं भाग रही हूँ। सारी सम्पत्ति के साथ-साथ मेरा सुहाग भी जल गया। मैं कहीं की न रही।'

पढ़ते ही श्रीमती जी सिर थाम कर मेरे पास पलंग पर बैठ गयीं। जाने क्या सोच रही थीं? पर मैं देख रहा था, उस बधाई-पत्र को, जो कुछ क्षण पहले मुझे बार-बार दिखाया जा रहा था और अब कमरे की फर्श पर पड़ा हुआ फूल से नहा रहा था।

अनिश्चय की एक रात

वीरान और सूने शाम के
धुंधलके में—
कुछ धवला कुछ काला अन्धकार।
धूसर कैनवास के टुकड़े से आसमान—
पर,
फड़फड़ाते हैं चीलों की तरह :
समवर्षक विमान।
आहत, अपंग, अधमृत, अपाहत इतन्य
विपूर्णित अनवीथी—
महलों, कोपड़ियों के मलबों से
चीखते हैं .....
कराहते हैं.....
नाग के लंबहार में विषेले, विस्फारित
नयन-नृप
घूरते हैं दूर-दूर।
विकंपित अधर सम्पुट
कांपते हैं.....बस कांपते हैं.....
घुपचाप।
धूलिका की इस घुटुक सन्तान को—
रौंदते हैं बेदर्द, बेरहम, मदांध पैर
रौंदते हुये हजारों पैर.....
कोमल शिरवे टूट जाते हैं,
चिटक-चिटक कर।
दुग्ध-सनित चांदनी आंचल पसार कर
आ-आ चलती है अभिसार को ;
क्यों-क्यों ? तमी.....
राहु ग्रसता है मृगांक को—
बार-बार।
सुदूर पूर्व में उदित होता है—
भैरव, वेशर्म सूरज ;
सर में लपेटे कफन—
लाल.....लाल.....लाल।

● सुरेन्द्र प्रताप सिंह

इन्सान

● मीरा कांत
प्रथम वर्ष, हिन्दी

ये सब इन्सान हैं
क्योंकि
ये हैवान नहीं हो सकते
सिर्फ जो हैं
बस वही हैं
और कुछ नहीं।
ट्रामों, बसों में लड़ते हुए
नालों, सड़कों, कोठरियों और महलों में पलते हुए।
घास पर नमक या नमक पर घास पड़े !
इस पर उकसते हुए
खुले हुए पन्ने को ढंके से बंद करें
इसी पर नोंक झोंक
और बहस करते हुए
काफी हाउस के धुएं के गुब्बारों में
सिनेमा और दलों की चर्चा में
अपने आप से उलझे
ये सब इन्सान हैं।
हाथ लगा कर देखा, इन्हें
सर्द ! ! !
जितनी की मौत।
कोई अन्तर नहीं,
आज और कल के इन इन्सानों में,
फिर भी ये दम भरते हैं,
इन्सान होने का।
हर पर्व हर दिन शुरू होने से पहले
प्रतिज्ञा करते हैं (दबका बनने की)
और फिर सूरज ढलने के साथ
उसे भूला देते हैं
ताकि रात के अन्धकार में
ये इन्सान और सिर्फ
इन्सान ही रह सकें।

पुरानी पीढ़ी बनाम नयी पीढ़ी

● वीणा सोनी
प्रथम वर्ष (हिन्दी)

प्रत्येक समाज की प्रगति या अगति का दायेदार उसकी नयी पीढ़ी का रवैया माना जाता है। नयी पीढ़ी में क्रमशः नवापन आना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव प्रकृति परिवर्तनशील है। जो रूढ़ परम्पराओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विचार स्वातन्त्र्य, परिवर्तन तथा अपनी समग्रता में नवीन जीवनदृष्टि का अन्वेषण मान्य नहीं। वे अपने चारों ओर एक वृत्त बनाकर ऐतिहासिक धारा को उसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक नवीन जीवनदृष्टि अपने में सहज आकर्षण लिए हुए होती है। नयी पीढ़ी को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वह, जो अपनी पुरानी रूढ़ियों से असहमत होते हुए भी उनसे विद्रोह करने का साहस नहीं रखती। दूसरी वह जो पुरानी मान्यताओं को गूढ़ता को बखीमांति समझे बिना उसे बहिष्करण योग्य ठहराती है। पुरानी पीढ़ी आज की पीढ़ी को कर्तव्यों को कहीं पर नाफ़रमानी मानती है, तो कहीं विद्रोह। पुराने और नये का संघर्ष स्वाभाविक है, संघर्ष के बिना नई उपलब्धि सम्भव नहीं। केवल विद्रोह या वैमनस्य द्वारा रूढ़ियां नहीं तोड़ी जा सकतीं, वरन् पुरानी रूढ़ियों, परम्पराओं में जहां कहीं अड़चन या सड़ांध पैदा हो, उसे विनष्ट कर नूतन प्रतिमान प्रस्तुत किये जायें। आज जो कुछ हम हैं पुरानी पीढ़ी के दाय के रूप में हैं। कोई नया आयाम या विचार एकाएक नहीं उत्पन्न होता। उसका एक परिवेश होता है, जो दीर्घकालीन दबाव से नवीन उपलब्धि प्रस्तुत करता है। हो सकि फुलगी पर खिला पुष्प वृक्ष की जड़ एवं तने के अनगढ़पन पर झुंझलाये, कुछ हो तो उससे कोई लाभ नहीं, न ही उस वृक्ष से विच्छिन्न होने पर उसका अस्तित्व ही रह जाता है।

पुरानी एवं नयी पीढ़ी के मध्यवर्ती अन्तर को परखने के लिए तीक्ष्ण एवं गहरी पैठवाली दृष्टि की आवश्यकता है। नयी पीढ़ी की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं तो साथ ही उसने कुछ पुख्ता आयाम खो दिए हैं या खोने की राह में है। यद्यपि आज वैज्ञानिक उन्नति के युग में हम पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। फिर भी हम पर आरोप है पाश्चात्यानुगामी होने का। हम आज परम्पराओं से हटकर अपने अतीत से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति आधुनिक युग में हम पर हावी हो रही है, किन्तु प्रभावित होना भी एक सीमा तक ही श्रेयस्कर है, अन्धानुकरण हमें पतन की ओर ही ले जायेगा। नयी पीढ़ी के सम्मुख धार्मिक मूल्यों में भी अवमूल्यन हुआ है। हमें आज विनाशक आडम्बर निभाने का अवकाश नहीं है। एक ऐसा दौर चल रहा है कि हम हर कहीं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। पुरानी पीढ़ी में अदृश्य के प्रति जिस सुदृढ़ विश्वास की पूंजी है, उससे नयी पीढ़ी च्युत होती जा रही है। यदि संस्कारगत प्रभावस्वरूप नयी-पीढ़ी ईश्वर में आस्था रखती भी है तो आन्तरिक, वह पुरानी पीढ़ी की भांति दर्शाती नहीं

है, किन्तु वहाँ मानसिक अपरिपक्वता के कारण एक ऐसा वर्ग भी अस्तित्व रखने लगा, जो ईश्वर के प्रति झुठ है, जिसे हम नास्तिक कह सकते हैं। पुरानी पीढ़ी को अपने प्रारब्ध या भाग्य पर जितना विश्वास था नयी पीढ़ी का उतना ही अपने क्रिया-काण्ड पर यों दोनों का समन्वय प्रत्येक काल में होता रहा है।

नयी पीढ़ी में सब कुछ कर दिखाने की उमंग रह जाती है तो वह चाहती है कि उसके समाज उसे सराहें, बढ़ावा दें, इसके विपरीत परम्परागत पुरानी पीढ़ी अपना अंकुश प्रयोग कर अनुत्साह प्रदर्शित करती है और यही कारण है कि नयी पीढ़ी एक स्थान पर पुरानी पीढ़ी से एक तरह का विलगाव का झटका महसूस करती है। जैसे कि आज के विद्रोही (अपने को प्रबुद्ध समझनेवाले) नये साहित्यकार जब अपनी कृतियाँ समाज के सम्मुख रखते हैं तो पुरानी पीढ़ी के साहित्यकार उन्हें बाहियात जानकर पढ़ते ही नहीं और पढ़ते भी हैं, तो एक ऐसा फासला ले लेते हैं कि नयी पीढ़ी का साहित्यकार विक्षुब्ध से भर जाता है, क्योंकि उसने तो पुरानों को जाना, पढ़ा, समझा और पुराने ने उसके अस्तित्वको स्वीकार भी नहीं किया। ऐसा व्यवहार वहाँ पर चोट करता है, जो विद्रोह का जनक अवश्य है, किन्तु ऐसी स्थिति में कुछ लोग 'औद्धत्य' प्रदर्शित करने में पीछे नहीं रहते। प्रगति के चरण पर पहुँचने में एक संक्रान्ति काल से गुजरना पड़ता है, तब अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रतिष्ठित जनों ने अपने समय को भोगा, सहा, फिर वे ऊँचे उठे हैं। नये को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, ख्याति अकस्मात् मिलनेवाली वस्तु नहीं, प्रतिभा का पुरस्कार है।

नयी पीढ़ी की एक अन्य विशेषता है अपने प्रति ईमानदारी। वह अपने को वैसा ही प्रकट करती है जैसी वह है, किसी प्रकार का छद्मावेश, अवगुंठन नवेषन के अनुकूल नहीं। नयी पीढ़ी स्वीय को अधिक महत्व देती है, जब कि पुरानी पीढ़ी समाज और उसके मानदण्डों को प्राधान्य देती है। यह भी मान्य तथ्य है कि नयी पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा संयम की कमी है, दूसरे शब्दों में सन्तोष की कमी भी कहा जा सकता है, किन्तु प्रगति के मूल में असन्तोष का अंकुर कार्य करता है। पुरानी पीढ़ी में असन्तोष है तो इसी बात का कि जो प्रतिमान हमारे समय नहीं बने, जो सुविधायें हमने नहीं उपलब्ध कीं, उन्हें मात्र नयी पीढ़ी की उपलब्धि कैसे माना जाय।

नयी पीढ़ी के विचार उन्मुक्त हैं, उसके आचार-विचार, रहन-सहन में रूढ़ियाँ नहीं, इसका यह अर्थ नहीं कि वह बन्धन-मुक्त हो गई है। नहीं, वह एक प्रकार के बन्धन तोड़ कर अनजाने ही दूसरे बन्धनों में फँस गई है। आज की पीढ़ी अपनी ही कुण्ठाओं, मनोग्रंथियों में ग्रस्त रह संत्रस्त है। नयी पीढ़ी त्रिशंकु की हालत में है, यदि पुरानी परम्पराओं से भी छूट जाये और नया भी कुछ विशिष्ट रूप में अगर उसे हस्तगत न हो, तो उसकी नियति अन्धकार में हो जाती है। पुरानी पीढ़ी के पास अपने विश्वास हैं, किन्तु नयी पीढ़ी तो अभी निर्माण एवं सृजन की प्रक्रिया में है। इनके मानदण्ड समाज में पूर्वतः स्वीकृत नहीं हुए हैं। प्रतिभा एवं शक्ति कभी छिपी नहीं रह सकती। यदि नवीन जीवन-दर्शन में मौलिकता एवं विशिष्टता होगी तो वह स्वतः ही सफल होगी।

तुलसी का समन्वयवाद

● श्यामसुन्दर स्यानिया
द्वितीय वर्ष हिन्दी

भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास निस्सन्देह सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति को रसात्मक वाक्यमय के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा जीवन के मूलभूत मानों पर गम्भीरता से विचार कर सत्य का साक्षात्कार किया, उसको सुन्दर रूप में अभिव्यञ्जना की है, और उसे मंगलमयी संजीवनी से अनुप्राणित किया। गोस्वामी के समय में एक ओर लोक-वेद मार्ग के समर्थक सम्प्रदायों की वृद्धि हो रही थी तो दूसरी ओर इस्लाम से प्रभावित अनुमत सामाजिक ह्रासोपदेश करने वाले विविध पन्थों की। तुलसी अपने युग की इस विशेषता से अप्रभावित रहे तथा उन्होंने किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रवर्तन न किया, प्रत्युत शाश्वत वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा बनाये रखने को अपना कर्तव्य समझ कर इस कर्तव्य की पूर्ति के हेतु उन्होंने समन्वय बुद्धि से काम लिया। तुलसी द्वारा वर्णित रघुनाथ-गाथा 'नानापुराणनिगमागम-सम्मत है', अतः उनका दर्शन भी पुराण में प्रतिपादित दर्शन की प्रमुख विशेषताओं से युक्त है; जिसमें मानवतावादी दृष्टि, धार्मिकता, समन्वय भावना, औदारवादिता और भक्तिनिष्ठा का सन्निवेश है। उन्होंने पुराणों के प्रतिपाद्य विषय का ही नहीं, उनकी प्रतिपादन शैली का अनुसरण कर पौराणिक सृष्टि का परिचय देते हुए समन्वयवादी दर्शन की प्रस्तावना साहित्य के रसात्मक धरातल पर की, जिसमें ब्रह्मानन्दस्वरूप रस और ब्रह्मानन्दसहोदर रस का यह अभिन्न सह अस्तित्व अद्भुत रूप में विद्यमान है।

समन्वयवाद भारतीय संस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। समय-समय पर इस देश में जितनी ही संस्कृतियों का आगमन और आविर्भाव हुआ, परन्तु वे घुल-मिल कर एक हो गईं। यही कारण है कि महाकवि श्री रवीन्द्रनाथ ने "भारतवर्ष को महामानव का समुद्र कहा है।" जितनी ही दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सौन्दर्यमूलक विचारधाराओं का विकास हुआ; किन्तु उनकी परिणति संगम के रूप में हुई। यह समन्वय-भावना का ही परिणाम है कि नास्तिक बौद्धों ने राम को बोधि सत्व मान लिया और आस्तिक वैष्णवों ने बुद्ध को अवतार रूप में प्रतिष्ठा की। सांख्य योग एवं न्याय वैशेषिक में वेदान्त के ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई और वेदान्त में सांख्य की सृष्टि-प्रक्रिया, योग की ज्ञान साधना तथा न्याय की तर्क प्रणाली को गौरव दिया गया। अर्थ काम और मोक्ष में, वेद शास्त्र और लोक परम्परा में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में, साहित्य और जीवन में समन्वय स्थापित करने के विराट प्रयत्न किये गये, अनेकता में एकता स्थापना की गई, वैषम्य में साम्य का दर्शन किया गया।

समन्वय का व्युत्पत्त्यर्थ है: नियमित क्रम, संयोग, पारस्परिक सम्बन्ध। शब्द शब्द और अर्थ, भाषा और भाव, शासन और शूद्र आदि के समन्वय

की बात कही जाती है तब समन्वय का अर्थ होता है - उनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्वाह। यह उसका व्यापक अर्थ है। संकुचित अर्थ में इसका विशिष्ट अर्थ है—परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाली वस्तुओं या बातों का विरोध—परिहारपूर्वक सामञ्जस्य। तुलसी ने—तात्त्विक द्वैतवादी सांख्य और तात्त्विक अद्वैतवादी वेदान्त—इन दोनों मतों के प्रतीयमान विरोध का परिहार करके दोनों में सामञ्जस्य स्थापन की चेष्टा की। तुलसी दोनों ही अर्थों में समन्वय के साधक हैं। समन्वय सिद्धान्त का व्यवस्थित निरूपण और कार्यान्वयन मनगढ़ी का वृक्ष नहीं है। वह परस्पर अनुधावन-सूक्ष्म अन्वेषण और गहन अनुशीलन का परिणाम है, जैसा कि विनय पत्रिका में तुलसी इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं :—

सोइ निलोकि पुरान बेद मुनि समुझि बुझि गुरु ग्यानी
प्रीति प्रतीति राम पद पंकज सकल सुमंगल खानी ॥

तुलसी ने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में रहकर उसका साक्षात् अनुभव किया था। वे ब्राह्मण पुत्र थे, पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें 'जाति के सुजाति के कुजाति' टुकड़े खाने पड़े थे। द्वार-द्वार बीस सो माँगो को और मठाधीश का सुख-भोग भी किया था। उन्हें लोगों ने 'दशावतार' कह कर गालियाँ भी दी थीं, और महामुनि मानकर भूपतियों तक ने पाँव पूजे थे। वे यौवन की कामासक्ति के शिकार भी हुए थे और वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुँच कर आत्माराम भी हो गये थे। वे अर्द्ध-दग्ध पंडित मूढ़तरिता से निकल कर धर्म ज्ञान-विरति रामभक्ति की राजडगर पर आये थे। उनमें कवि की कारयित्री प्रतिभा, भक्त के निष्काम हृदय और समाज सुधारक की लोक मंगल भावना का अपूर्व समन्वय था। उन्होंने अपने अनुभव, अन्वेषण, शास्त्र ज्ञान और सहृदयता के आधार पर कवित्व, धर्म और भक्ति की त्रिपथगा का निर्माण किया। तुलसी की समन्वय साधना बहुमुखी है।

तुलसी ने कर्म भक्ति ज्ञान में अद्भुत समन्वय स्थापित किया। जीवन की पूर्णता इन तीनों के समन्वय में है। वही साधना सिद्धिदायिनी होती है जो साधक की पूरी सत्ता के साथ आवे। ये तीनों अन्योन्याश्रित हैं। सत्कर्म के बिना चित्त निर्मल नहीं हो सकता और मलाक्रान्त चित्त में ज्ञान-भक्ति का उदय असम्भव है। समाज व्यवस्था के लिए सदाचार अनिवार्य है। धर्ममय रथ से ही जीवन संग्राम में विजय मिल सकती है।

ज्ञानभक्ति से रहित कर्म मलजनक और बन्धन-कारक होता है। अतः तुलसी ने तीनों के समन्वय पर बल दिया। ज्ञान और भक्ति ही तत्त्वतः मुक्ति साधन है। कर्म, वैराग्य, योग आदि इन साधनों के साधन हैं। सांख्य योग और शांकर वेदान्त में ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है। तुलसी ने दोनों का समन्वय करते हुए विरति विवेक संयुक्त भक्ति और ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बतलाया है :—

'अति सभत हरि मगति पथ संजुत बिरति बिबेक'

राम भगत जग चारि प्रकारा।
सुकृती चारिउ अबध दुलारा॥
चहूँ चतुर कहुँ नाम अधारा।
ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा॥

भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने नवधा भक्तियों का समन्वय किया है। 'मानस' के तृतीय सोपान में लक्ष्मण को भक्ति का उपदेश करते हुए राम ने भागवत पुराण की नवधा भक्ति पर जोर दिया है और शबरी के प्रति उन्होंने 'अध्यात्म रामायण' की नवधा भक्ति का निरूपण किया है। दोनों साम्य हैं। अधि-

धारी की योग्यता के अनुसार कोई भी प्रकार ग्रहणीय है। भक्ति की श्रेष्ठता के तीन प्रमुख कारण हैं : मनोविज्ञान, अधिकारी की योग्यता और युग धर्म। मन स्वभावतः रागात्मक है। उसे आलम्बन चाहिए। भक्ति रागात्मिका वृत्ति है। वह मानव-मन के अनुकूल और सहज ग्राह्य है। प्रत्येक व्यक्ति सभी साधनाओं के उपयुक्त नहीं है, उसकी शक्ति सीमित है। मन साध्य कर्म मार्ग और कष्टसाध्य ज्ञान पंथ सबके बस की बात नहीं है। भक्ति सर्वोपयोगी है। कलियुग के अत्याचारी शासन की प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म पालन और ज्ञान साधना दुष्कर है। तुलसी ने भक्ति में भी नाम-भक्ति अधिक सहज तथा नरापर समझ कर अधिक मान्यता दी। उन्होंने कहा भी है—'कलियुग केवल नाम अधारा।' नामभक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह निर्गुणियों तथा सगुण मतों को समान रूप से मान्य है। इसके द्वारा इन दोनों भक्ति धाराओं का भी समन्वय हो जाता है। तुलसी ने मानस में स्पष्ट कहा है : —

द्विज निर्गुन नयनन्हि सगुन रसना राम सुगम।
मनहुँ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम॥

इसी प्रकार उन्होंने नाम के विषय में कहा :

"अगुन सगुन बिच नाम सुसारनो।
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥

मानस में कर्म के प्रति दृढ़निष्ठा भरत तथा हनुमान के चरित्र में प्रतिफलित हुई है। तुलसी ने हनुमान का सारा जीवन 'राम काज' के लिए तत्पर दिखाया है।

तुलसी के युग में तीन धार्मिक सम्प्रदाय प्रबल थे : वैष्णव, शाक्त तथा शैव। तुलसी ने इनमें समन्वय स्थापित किया। शिव, शक्ति और राम या विष्णु की स्तुतियों में प्रायः एक समान विशेषताएं बतलायी गयी हैं। राम और सीता ने स्वयं शिव और पार्वती की पूजा की है। शिव-पार्वती ने राम के प्रति उत्कट भक्ति-भाव की व्यंजना की है। 'रामचरित मानस' के श्रोता-वक्ता के रूप में शिव-पार्वती की योजना समन्वय भावना से ही प्रेरित है। शैवों के परम शिव, शाक्तों की परम शक्ति और वैष्णवों के परम विष्णु, राम के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। राम परम आराध्य हैं। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर राम, शिव और पार्वती से स्वयं कहलाया है :

संकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास।
ते नर करहिं कलप भरि, घोर नरक महु बास॥

शिव भी कहते हैं :—

जेहि लगि साधन बेद बखानी।
सब कर फल हरि भगति भवानी॥

तुलसी ने भक्ति के क्षेत्र में ब्राह्मण तथा शूद्र को समान स्थान दिया है तथा क्षत्रिय-श्रेष्ठ भरत और ब्राह्मण-रत्न वशिष्ठ ने निम्नवर्ण निषाद तथा केवट को आत्मविस्मृत होकर गले लगाते हैं :—

राम सखा रिषि बरबस भेंटा।
जनु महि लुटत सनेह समेटा॥

तुलसी का दार्शनिक समन्वयवाद अत्यन्त विवाद का विषय रहा है। तुलसी के युग में वेदान्त का प्रमुख था। उसके भीतर भी दो प्रकार के संघर्ष थे :— प्रथम सभी वैष्णव आचार्य शंकर के निर्गुण ब्रह्मवाद और मायावाद के विरोधी थे; द्वितीय सभी अद्वैतवादी पक्ष के द्वैतवाद के विरोधी थे। तुलसी शंकर के ब्रह्मवाद तथा रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद से मुख्यतया प्रभावित हैं। तुलसी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता स्वीकार कर सगुण साकार की भक्ति पर विशेष जोर देते हैं तथा निर्गुण सच्चिदानन्द घन ब्रह्म ही भक्तों के कष्ट के निवारण के लिए जगत में

जीवन करने की इच्छा से साकार रूप धारण करता है। तुलसी ने शंकर के निर्गुण ब्रह्मवाद तथा रामानुज और वल्लभ के सगुणवाद का समन्वय कर राम को साकार निर्गुण-सगुण कहा है : -

सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा।
गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा।
अकथ अगाध अनादि अनूपा॥

तुलसी अपने काव्य में अंशित भक्त सगुण रूप के उपासक हैं। उनकी भक्ति दास्य भाव की है। तुलसी ने त्याग तथा भोग में भी समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है स्वयं राम ने भोग तथा त्याग के समन्वय का आदर्श उपस्थित किया है। उन्होंने सीता का परित्याग कर पिता की आज्ञा का भोग किया : अश्वमेध के पश्चात् सम्पत्ति तीनों को बांट दी।

तुलसी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग का समन्वय करते हुए गृहस्थाश्रम में अनासक्त भाव से व्यवहार करने पर भगवद्भक्ति की उपलब्धि का निर्देश किया।

तुलसी साहित्य में पांच भिन्न जातियों : – देव, दानव, नर, वानर और किरात – के पात्रों का चित्रण हुआ है। तुलसी ने देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की संस्कृतियों का समन्वय करते हुए अन्त में राम राज्य की स्थापना द्वारा मानव संस्कृति की श्रेष्ठता दिखाकर मानवता को प्रतिष्ठा की है। तुलसी ने मुस्लिम संस्कृति तथा हिन्दू संस्कृति का समन्वय किया है। तुलसी की दृष्टि उदार थी तथा उन्होंने उदारता के साथ काव्य धर्म का निर्वाह किया है। राम की सेवा में प्रेषित 'विनयपत्रिका' का विधान मुगल सम्राट के पास भेजी जानेवाली अरजी की शैली पर किया गया है। 'कमरि बराक महाराज तेरी चाहिए' अथवा 'यह बड़ी भोर भूप दरबार' में दरबारी संस्कृति का प्रतिबिम्ब है। तलवार आदि शस्त्रों के वर्णन तथा अरबी, फारसी शब्दावली के प्रचुर प्रयोग में भी यह सांस्कृतिक समन्वय परिलक्ष्य है।

समन्वय साधक तुलसी के काव्य के तीर्थराज में धर्म, दर्शन और भक्ति की यह त्रिवेणी अनुपमेय है। इसमें आनन्द और मंगल का, स्वान्तः सुख तथा लोकहित का अद्भुत समन्वय है। तुलसी ने कवियों के काव्यरस और सन्तों के भक्ति-रस में अभेद स्थापित कर दिया है। उनका 'रामचरित-मानस' काव्य रसिकों की दृष्टि में श्रेष्ठ महाकाव्य, धर्मबुद्धि जनसाधारण का महनीय धर्मग्रन्थ है और विषयनिमुक्त मुमुक्षुओं के लिए भक्तिरस का अजस्र स्रोत है। तुलसी ने संस्कृत तथा प्रतिष्ठित जनभाषाओं—ब्रज और अवधी में काव्य रचना की। लोकवादी तुलसी ने जनता के हृदय की धड़कन को पहचाना तथा उन्होंने काव्य में सर्वतोमुख समन्वय विधान किया। उनकी असाधारण सफलता, महत्ता और लोकप्रियता का बहुत कुछ श्रेय उनकी समन्वय साधना को है। तुलसी के व्यक्तित्व में समाज सुधारक, लोकनायक, कवि तथा भविष्यद्द्रष्टा का गुण विद्यमान था, जिसने 'कागज के पत्रों को तुलसीदल जैसा बना दिया था।' इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तुलसी की समन्वय साधना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके द्वारा मानव कल्याण सम्भव है।

تو بھی لال چند بت کچھ بنائے گا نہ بنا لڑکا۔ لیکن لال چند تم نے اتنے اچھے کپڑے کہاں سے بنوائے؟

کراکھوں میں جانتا تھا لالہ کی والے بہت امیر ہیں۔ اس لئے مجبوراً یہ کپڑا کرائے پر لینا پڑا۔ ورنہ یہ لوگ کرتے کے آدمی کو بھلا منہ لگاتے؟

شام خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ اور یکایک اس کی طبیعت باغی ہو گئی۔ اس نے سوچا۔ کل میں کسی طرح اس کنجوس لالہ جی کا خون کر دیتا ہے۔ اور کرائے کے کپڑوں کی اس الماری میں اسے آگ لگا دیتی ہے تاکہ یہ کھیل ہی ختم ہو جائے۔

اور پھر اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے لالہ جی کا خون کر دیا ہے اور کرائے کے کپڑوں کی الماری کو آگ بھی لگا دیا ہے۔ اور اب وہ تیز رفتار سے چلا جا رہا ہے کہ

"آؤ لوگو دیکھو میں نے تمہیں نجات دلا دیا۔ اس لعنت سے اب تم کبھی اس صورت میں نہ بھنو گے۔"

- لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے گرد پچاس کروڑ آدمی جمع ہو گئے۔ جو بالکل ننگ دھڑنگ تھے۔ اور سردی سے ٹھٹھر رہے تھے۔ اور وہ رو رو کر کہہ رہے تھے:

"کیوں تم نے ایسا کیا؟ اب ہمارا کیا ہو گا۔ کیا اب ہم سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل رہے؟"

اور پھر جب اس کی نیند ٹوٹی تو وہ بہت پر سکون تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے بڑی حسرت سے کوٹ کی طرف دیکھا اور اپنی ماں کو بلا کر کہا۔

"ماں منّا سے جلد از جلد کوٹ لالہ جی یہاں بھجوا دو اور جیسے بھی ہو کرائے کا پیسہ دیدو۔"

"اتنی جلدی کیا ہے۔ ابھی تو مہمان نہیں گئے ہیں آج بھجوا رہنے دے۔"

- نہیں ماں اور اس کو مت دیکھو ورنہ نہ جانے کتنے بھائیوں کو نوکری نہیں ملے گی۔ کتنی بہنوں کی شادی نہیں ہو گی۔ اسے حفاظت سے بھجوا دو ماں۔"

قطعات در وفات حضرت پرویز شاہدی

(از۔ محشر اشرفی)

(۱)

بجھ رہا ہے گیسوئے گیتی
سونی سونی ہے محفلِ عالم
ہر طرف ہر جگہ ہے۔ اے محشر
مرگ پرویز کا بپا ماتم

(۲)

درد و غم کا سہارا نہیں ہے
کوئی پرساں ہمارا نہیں ہے
آج بھی بزم قائم ہے محشر
ہاں مگر بزم آرا نہیں ہے

(۳)

شاعرِ رنج و محن تھے پرویز
نافذ و شعر و سخن تھے پرویز
نکتہ رس۔ نکتہ بیاں۔ نکتہ شناس
حق یہ ہے ماہر فن تھے پرویز

(۴)

غم میں بھی شاد رہ گئے پرویز
ہنس کے ہر دکھ سہہ گئے پرویز
غم کی دنیا میں اب نہ آؤں گا
جاتے جاتے یہ کہہ گئے پرویز

واپس کرنا تھا لیکن اب کیا ہو گا؟

- اچھا جانے دے بیٹا کل واپس کر دینا۔

دوسری صبح جب سنتوش نے شام سے کوٹ مانگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اور اس نے روہانسی سی آواز میں کہا بھیا کل غضب ہو گیا۔ ہم بس میں کھڑا تھا۔ پھر ہرجا ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی۔ اور آپ کا کوٹ پھٹ گیا۔ شام کو جیسے چکر آ گیا۔

لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اور وہ کوٹ لے کر بھاگا بھاگا ٹرانی کلینرس کی دکان پر گیا اور رفو کرنے کا اسے دس روپیہ دینا پڑا۔

- لیکن شام کو کچھ بتانا تو چاہیئے۔

- کر دوں گا صاحب۔ دوکاندار نے کہا۔

پھر وہ بھاگا بھاگا گھر گیا۔ گھر پہونچتے ہی ماں نے بتایا کرنیل رام آیا ہے۔ یہ سن شام دوڑا کر دیکھنے وہ کوٹ آ رہے ہیں۔

- کتنا سنیہ ہے یہ بیٹا۔ تجھے نوکری بھی مل گئی اور تیری بن کی منگنی بھی ہو جائے گی۔ سنکر بے بھگوان ماں بار بار بھگوان کو یاد کر رہی تھی۔

- لیکن یہ سب کیسے ہو گا ماں۔ گھر میں آخر انتظار بات کے لئے بھی کچھ ہے؟

- بھگوان نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا!

پھر وہ بھاگا ہوا آفس گیا۔ آخر کسی طرح وقت کٹا۔ اور شام کوٹ لیکر گیا۔ وہ جلد سے جلد کوٹ لالہ جی کو واپس کر دینا چاہتا تھا اور پھر اسے بہانوں کے لئے بھی تو کچھ کرنا تھا۔ اور وہ بنیں خیالوں میں الجھا ہوا دھیرے دھیرے کار رہا تھا کہ کسی گاڑی نے ایک زور دار دھکا دیا۔ کوٹ کا بنڈل دور جا پڑا۔ شام کو کافی چوٹ آئی۔ اور اسے میڈیکل ایڈ کے لئے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ اور وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا۔ پھر جب شام کو ہوش آیا تو دوسری صبح تھی۔ اور ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ شام کے پاؤں میں کافی چوٹ آئی تھی۔ وہ اسی عالم غنودگی میں پڑا رہا۔ اور عجیب عجیب سپنے دیکھتا رہا۔ جب بہت رات گئے اس کی بہنیں لوٹیں تو اسے جاگتا پا کر اس کی بہن شارداکو دیکھنے لوگ کل آئیں گے۔ یہ خیال آتے ہی

اس نے اپنی طاقت کو یکجا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ: شاردا کی منگنی نہ ہو؟

پھر دوسرا لمحہ وہ اپنے آپ کو بالکل تندرست و توانا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسکی نظر اس بنڈل پر پڑی جس میں کوٹ لپٹا ہوا تھا۔ اور وہ چیخ پڑا۔ ہلاؤ اس منحوس کوٹ کو میری آنکھوں کے سامنے سے۔ میں کہتا ہوں ہٹاؤ۔ ماں اس کوٹ کو ہٹاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا رہا۔

اور اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی۔

نہیں بیٹا۔ جیسے اتار دیا ہے آج بھر اس کوٹ کو اسے رہنے دے۔ تیرے پاس تو ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ اور آج مہمان آنے والے ہیں۔ اگر تو اس حالت میں سے ملا تو کیا سوچیں گے۔ اور بھگوان نہ کرے اگر وہ شاردا کو اس لئے ناپسند کر دیں کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں تو کیا ہو گا!! نہیں شام میرا بیٹا آج بھر تو یہ کوٹ اور رکھ لے۔ اور اسے پہن کر ہی بہانوں سے ملنا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔

اور پھر مہمان آ گئے۔ شام نے کوٹ پہن تو لیا لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوٹ اس کے جسم سے آگ کی طرح لپٹ گیا ہے۔ اور اس آگ میں اس کا چہرا کندن بھنک رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں شاردا کے لئے بھی ایک ساڑی کا پارسل لے آئی۔ کتنی حسین لگ رہی تھی شاردا۔ جب وہ، اس ساری میں ہوس بھلائی خرامائی سی مہمانوں کے سامنے آئی۔ لیکن شام کو ایسا لگا جیسے وہ چیخ چیخ کر رو دے کہ "شاردا تیرے جسم سے ساری نہیں زہریلا سانپ لپٹا ہوا ہے"

لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔

اور اس کی بہن پسند کر لی گئی۔

رات کے وقت جب مہمان سونے کے لئے باہر لگے ہوئے گئے جو شام کے کمرے سے ملحق تھا۔ اس نے سنا مہمان آپس میں بات کر رہے تھے۔

- بھئی لڑکی کا باپ تو نہیں [redacted] معلوم امیر ہے۔ لڑکی کا سلاری دیکھ کر تو میری آنکھ چندھیا گئی۔

میرے پاس تو کل نہیں رو رہے ہیں اور وہ بھی پورے مہینے کا خرچہ"
شام نے گھبرا کر کہا۔

"لالہ جی ایسا تو نہ کرو۔ پہلی بار میں تو دھنسی رو رہے ہیں نے گیا تھا۔ یہ بچارا بہت غریب ہے نوکری کے لئے جا رہا ہے کچھ تو رحم کرو۔"
سنتوش نے سفارش کی۔

"دیکھو بابو جی پانچ روپیہ سے ایک پیسہ بھی کم نہ لوں گا۔ اور اگر کوٹ ایک دن سے زیادہ رہا تو اسی حساب سے کرایہ بڑھتا جائے گا۔ اور پھر جمع کے روپے تو دینے ہی ہوں گے۔ پورے ڈیڑھ سو کا کوٹ ہے۔"

کسی طرح سنتوش نے کرائے کو جمع کے لئے لالہ جی کو تیس روپے پر راضی کر لیا۔ اور قدرے تھکا تھکا سا جیسے میں اپنے گھر کی سمت چل پڑا۔

دوسری صبح جب وہ دفتر کوٹ پہن کر نکلا تو بہت جچ رہا تھا۔ واقعی وہ کوٹ بہت فٹ تھا۔ اسے وہ نوکری مل گئی۔ اور اسی روز کی اپوائنٹ منٹ لیٹر بھی مل گیا۔ انٹرویو روم سے نکل کر وہ سیدھا آفس کی طرف چل پڑا۔ وہ کتنا خوش تھا۔ وہ پورے اعتماد سے آفس کا کام کرتا رہا۔ پھر دوپہر کو جب وہ لائف انشورنس منسلک کے لئے کمپنی میں گیا تو چپڑاسی رکھنے وقت بیرا کا ہاتھ تھرا گیا۔ اور پوری پیالی شام کے کوٹ پر الٹ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بیرے کی دھلائی کر دے۔ لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ اور وہ کوٹ جھاڑتا ہوا خاموشی اٹھ گیا۔ وہ کوٹ کے نئے بہت فکرمند تھا۔ اسے کہ آفس میں شام کو اسے لوٹانا بھی تھا۔

اور جب شام کو پانچ بجے آفس سے اٹھا تو اس کا ذہن الفاظ کے انتخاب میں بری طرح الجھا تھا کہ وہ گھر جا کر نوکری مل جانے کی خبر کیسے دے گا۔ اور ہوا یہ کہ وہ بے خیالی میں کوٹ آفس ہی میں بھول آیا۔ اور پھر کچھ دور جا کر اچانک اسے کوٹ کی یاد آئی تو وہ بری طرح آفس کی طرف بھاگا۔ اس کے آفس میٹ نے چلا کر کہا۔

"ارے شام کہاں ہو"

"میں آفس میں کوٹ بھول گیا ہوں"

"تو کل لے لینا"

"نہیں مجھے آج ہی واپس کرنا ہے"

"کیا کوٹ ہے"

"کوٹ ..... نہیں نہیں اس میں کچھ ضروری کاغذات ہیں"

اور پھر بڑی مشکل سے اس نے دربان سے آفس کھلوایا اور کوٹ کے ملتے ہی ایک بار پھر گھر جا کر خوش خبری سنانے کی بات نے اسے مسرور کر دیا۔

وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر پہنچا۔ اور دروازے سے ہی اس نے خوشی میں چلا کر کہا "ماں ..... اری سنا رہا۔ تجھے نوکری مل گئی اور پورے چار سو روپے ماہوار کی"

پھر تو جیسے ایک کہرام مچ گیا۔ سب ہی خوشی میں ناچنے لگے اور شام نے شارو کی آنکھ دیکھ کر خوشی سے کہا۔

"پاگل بھی جائے پتا اگر خراب ہوئی تو میں اسی ماہ تیری شادی کر دوں گا"

بھیا! شارو اتنا سنکر باہر چائے خانے کی طرف بھاگ گئی اور پھر جائے پیتے پیتے اس نے رادھا کو یہ خوش خبری سنانے کو سوچا اور قصور ہی وہ کچھ اس طرح رادھا سے ہم کلام ہوا کہ اس پر ایک لطیف سی غنودگی طاری ہو گئی۔ اور پھر خاصہ تھوڑی دیر کے لئے اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے ساڑھے سات بج رہے تھے۔ اور اسے چائنا کوٹ لوٹانے کا خیال آیا۔

وہ بھاگا بھاگا ماں کے کمرے میں گیا۔ لیکن کوٹ نہیں تھا ایک دم اس نے چیخ کر پوچھ گھر کو سر پر اٹھا لیا۔

"کوٹ کہاں ہے"

"ارے تو اس میں اتنا چلانے کی کیا بات ہے وہ تو سنا پھنکر سنیما گیا۔ کہہ رہا تھا بھیا کا کوٹ بہت اچھا ہے اور نوکری کی خوشی میں مجھ سے ایک روپیہ بھی لے گیا" اس کی ماں نے کہا۔

"پھنکر سنیما چلا گیا۔ تا مجھ سے پوچھے"

"اچھا جانے دے کسی غیر کا تو تھا نہیں اپنے بھائی ہی کا تو ہے"

"ماں وہ کب آئے گا"

"شاید بارہ بجے! تو بجے کی گئی ہے"

"ماں وہ کوٹ میرا نہیں ہے کرائے کا ہے اسے مجھے آج ہی

حشمت الیاس

کرائے کا کوٹ

"ترنگ۔ ترنگ۔ ترنگ۔"

شام مسلسل کال بیل بجائے جا رہا تھا۔

"کون ہے بھئی؟" اندر سے سنتوش کی آواز آئی۔

"میں ہوں شام۔"

"ارے تو اندر آجاؤ نا دروازہ کھلا ہوا ہے۔" سنتوش نے کہا۔

"ہیلو سنتوش کیسے اچھے تو ہو؟"

"ہیلو شام اپنی کہو؟"

"سنتوش میں تمہارے پاس ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں۔"

"کہہ بھی چکو۔ جان حاضر ہے تمہارے لئے۔"

"مجھے تمہاری جان نہیں صرف وہ کوٹ چاہیئے۔"

"کون سا کوٹ؟ شام گھبرا گیا؟"

"وہی جو تم اس روز انٹرویو میں پہن کر گئے تھے۔"

"وہ میرا نہیں تھا شیام۔"

"پھر کس کا تھا؟"

"کرائے کا تھا۔"

"کرائے پر کوٹ بھی ملتا ہے؟" شام نے حیرت سے کہا۔

کیا نہیں ملتا میری جان۔ اگر چاہیئے تو چلو دلا دوں۔ لالہ جی بڑدس میں ہی رہتے ہیں۔"

"لیکن مجھے تو وہی کوٹ چاہیئے۔"

بالکل وہی ملے گا۔ ہے بڑا نیک کوٹ جو بھی پہن کر انٹرویو میں جاتا ہے نوکری ضرور مل جاتی ہے۔"

پھر وہ دونوں لالہ جی کی دکان کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے سنتوش نے کہا۔

"اور بتاؤ تمہاری بیس کا کیا حال ہے؟"

"تم رادھا کی بات کر رہے ہو؟"

"تو اور کس کی کر رہا ہوں۔"

"اس سے تو میں نے شادی بھی کر لی۔"

"اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی! جان سے مار دوں گا۔"

شادی تو ہوئی سنتوش لیکن چھپ کر۔ سندر میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تم رادھا کے پتا کو جانتے ہی ہو بھلا وہ تم جیسے نکمے کے ساتھ اپنی بیٹی کو کیوں باندھنے لگے۔ سنتوش اگر یہ نوکری نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔

اتنا تو لالہ جی کا مکان آگیا۔

"لالہ جی مجھے پھر وہی کوٹ چاہیئے۔" سنتوش نے کہا۔

"بالکل بابو جی وہی کوٹ ملے گا۔ لیجئے ابھی لایا۔

پھر تھوڑی دیر بعد لالہ جی کوٹ لے کر باہر آئے۔

"یہ لیجئے وہی کوٹ ہے نا۔ بس بیس روپے کرایہ اور پچاس روپے جمع کے دیہ لیجئے۔"

"بیس روپے کرایہ اور پچاس روپے جمع کے۔ لیکن

شاعر کے دونوں گالوں پر کان سے لے کر جبڑے تک دو گہرے، لمبے زخموں کے داغ تھے، شاعر کا نچلا ہونٹ موٹا اور بھدا ہو گیا تھا۔

کل شاعر کی آواز گم ہوئی،
آج شاعر صورت کھو بیٹھا،

کل شاعر لوگوں کو سحر زدہ کر کے جھوم جاتا تھا، آج شاعر حیرت سے کل کے واقعات کو سوچ رہا ہے، کیوں کہ شاعر سے اس کے بہت سے قریبی لوگ بھاگنے لگے ہیں۔

اس بار شاعر حوصلہ کھو دیتا ہے اور تنہا کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے،
شاعر کے بغل والے کمرے میں ایک موسیقی کی طالبہ رہتی ہے وہ شاعر کو بہت دنوں سے جانتی ہے،
وہ شاعر کو کل بھی پیار کرتی تھی،
اور آج بھی پیار کرتی ہے۔
وہ شاعر کے کمرے میں بغیر کسی آہٹ کے داخل ہو جاتی ہے۔
شاعر آئینے میں اس کا سراپا دیکھتا ہے اور اپنا چہرہ چھپاتا ہے،
لڑکی شاعر کے بہت قریب بہت قریب آ جاتی ہے،
وہ شاعر کے کان میں کچھ کہتی ہے، شاعر مسکرا دیتا ہے، لڑکی اس کے بدصورت چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے موٹے، بھدے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیتی ہے۔
شاعر بے ہوش ہو جاتا ہے،
لڑکی اسے ہوش میں لاتی ہے،
شاعر اسے اپنا دیوان دیتا ہے اور آخری بار مسکراتے ہوئے ایک شعر کہتا ہے اور اس کی گود میں دم توڑ دیتا ہے۔
حوصلہ کی فتح ہوتی ہے، شکست ایک بار پھر چور چور ہو کر صدیوں پیچھے کی تاریخ میں گم ہو جاتی ہے ؎

●●

ایک نظم — مشورہ

اس برفانی سردی میں تو
مسجد کے بند دروازے پر
کھڑا کھڑا کیوں کانپ رہا ہے
لے مجھ سے ماچس کی تیلی
آگ لگا دے اس مسجد کو
اور رگوں میں گرمی بھر لے

پڑھنے کی کوشش کی۔
اس دوران ایک عجیب سا سناٹا میرے اندر آنی کے اور کمرے کے اردگرد چکر کاٹتا رہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پرسناٹا کسی دیوان کی شرح کر رہا ہو۔
"آپ میرے متعلق، گیت اور دامن کے متعلق کیا کریں گے جان کر ــــ" اندرانی پہلی بار بولی۔ تیس سال سے اوپر کی عورت پہلی بار بولی۔
"پتہ نہیں کیوں میں آپ کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں ــــ کون سا درد ہے جو نغمے اور گیت کا بھیس بدل کر آدھی رات کو آپ کے دل میں طوفان مچاتا ہے ــــ"
اس کا درد میرے دل میں جاگنے لگا۔
وہ چپ سی ہو گئی اور پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں کالی جلد کی کوئی کتاب تھی جس کے اوراق وہ الٹ پلٹ کر کچھ سے نشان لگانے لگی ــــ وہ میرے قریب آئی اور اس نے وہ کتاب میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے نشان لگے صفحوں کو پڑھنے کے لئے کہا اور خود چائے تیار کرنے کا کہہ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔
وہ کتاب اس کی ڈائری تھی۔
نشان لگے صفحوں کو میں پڑھتا گیا، روتا گیا، پڑھتا گیا روتا گیا اور یہاں تک کہ میں مسکرا پڑا ہنس پڑا، کیوں کہ کرب میں نشاط اور مسلسل شکست میں توسل کا پس منظر تھا۔
وہ چائے تیار کر کے لے آئی میں نے ڈائری اسے واپس کر دی اور چائے پیتا رہا اور پھر وہ میرے ساتھ ساتھ گھر سے نکلی وہ میونسپل اسکول چلی گئی میں اپنے گھر چلا آیا۔
میں آفس نہیں گیا، دن بھر اپنے بستر پر منہ لپیٹے سوتا رہا۔ میرے ذہن میں ڈائری کے وہ صفحات دامن کے تاروں کی طرح لرزاں رہے۔
شاعر بہت خوبصورت تھا اور شاعر سے زیادہ خوبصورت اس کی آواز تھی۔
جب کبھی وہ اپنی کوئی نظم پڑھتا لوگ جھوم جاتے، خوبصورت شخصیت پر مترنم آواز لوگوں کو سحر زدہ کر دیتی۔
شاعر دل کا بہت اچھا آدمی تھا، اس کے بہت سارے جان پہچان والے تھے، ایک دن شاعر نے اپنے ایک دوست کو کسی کام سے منع کیا ــــ اس دوست نے اسے غلط سمجھا اور شاعر کو کھانے میں کچھ دے دیا ــــ شاعر بیمار پڑا، اچھا ہوا لیکن شاعر کی آواز کھو گئی، اب وہ ترنم سے پڑھ نہیں سکتا تھا۔
شاعر کو اپنی آواز سے بڑا پیار تھا،
اس نے حوصلہ رکھا اور اپنی آواز کی خاطر گلے کا آپریشن کروایا ــــ
آپریشن کامیاب ہوا، یعنی شاعر زندہ رہا لیکن شاعر کی آواز واپس نہیں لوٹی بلکہ اس آپریشن میں اس نے پھر کچھ کھو دیا ــــ
شاعر بدصورت ہو گیا،
اس کی خوبصورت شخصیت آپریشن کی نذر ہو گئی،

روشنی بجھی،
کھڑکی کھل گئی،
دامن کی آواز سنائی دی سینے کو روندتے ہوئے لوگوں کو تنہائی سے بچنے کی تلقین کرتی رہی،
آج میرے قفس کی چوتھی رات تھی، آج کی رات وہ کچھ گنگنا رہی تھی،
گنگناہٹ نے گیت کا روپ دھار لیا اور اس کی مترنم آواز اس کھڑکی سے اس کھڑکی تک ایک ریشمی آنچل کی طرح لہراتی رہی۔
رات کے ساڑھے تین بج گئے، گیت کا لہجہ سست پڑتا گیا اور پھر گم ہو گیا۔
پھر وہی سناٹا وہی تنہائی،
مجھے یوں لگا جیسے آسمان پر قوس قزح ابھرا تھا جو آسمانی رنگ میں تحلیل ہو گیا۔
میں نے سونے کی کوشش کی لیکن سو نہ سکا، کیونکہ میری آنکھوں کے پپوٹوں پر نیند کے قدموں کی کوئی چاپ بھی نہیں تھی،
دھندلا اور کسلایا ہوا آسمان اپنے چہرے پر نور کا پوڈر لگاتا رہا، پوڈر کی تہیں گہری ہوتی گئیں اور شہری کرنوں نے صبح کا گیت گانا شروع کیا،
نرملا اب تک سوئی ہوئی تھی، شال جسم سے لپٹتا نیچے چلا آیا۔
آج اس کا دروازہ بغیر قفل کے اندر سے بھڑا ہوا تھا،
میرے دستک دینے پر کسی سوال کے بغیر اندرا مالی نے دروازہ کھول دیا۔
آج زندگی میں پہلی بار یا ان چار دنوں میں پہلی بار میں نے اندرا مالی کا چہرہ دیکھا۔
وائلن اور گیت کا چہرہ دیکھا۔
زندگی اور حوصلہ کا چہرہ دیکھا،
"میں اندر آ سکتا ہوں ــــ؟"
وہ ایک طرف ہو گئی میں کمرے میں چلا آیا، خالی کرسی پر بیٹھ گیا،
وہ اب تک گم سم اور چپ چاپ تھی،
میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا کیونکہ اس کی نظریں ویران اور خالی خالی تھیں۔
"میں آپ کے مکان کے سامنے والی بلڈنگ میں رہتا ہوں، میری کھڑکی کے ٹھیک سامنے آپ کی کھڑکی ہے۔ چار دنوں سے میں آپ کا وائلن اور آپ کا گیت سن رہا ہوں۔ آدھی رات، وائلن اور گیت، آپ کا دکھ کس خوشی کا دیباچہ ہے ــــ" میں نے اس سے پوچھا۔
میں نے دیکھا اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں، پھر اس نے منہ پھیر لیا اور اپنی ساڑی کے آنچل میں کچھ جذب کرنے لگی۔
میں نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں سے میرے دل کی کتاب کو

صبح کب ہوگی،
ریڈیم ڈائل کی گھڑی میں ابھی صرف ڈھائی بجے تھے،
میری نگاہیں اندھیرے میں پریشان تھیں، کیونکہ نگاہوں کا تجسس کھڑکی کے اس پار جاکر بھید لینا چاہتا تھا۔
نغمے کا بھید،
سسکی کا بھید،
زندگی کا بھید ــــ!
صبح ہوئی، بہت مشکلوں سے، ایک طویل انتظار کے بعد،
رات کا سکوت، صبح کے ہنگامے کو کہیں دبکے ہوئے چپ چاپ دیکھتا رہا،
صبح کا ہنگامہ زندگی کی طرف بڑھتا ہوا ایک مصافحہ تھا،
صبح روز ہوتی ہے،
میری زندگی میں بھی، بہت ساری ان گنت صبحیں ہوئیں،
لیکن یہ صبح میری زندگی کی سب سے پُر تجسس صبح تھی،
کھڑکی بند تھی،
سامنے کی وہ کھڑکی بند تھی،
زندگی سے امید اور حوصلہ کی روانی سے متعلق کتاب کھڑکی کے اس پار بند تھی،
میری بلڈنگ کی طرح کوٹھے میں کوئی کوریڈور نہیں ــــ سامنے کی کھڑکی کا دروازہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن اس میں قفل لگا ہے،
پوچھنے پر معلوم ہوا اندرا رانی اسکول چلی گئیں۔
اس کا نام اندرا رانی ہے۔
اور وہ ایک میونسپل اسکول میں ٹیچر ہے۔
میرا تجسس ابھی کم نہیں ہوا ہے کیوں کہ میرے ذہن میں کلبلاتے سوال اس راہ کی تلاش میں ہیں، جہاں جواب کی محل چاندنی ہے۔
جواب سوال کے لئے بچھایا ہے اور گدیلا بستر ہے۔
دن گزر گیا رات پھر آئی، بلکہ جاڑے کی رات سنگم کے بوجھ تلے بھاری اور بوجھل ہوتی گئی، رات اونگھتے اونگھتے سو گئی، سناٹا جوان ہو کر تنہائی پر نوحہ پڑھنے لگا۔
روشنی جلی،
دھیمی ہوئی،
کھڑکی کا پٹ بند رہا،

میری بیوی نے بڑبڑانا بند کر دیا ہے، لیکن وائلن کے تار اب تک آہستہ آہستہ لرزاں ہیں اور ان لرزاں تاروں میں سے زندگی اور حوصلہ کا گیت خاموشی کے سینہ پر تیشہ مار رہا ہے کیونکہ خاموشی زندگی کی علامت نہیں، خاموشی موت ہے ــــ!

تین دنوں سے وائلن سن رہا ہوں،

دھیمی روشنی کو مٹا کر کوئی خوابیدہ تاروں کو چھیڑتا ہے تو آس پاس کی ساری فضاء اس آواز سے میٹھی ہو جاتی ہے۔

کس کا درد ہے جو رات میں جاگتا ہے لیکن آنسو بن کر نہیں راگ بن کر، گیت بن کر، نغمہ بن کر اور ترنم بن کر۔

کل صبح،

میں ضرور پتہ لگاؤں گا کہ وہ کون ہے جو اس طرح زندگی سے پیار کرتا ہے کہ اس کے حوصلہ کی بالیدگی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا جا سکتا۔

وائلن کی آواز سن کر یوں لگتا ہے جیسے وائلن بجانے والے کو موت کا کامل یقین ہو اور وہ اپنے اس یقین پر اتنا اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہو کہ وہ موت سے پہلے کی زندگی کو زندگی کا نغمہ،

حوصلہ کا بوسہ،

اور مسکراہٹ کا پیار دے کر آسودہ کر دینا چاہتا ہو۔

وائلن بجانا بند کر دیا گیا۔

اس کمرے سے لے کر سیٹی گھر تک صرف تین چیز میرے آس پاس کے سکوت کو توڑے ہوئے ہے:

میرے کمرے میں میری بیوی کے خراٹے کی بے ہنگم آواز،

میرے کمرے میں ٹک ٹک کرتی گھڑی،

اور نیچے سڑک پر پتلا دبلا سا سڑک کا آوارہ کتا،

کھٹ ک،

کھڑکی بند ہو گئی،

کمرہ میں پھر دھیمی روشنی پھیل گئی،

اس بار میرے کانوں نے ایک عجیب سی آواز سنی،

سسکیوں کی آواز،

رونے کی آواز،

تین دنوں کے درمیان آج پہلی بار میں نے گیت کو روتے اور نغمے کو سسکتے دیکھا،

گیت کیوں روتا ہے ــــ؟

آنسو کیا تبسم کی حسرت میں بہائے جاتے ہیں یا درد میں چھپے ہوئے نشاط کی آرزو میں یا زندگی کو اور حسین بنانے کے لئے ــــ

کہانی

فیروز عابد

درد کا حوصلہ

آج پھر سامنے کی کھڑکی روشن تھی۔
ہلکی، مدھم اور واٹین کی دھیمی روشنی بند کھڑکی کے تختوں سے آ رہی تھی۔
میں اپنی کھڑکی میں سمٹ آیا۔ میری کھڑکی کا دونوں پٹ کھلا ہوا تھا۔ لیکن کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ میری بیوی نرملا نیند میں گم سم خواب میں لت پت پڑی تھی۔
وہ بڑبڑا رہی تھی، پتہ نہیں کیا اور میں سننا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا بڑبڑا رہی ہے۔ کیونکہ میرا دھیان کسی چیز کی طرف کان لگانا نشک کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن میری نظر سامنے کی کھڑکی سے لگی رہی۔
روشنی اب بھی مدھم تھی۔
کمرہ خاموشی کا قفل ڈالے چپ چاپ اور سست تھا۔
یکایک دھیمی روشنی بجھ گئی۔
میں اپنی کھڑکی کے اوٹ میں ہو گیا۔
سامنے کی کھڑکی کے دونوں پٹ وا ہو گئے لیکن ان پٹوں کو وا کرنے والے ہاتھ مجھے سجھائی نہیں دیئے کیونکہ میں سات منزلہ بلڈنگ کی پہلی منزل پر رہتا ہوں اور وہ سامنے والی کھڑکی ایک منزل کے ایک لڑکے پھرتے کوٹھے میں ہے۔
روشنی نہ اب میرے کمرے میں ہے اور نہ اس کے کمرے میں۔
کھڑکی میری بھی کھلی ہے اور اس کی بھی۔
میرے کمرے میں میری بیوی خواب میں کچھ بڑبڑا رہی ہے اور میں خاموش، چپ چاپ اسے نظر انداز کئے ہوئے ہوں،
سامنے کی کھڑکی میں سے وائلن کی آواز دھڑکن اور آرزو کا ٹوٹا ہوا گیت لگ رہی ہے
وائلن کون بجا رہا ہے۔
کس کی آرزو ایک گیت کا روپ دھار رہی ہے۔
کس کی دھڑکن میرے دل کی دھڑکن بن گئی ہے۔
تین دنوں سے میں یہ بات سوچ رہا ہوں اور تین دنوں سے میں وائلن کا نغمہ سن رہا ہوں اور تین دنوں سے میں بے چین ہوں، کیونکہ اس کمرہ کو کرایہ پر لئے ہوئے تین دن ہوئے ہیں۔

— ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ تم نے ایک دن ہزاروں لوگوں کے ساتھ حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور ہم سب کو جیل میں قید کر دیا گیا — میں دن رات روتی تھی اور تم مجھے تسلیاں دیتے تھے — اور آخر ایک دن صرف میرے لئے تم نے جیل کی سلاخیں کاٹ ڈالیں۔ میں بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئی مگر تمہیں گولی مار کر مار ڈالا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک جیل سے بھاگ کر دوسرے جیل میں آ گئی ہوں۔ میرے لئے پورا فرانس ایک قید خانہ تھا۔ سو میں نے تمہاری دی ہوئی بندوق سے اپنے حلق میں گولی ماری اور مر گئی — کہتے ہیں اسی دن فرانس کا تختہ الٹ گیا — کیا یہ سچ ہے — ؟

"مجھے نہیں معلوم —" میں نے یکایک جھنجھلا کر کہا — "یہ کیا بکواس لگا دی تم نے — ؟"

"اور پھر میں نے تمہارا ساتھ اس وقت بھی چھوڑ دیا —" پاربتی کھلکھلا کر ہنسی —

"جب تم نے میرے حسن کی عبادت کرنی چھوڑ دی — تم نے اپنے بال بڑھائے اور جنگلوں میں مارے مارے پھرنے لگے۔ تمہیں اپنے دل کی دھڑکن میں بھگوان کی آواز سنائی دینے لگی — تم نے میری محبت کو مورکھ اور میرے حسن کو مایا سمجھا اور ایک برگد کے نیچے بائیس سال تک آنکھیں بند کئے دھیان میں بیٹھے رہے۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کرتے کرتے آخر مر گئی — کہتے ہیں جب برسوں بعد تم نے آنکھیں کھولی تھیں تو بھگوان نے تم سے کہا تھا "سور کھ مکتی تو پاربتی کے روپ میں ہے — اور تم بہت پچھتائے تھے — کیا یہ سچ ہے — ؟"

"مجھے کچھ نہیں معلوم —" میں نے چیخ کر کہا — "دور ہو جاؤ یہاں سے"

"اور پھر —" پاربتی کا لہجہ یکایک لمبی یادوں کے بوجھ سے ہانپنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اور اس کی بیتیں آنسوؤں کے بٹوارے میں الجھ گئیں — "اور پھر میں نے آخری بار تمہارا ساتھ اس وقت چھوڑ دیا جب تم نے میرے ہزاروں لاکھوں ٹکڑے کر ڈالے اور مجھے نیلام پر چڑھا دیا — میرے ہونٹ بیچ ڈالے۔ میرے بازو، میری کمر اور میری کوکھ کا ایک ایک کر کے سودا ہوا اور میں قطرہ قطرہ ہو کر ختم ہو گئی — اپنے جسم کے ٹوٹے ہوئے کٹورے میں تمہاری محبت کا امرت لئے ساری دنیا گھومتی رہی اور پھر ایک اندھی گلی میں ایک پاگل کتے نے مجھے کاٹا اور میں مر گئی — کہتے ہیں میری موت کے بعد بھی میرے نام کا نیلام ہوا تھا — کیا یہ سچ ہے — ؟"

"مجھے کچھ نہیں معلوم —" یکایک میرا لہجہ برف کی ڈلی بن گیا — اور میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پاربتی کا گرم دھڑکتا ہوا ہاتھ پکڑ لیا — "سچ کہو پاربتی تم پاربتی ہی ہو نا — ؟"

"میں —" اس نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا — "میں کوئی نہیں ہوں۔ پاربتی بھی نہیں ہوں — میں اکیلی ہوا کی اکیلی کہیلی ہوں — پورب سے آئی ہوں — پچھم کو چلی جاؤں گی۔ اور میرا نام انتظار کا پھول ہے —"

(ناول کا ایک باب)

●●

کہانی

سجاد نظر

اِنتظار کا پھول

جب میری زندگی کے کل پانچ برس باقی رہ گئے تو میں نے آنکھیں کھول دیں!
ایک گھنا جنگل تھا اور میں اکیلی تھی۔ رات بیتنے کو دو گھڑے ہو چکی تھی اور چاند پھیکا زرد آنسو بن کر پاربتی کی آنکھوں میں ٹپک گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
"پاربتی اب تم میرا ہاتھ چھوڑ دو ——"
پاربتی نے اپنی زرد آنسو والی آنکھیں اُٹھائیں اور مسکرا کر بولی:
"میرا نام پاربتی نہیں ہے ——"
"پھر —— ؟" میں نے کراہ کر کروٹ بدلی۔ میری بائیں طرف کی آخری پسلی ٹوٹ چکی تھی۔
"میں اکیلی ہوا کی اکیلی سہیلی ہوں —— پورب سے آئی ہوں پچھم کو چلی جاؤں گی اور میرا نام انتظار کا پھول ہے"
"پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو —— ؟"
پاربتی نے پھر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کا چاند میرے دل میں اتر گیا۔
"تمہیں یہ بتانے کہ میں بہت پہلے تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہوں ——"
"کب —— ؟"
"اس وقت جب ایک مغل بادشاہ کی حکومت میں تمہیں پھانسی دیدی گئی تھی۔ میں راج محل میں بیٹھی ایک ننگی تلوار زادی کی مرہم پٹی کر رہی تھی کہ کسی خواجہ سرا نے مجھے تمہاری موت کی خبر دی۔ میں بدحواس ہو گئی اور تمہارے غم میں خود کو آگ لگا بیٹھی —— کہتے ہیں موت کی آخری گھڑی میں درد سے بے چین ہو کر ایک بھرے ہوئے دھن میں کود پڑی تھی اور اس میں رہنے والی رنگین مچھلیوں نے بہت ساری تسلیاں دی تھیں —— کیا یہ سچ ہے —— ؟"
"مجھے نہیں معلوم ——"
"اور پھر میں نے تمہارا ساتھ اس وقت بھی چھوڑ دیا جب تمہارا سبز حویلی میں آنا جانا ہوا اور زمرد بیگم سے تمہارا عشق چلا۔ تم نے مجھے پورے لکھنؤ میں بدنام کیا اور شہزادے سے میرے ناجائز تعلقات کی افواہ اڑائی۔ پھر تم نے زمرد سے شادی کر لی اور میں نے اسی دن کوٹھے سے کود کر جان دیدی۔ کہتے ہیں سہاگ رات کو زمرد بیگم کے سہرے میں آگ لگ گئی تھی اور اس کا چہرہ جھلس گیا تھا —— کیا یہ سچ ہے —— ؟"
"مجھے نہیں معلوم ——"
اور پھر میں نے تمہارا ساتھ اس وقت بھی چھوڑ دیا جب فرانس کی فوجوں نے تمہیں گولی مار کر ہلاک کر ڈالا تھا۔

جام آبِ حیات دیتا ہے وقت ہر عارفِ حقیقت کو
کاٹ سکتی نہیں کوئی قینچی روح کے رشتۂ رفاقت کو

بالکل سچ ہے پرویز صاحب روح کے رشتۂ رفاقت کو کوئی قینچی نہیں کاٹ سکتی۔
آپ عارفِ حقیقت تھے اس لئے وقت نے آپ کو جامِ آبِ حیات بھی جیسے پی کر آپ امر ہو گئے۔
لیکن کیا روح ہی سب کچھ ہے ؟
جسم کچھ بھی نہیں۔
میں تو نہیں مانتا۔
بہت ممکن ہے جو پرویز صاحب سب کے ہیں ان کو کبھی موت نہ آئے۔
لیکن وہ پرویز صاحب جو کچھ لوگوں کے تھے ؟
پرویز صاحب دیکھئے نا۔ منی ثمینہ نہ تو روح کی رفاقت کو جانتی ہے اور نہ ہی کسی ایسے پرویز صاحب کو جو عارفِ حقیقت تھے۔ وہ تو صرف اس پرویز صاحب کو جانتی ہے جو اس کے باپ تھے۔
فضلت النساء تو صرف اپنے شوہر کو جانتی ہیں۔
اور میں..... میں صرف اپنے استاد کو۔
اور آپ کے قریبی دوست اپنے چہیتے دوست کو۔
پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ ہم سے نہیں بچھڑ گئے۔
میں مانتا ہوں کہ آپ کا آباد کیا ہوا "شہرِ گفتار" کبھی خاموش نہیں ہو سکتا۔
آپ نے قلم سے جو پھول کھلائے ہیں پژمردگی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتی۔
لیکن تثلیث کا جو ایک گوشہ ٹوٹ گیا اس کا کیا ہوگا ..... کیسے مان لیں کہ وہ نہیں ٹوٹا.....!!
اور پھر
وہ افکار ــــ جنہیں آپ نے زندگی کی کڑی سے کڑی آزمائش جھیل کر اپنے ذہن میں یکجا کیا تھا۔
اور جو اب تک الفاظ کی پوست میں تجسیم نہیں پا سکے تھے۔
کیا ان تمام افکار کی موت نہیں ہو گئی ــــ ؟
کیا وہ سب کے سب جل نہیں گئے ؟؟
اُف !! موت کتنی جھوٹی ہوتی ہے سچائی ہے ــــ
لیکن پرویز صاحب مجھے یقین ہے کہ آپ کی محبت بھری یادوں کا پھول کبھی بھی وقت کی ڈال سے سوکھ کر نہیں گر سکتا۔
کبھی پامال نہیں ہو سکتا !
کبھی نہیں مرجھا سکتا !
کبھی نہیں !! ــــــ کبھی نہیں !!!

وہ اسی طرح اپنے شاگردوں کے ایک ننھے سے قافلے کی رہبری کرتے رہے، اور ادب کی ٹیڑھی میڑھی دشوار گزار راہوں سے روشناس کراتے رہے اور چلنے کا انداز سکھاتے رہے۔

بحیثیت شاعر میں جہاں تک پرویز صاحب کو سمجھ سکا ہوں، شاعری کے مسلک سے شاید انھیں دو ہی چیزیں ملا گئیں۔ پہلی چیز تھی۔

پوری عالم انسانیت کے لئے ان کی محبت۔

اور دوسری

ایسی جہد مسلسل جو کچھ کھونے اور پانے کے جذبے سے یکسر بے نیاز ہو۔ وہ ہمیشہ رواں دواں رہنا چاہتے تھے۔ چشمے کی طرح اور کبھی تو انھیں منزل بھی مل جاتی ہے لیکن وہ سکون کی نیند نہیں سوتے اگر حقیقی سفر نہیں تو خواب سفر ہی دیکھتے ہیں، دیکھئے وہ خود کہتے ہیں ؎

منزل پہ بھی پہنچ کے نہ آئی سکوں کی نیند ہم ساری رات خواب سفر دیکھتے رہے

پرویز صاحب کو منزل سے کوئی انسیت نہیں تھی۔ اس لئے کہ منزل نام ہے ایک ٹھہراؤ کا اور ٹھہراؤ ان کی فطرت کے منافی تھا۔

وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو اپنے عزم و عمل اور پیہم عمل سے سرنگوں ہونے پر مجبور دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھئے تو کتنا حوصلہ ہے کیسا تسلسل ہے ان کی اس آواز میں ؎

حیات شوق شانہ کش کی اتنی عنصر نہیں دراز زلف یار کا ہے سلسلہ تو کیا ہوا

اور پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ پرویز صاحب کا جسم بہت تھک گیا۔ اور شاید انھیں منزل مل گئی۔ اور وہ سو گئے۔ ایک ابدی نیند — جو پھر نہیں ٹوٹتی —

پھر میں نے سوچا "کیا پرویز صاحب اب نہیں رہے ؟ ؟"

"کیا اب ہم انھیں کبھی پا نہیں سکیں گے ؟ ؟"

جی میں آیا انسانروؤں کہ دل کی ساری بھڑاس نکل جائے۔ اس لئے کہ ان کی رفاقت میں محبت و یگانگت کے جتنے پھول میں نے چنے تھے وہ سب کے سب یکایک سوکھ کر کانٹے بن گئے اور اب وہ احساس میں چبھ چبھ جاتے ہیں۔ اب ان کی چبھن برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن پھر سوچتا ہوں —

پرویز صاحب تو زندہ جاوید ہیں اور موت رہتی دنیا تک ان کے قریب سے بھی ہو کر گزر نہیں سکتی۔ پھر بھلا جو زندہ جاوید ہے اس کا ماتم مرگ کیسا ؟

پرویز صاحب آپ کو موت نہیں آ سکتی۔

آپ کبھی نہیں ہم سے جدا ہو سکتے۔

آپ تو وہ ہیں جسے مادر گیتی صرف جنم دیتی ہے، فنا نہیں کرتی — اور پھر آپ ہی نے تو کہا ہے ؎

موت کا کون نام لیتا ہے موت آتی نہیں صداقت کو
موت کے پاؤں کانپ جاتے ہیں دیکھ کر عزم اہل ہمت کو

اور یہی وہ دور تھا۔ جب پہلی بار ۱۹۶۷ء کی ۸ فروری کو میں اس عظیم ہستی کے قریب پہنچا۔ یوں تو میں پہلے بھی اس عظیم ہستی کو دو بار دیکھ چکا تھا، لیکن قریب ہونے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ لیکن اب ان میں اتنی تبدیلی آچکی تھی کہ میں پہچان بھی نہیں سکا۔ اور آخر مجھے کلاس کے نئے ساتھی سے پوچھنا پڑا۔

"کون ہیں یہ؟"

"پرویز صاحب ہیں"

مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ آخر پرویز صاحب کی اس رنگت کو یہ کیا ہو گیا، پہلے جب ۱۹۶۰ء میں میں نے انھیں دیکھا تھا تو اس وقت ان کی شخصیت اتنی پُرفریب لگی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا، گوری چٹی رنگت میں ہلکی سرخی کی آمیزش اتنی بھلی معلوم ہوتی تھی کہ تشبیہ دینے میں پسند چھوٹ جائے۔ اب ان کے اصلی دانت بھی نہیں تھے۔ اور نہ ہی وہ رنگت تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان کی آواز گونجی۔

"آپ نے بھی داخلہ لیا ہے؟" پرویز صاحب کی یہ پہلی آواز تھی جو مجھ سے متعلق تھی۔

"جی" میں گھبرا سا گیا تھا۔ بلکہ بے حد مرعوب ہو گیا تھا۔

لیکن پہلے ہی روز انھوں نے باتوں ہی باتوں میں کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ تمام جھجک دور ہو گئی۔

جہاں تک میری فہم کا تعلق ہے اور ڈیڑھ سال کی ان کی رفاقت میں میں جو کچھ سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ پرویز صاحب جتنے عظیم شاعر تھے اتنے ہی عظیم استاد بھی تھے اور جس موضوع پر بھی وہ بولتے تو وہ اتنا جامع ہوتا کہ سننے والوں کا وقت فیصلہ چھین لیتے۔ وہ جس کو اچھا کہتے ایسا لگتا گویا بالکل سچ ہے اور وہی اچھا ہے اور وہ جس کو برا کہتے وہ سچ مچ برا لگنے لگتا۔ یا یوں کہئے کہ انداز بیان اور تسلسل خیال کا ایک سیلاب ہوتا تھا جو اپنے ساتھ اس وقت سب کو بہائے جاتا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ بعد میں اپنی قوت فیصلہ اس رو سے اتفاق نہ کرے۔

آخر میں نے گھبرا کر ایک دن پوچھ ہی لیا۔

"سر! آپ کس شاعر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اور صحیح معنوں میں اردو ادب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے۔ اس لئے کہ آپ جب میر کو پڑھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ میر پر شاعری اتری اور انھیں پر ختم ہو گئی۔

بالکل ایسا ہی لگتا ہے جب آپ سودا کو پڑھاتے ہیں اور اسی طرح ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو یا اردو ادب میں سودا ہی سب کچھ ہیں۔

اور پھر جب آپ غالب پر کچھ بولتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان میں پہلی بار عظیم شاعر ہوا تو غالب۔

اور پھر جب آپ اقبال پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو لگتا ہے اقبال ہی سب کچھ ہیں۔ آخر کچھ کہئے گا بھی کہ واقعی آپ کی نظر میں اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟"

تو انھوں نے ہنس کر کہا تھا۔

"بھئی ہر شاعر اپنے اندر انداز بیان، طرز ادائیگی اور انداز فکر کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ انفرادیت ضرور رکھتا ہے یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ کسی شاعر کا اگر کوئی انداز میری روح کی گہرائی کو چھوئے تو میں اسے تمام شاعروں پر ترجیح دیدوں۔"

میں خاموش ہو گیا۔

ایک اعلیٰ نسخہ ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسا پیامبر ہے جس کے پاس آسمانی کتاب نہیں۔ اور اس کی آواز میں اس نے صداقت۔ محبت۔ امن۔ آشتی اور برابری کی نہایت ہی لطیف خوشبو محسوس کی۔ اس نے ہمہ تن گوش ہو کر اس کی آواز سنی اور پھر اپنے جسم کے تمام کپڑے تار تار کر ڈالے اور ایک "لال" روا اوڑھ کر پوری طرح اس کا ہم نوا بن گیا۔

اب نہ تو اس کا کوئی مذہب تھا اور نہ ہی اب وہ فرد تھا کسی جاہ و حشمت والے گھرانے کا۔ اس نے سب کچھ ٹھکرا دیا۔ سب کچھ، سارا۔ اب تو اس کے پاس ایک ہی چیز بچ رہی تھی اور وہ تھی پوری عالم انسانیت کے لئے اس کی محبت۔

محبت آدمی کو ہمیشہ مشکل ترین آزمائشوں سے دوچار کرتی ہے۔

اور یہی وہ دور تھا جب وقت نے گردش اور مصیبت کے بے تماشا کوڑے اس کے جسم پر برسائے اور یہ مفلوک الحال شہر شہر، اور گاؤں گاؤں پھرتا رہا۔ اسے تلاش تھی تو ایک سکون کی، لیکن وہ اس کے لئے عنقا تھا۔ لیکن اس کے ہونٹوں نے تو حرفِ مسکرانا سیکھا تھا، بسورنا نہیں۔ وہ مسکراتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کی عمر کا ایک عزیز ترین حصہ جیل کی تاریک کوٹھڑی کی نذر ہو گیا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ بدستور قائم تھی، اس لئے کہ اس کی روح اور اس کے احساسات بالکل آزاد تھے، پھر وہ کیوں ملول ہوتا۔ اور اسی قید کے دوران جب اس نے سنا کہ اس کا ایک اور دوست دور دراز ملک میں قید ہو گیا ہے تو اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا ؎

رابسن تم گاؤ ہم بھی گائیں گے گیت اب زنداں کے باہر جائیں گے

لیکن جیل کی تاریک کوٹھڑی سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے نجات حاصل نہیں ہوئی ۔ وہ آدمی تھا اور شاید آدمی فکر معاش کا ایک جزو ہے۔

اور تلاش معاش میں وہ در بدر ایک تنکے کی طرح اڑتا رہا۔

وہ تنہا تھا ۔ اور تنکا تھا ۔ ایک ایسا تنکا جسے اب تک کسی منقار نے آشیانہ بنانے کے لئے نہیں چنا تھا۔

اور پھر یکایک ایسا ہوا کہ تمام گردشوں نے اس کی محبت و استقلال کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے۔

اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب

"فضیلت" اس کے سر پر دستار بن کر بندھ گئی۔

اب وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک اور ہاتھ تھا اور اس کے قدم کے ساتھ ایک اور قدم اٹھنے لگا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کا بھی ایک گھر ہو۔ چھوٹا سا۔ پُرسکون ماحول والا۔ لیکن بھلا دو دیواروں کا کہیں گھر ہوتا ہے ایک دیوار کی اسے اور ضرورت تھی۔ اور ایک دن اس نے اپنے خوابوں سے ایک ننھی سی پری چرائی، جس کو اس نے "ٹیگور" کہہ کر پکارا۔ اب یہ تین تھے اور اپنی روح کے ان تین ٹکڑوں کو جوڑ کر اس نے ایک نئے انداز سے حیات بخشی، جسے اس نے "تثلیثِ حیات" کا نام دیا۔

اور اس کے بعد اس نے قلم سے ایسے پھول کھلائے کہ حیات جینے کا حوصلہ لے کر رقص کرنے لگی۔ اور پھر اس کی ذات پھیل کر ایک ایسا شہر گفتار بن گئی جس میں محبت ۔ عالمی امن ۔ صداقت۔ آشتی اور انسانی قدروں کے گیت جھوم جھوم کر گائے جانے لگے۔

اب یہ بہت عظیم انسان بن چکا تھا۔

لیکن یہ مختصر لمحہ اپنے اندر کتنی گہرائی اور کتنی گیرائی رکھتا ہے کہ آدمی زندگی بھر اس لمحے کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو بس ایک ہی دین ہے اور وہ ہے "ڈھیر ساری یادیں" شیریں بھی تلخ بھی، لیکن ایسی تلخی جس میں چٹخارا ہو شاید ایسی نہیں کہ زبان ہی اینٹھ جائے۔

جوانی شاید اس لئے اور بھی مختصر ہوتی ہے کہ یہ آتے ہی شعور کو بالغ کر دیتی ہے اور جب شعور بالغ ہو جاتا ہے تو جوانی کی امنگوں میں ایک ٹھہراؤ آجاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ پرسکون کھولن کی مدت طول کھینچے لیکن وہ ادل اُبال جو بڑے سے بڑے برتن سے بھی چھلک جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔

بالغ شعور آدمی کو کچے تجربات عطا کر دیتا ہے اور پھر اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس کے وجود کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر اس طرح کے سوالوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے، مثلاً

آدمی کیا ہے؟

مذہب کیا ہے؟

خدا کیوں ہے اور کہاں ہے؟

حیات و ممات کیا ہیں؟

دنیاوی علوم کے حصول نے اس طرح کے سوالوں کے بوجھ تلے اس کے احساسات کو بھی دبا دیا، اور اس نے سوچا۔ وہ تو آدمی ہے۔ اور پھر وہ آدمی کیا جس کی نگاہ زندگی کے ہر گوشے پر نہ ہو؟

پھر وہ ایک فلسفی بن گیا۔

اور انتھک و خیز اں ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں وہ ادب کی بہت ساری دشوار گزار شاہراہوں پر بھٹکتا رہا۔ دور بہت دور۔ اور شاید وہ بہت دور نکل جاتا کہ اچانک اسے خیال آیا۔

"وہ تو شاعر ہے۔ اور اس کا تو ایک ہی کام ہے دنیا تک محبت کا پیغام پہنچانا"

وہ فلسفی تو نہیں کہ ایسے سوالوں کا صرف جواب ہی تلاش کرتا رہ جائے۔ اور اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ سارے سوالات ایسے ہی ہیں جیسے بندھا گوبھی، جس کی تمام پرتیں الٹ دیجئے اور آخری پرت بھی پرت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ان راہوں سے بلند آواز میں یہ کہتا ہوا لوٹ آیا ؎

راہگذر ہی راہگذر ہے راہگذر سے آگے بھی ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے حدِ نظر سے آگے بھی

اب اس کا شعور پوری طرح پختہ ہو چکا تھا۔ اس کے احساسات پر تجربات کے گہرے نقوش ابھر آئے تھے اسی عالم میں اس نے اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیا اور اس نے ہر جگہ زندگی کو سسکتا ہوا پایا، انسانیت خون قضا سے لرز رہی تھی، اور محبت ـــــ جو گھبرا کر نفرتوں کی چھاتیوں میں سو بھی جا رہی تھی ـــ معصوم لبوں پر پژمردگی کی مہر بن کر چپک رہی تھی، بہنوں کی پُر حیا آنکھوں سے بھاگ رہی تھی۔

محبت۔ زندگی۔ اور انسانیت کی اتنی بھیانک تصویر دیکھ کر وہ کانپ کانپ گیا اور پھر اسی وقت اس نے ایک آواز سُنی جو دنیا کے تمام درماندہ، اور مفلوک الحال، مفلس اور مصیبت زدہ لوگوں کو اپنی طرف بلند آواز میں پکار رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ آواز جس شخص کے گلے سے نکل رہی ہے اس کے ہاتھوں میں تمام دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا

اس پھول کا منہ چومو اُس پھول کا منہ چومو
اور ہٹ کے الگ چومو تب لطفِ جوانی ہے

حسن محبت کی ملکیت ہے۔
اس لئے اس نے بھی ہر حسین شے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور اس پر اپنا حق تصور کیا۔ لیکن محبت کی ملکیت حسن ہے اسے یہ دنیا بھلا کب تسلیم کرتی ہے۔ اس کا تو ایک ہی شیوہ ہے محبت کے کاندھے پر وار رکھنا اور پھر ایک بڑی سی کیل اس کے سینے میں گاڑ دینا۔
اور حسن ـــ حسن کو سربازار نیلام کر دینا۔
اس لئے اس کی محبت پر بھی پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی اور سب سے پہلے اس کی آزاد فطرت پر نصیحت کا پھندا پھینکا گیا۔ لیکن وہ شوخی میں پھبتی کستا ہوا بھاگ گیا ؎

کیا چاہتے ہو شیخ جوانی کو کھو کر باقی کہیں دنیا میں جوانی نہ رہے

اور جب کبھی سختی سے پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جاتی تو اس کی آزاد فطرت احتجاج پہ اتر آتی ؎

کیا میری خطا اگر آنکھوں نے دو چار گلوں کو توڑ لیا
جب ایسی ہی پابندی تھی ہر پھول کو کانٹا ہونا تھا

لیکن ان پابندیوں نے اسے کبھی قنوطی نہیں ہونے دیا۔ اس لئے کہ حسن کی نگاہ نے کبھی اسے مایوس نہیں کیا۔ اور وہ اسی طرح محبت اور پیار کے ترانے جھوم جھوم کر گاتا رہا۔ اور اس کا وجود نسیم صبح کی اس پھبکی کے مانند بن گیا جو صرف گلشن کے پھولوں کو ہی کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور نہیں کر دیتی بلکہ کھیتوں کے میڑھ کے کنارے اُگنے والے ان خودرو جنگلی پھولوں کو بھی گدگدا کر ہنسا دیتی ہے جن کے حسن سے شاید کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا اور محبت و چاہت کی شاید جن پر ایک نگاہ بھی نہیں پڑتی۔
محبت بھری فطرت جب جوان ہوتی ہے تو پوری کائنات کو اپنی بانہوں میں جکڑ لینا چاہتی ہے۔
پھر اس نے محسوس کیا کہ مذہب و خاندان کے حدود جب تک اس کے وجود سے اُلجھے رہیں گے اس وقت تک وہ اپنی محبت کو آسودہ کر سکے گا اور نہ اس کائنات کو اپنے وجود میں مدغم کر سکے گا۔ اور پھر اس کی جوانی نے بیک اپنے اندر اتنی توانائی جمع کر لی کہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ۔۔۔۔ مذہب و خاندان کی تمام زنجیروں کو اپنے وجود سے نوچ کر پھینک دیا۔
اور اس قید سے آزاد ہو کر اس کا وجود اتنا خوش کن، اتنا لطیف اور اتنا پُرفریب بن گیا جیسے

سردی کی دھوپ!
گرمی میں برگد کا سایہ!
برسات میں ڈھیر رات گئے ڈھلی ہوئی چاندنی!

جوانی بھی کیسی عجیب چیز ہوتی ہے۔ کتنا مختصر ہوتا ہے اس کا ثبات۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے پھولوں پر صبح کے ملگجے اُجالے میں موتی جیسے شبنم کے قطرے جنہیں سورج کی اولیں کرنیں ہی چرا لیتی ہیں۔
بس ختم ہو گئی جوانی!!

اپنے آپ کو بہت بلندی پر پایا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مطلبی اور غریبی کی گندی نالی میں گندے کیڑوں کی طرح تیر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی محبت بہت ملول ہوئی۔ اس لئے کہ یہ تو اسے ایک ایسے میٹھے کے حاصل بنانا چاہتی تھی جو اپنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی کسی کو اس کے رُتبے کے لحاظ سے نہیں دیتا، اور نہ ہی صرف تشنہ لبوں کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کون اس تک اپنی پیاس بجھانے آیا ہے اور کون شخص اپنے ہاتھ اور پاؤں کی گرد دھونے، اور کون یونہی اس کے پانی سے کھیلنے۔ وہ تو ہر ایک کو سرشار کرنا چاہتا ہے اور پھر سب کو سرشار دیکھ کر خود سرشار ہو جاتا ہے۔

بڑے گھرانے کے رکھ رکھاؤ کے بعد بھی ایک قید تھی اور وہ قید تھی مذہب کی، اور اس نے محسوس کیا کہ مذہب کا مضبوط تار و پود بھی اسے بری طرح جکڑے ہوئے ہے اور اس کا شعور جو محبت کی اس آگ میں تپ کر اچھی پوری طرح کندن نہیں بنا تھا اس نے دامِ مذہب میں گرفتار رہنے پر کوئی احتجاج بھی نہیں کیا اور ایک عمر تک وہ رضائے قیم کی میں مشغول رہا۔ لیکن اس کے ذہن میں چھپی ہوئی محبت نے اس کی روح کو آسودگی نہیں بخشی، وہ یہی کہتا رہا ــــ "آخر وہ بے چین کیوں ہے؟" اور پھر اس نے دور دراز سے آنے والی ایک مدھم سی آواز سنی، کوئی نہایت ہی ہلکے سروں میں ورد کر رہا تھا۔

"The longest day and longest love
The longest day will pass and die."

اور اسے ایسا لگا جیسے یہ مدھم مدھم آواز خود اس کی روح کی اتھاہ گہرائی سے ایک رُوپہلے چشمے کی طرح پھوٹ رہی ہو، اور شاید یہ پہلا دن تھا جب اس نے اپنی روح میں بسنے والی محبت کو پہچانا تھا۔ اس کا کرب اور بڑھ گیا اور اس نے اپنی روح کو بری طرح بلکتا پایا۔ اس لئے اب وہ اپنے جسم اور روح کو پوری طرح آزاد کرنا چاہتا تھا اور جینا چاہتا تھا صرف انسان بن کر۔

انسان!

عظیم انسان!!

لیکن وہ مذہب و خاندان کے شکنجوں سے اپنے جسم کو آزاد نہ کر سکا، ہاں اتنا ضرور کر سکا کہ اس نے اپنی روح کو آزاد کر لیا۔

اور جب اس کی روح آزاد ہو گئی تو اس کا ایک ہی کام رہ گیا۔ وہ اب پہروں تنہا گلشنِ ادب میں آوارہ پھرتا اور ڈھیر سارے جگنوؤں کو پکڑ کر بہت خوش ہوتا۔ اور پھر جب عالمِ مستی میں وہ اپنے جگنوؤں کو فضا میں اُڑتے دیکھتا تو وہ تمام کے تمام آسمانِ ادب میں تارے بن کر ٹنک جاتے اور ایک عجیب سا مدھم اور لطیف روشنی سے پوری کائنات کو معمور کر دیتے۔ پھر وہ اس مدھم روشنی میں جس حسین شے کو دیکھتا وہ سمجھتا کہ وہ اسی کی ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں پر اس کا حق ہے اور وہ ہر حسین شے پر اپنا حق جتانے لگا۔

اس لئے اور بھی کہ اس کی روح میں بسنے والی محبت اب تنہا نہیں تھی، اب اس کی بیباک ایک سہیلی بھی آ گئی تھی جو جوانی تھی اور اس کی محبت بھری فطرت کو جوانی کی رفاقت نے اتنا بے باک اور سرمست کر دیا کہ وہ جھوم جھوم کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا لہرا کر گانے لگا ؎

ایک شخصیت ایک کہانی

وحید عرشی

"تم محبت ہو نا؟"

"ہاں! میں محبت ہوں۔"

"آج میں نے پہاڑی ندی سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بتایا کہ تم وہاں سے بھاگ آئی۔"

"ہاں، میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔"

"اور لاجونتی کے پودے نے بھی شرما کر تمہارے بھاگ جانے کی تصدیق کی۔"

"ہاں، میں وہاں سے بھی بھاگ آئی ہوں۔"

"اور ننھے ننھے پودے بھی ہلکی ہوا کی زد میں سر جوڑ کر سرگوشی کر رہے تھے۔"

"میں وہاں سے بھی بھاگ آئی ہوں۔"

"آج میں ہر جگہ سے بھاگ آئی ہوں... ہر جگہ سے... میں آج بہت خوش ہوں۔"

"تم بہت خوش ہو؟ کیا صدیوں سے تمہارے سینے کے سلگتے ہوئے تمام زخم مندمل ہو گئے؟"

"ہاں میرے سینے کے تمام زخم اب مندمل ہونے والے ہیں۔ آج میں بھاگ آئی ہوں اور جلد سے جلد شبنم کی ایک لطیف سی بوند بن کر ایک نوزائیدہ پھول پر ٹپک کر اس کی رگ و پے میں سما جاؤں گی اور پھر جب میں اس پھول سے خوشبو بن کر اڑوں گی تو ایک بار پھر یہ کائنات مہک اٹھے گی۔

اور مجھے کوئی بھی نہیں ٹھکرا سکے گا..... کوئی نہیں"

اور پھر وقت اپنی انجانی منزل کی سمت روانہ ہو گیا۔

اور وہ پھول ایک جاگیردار گھرانے میں پلتا رہا۔ اور پھر اس کی رگ و پے میں پلنے والی محبت کی اس بوند نے اس کی طبیعت میں ایک ایسا والہانہ پن، ایک ایسی برجستگی دے ساختگی، اور ایسی موزونیت بھر دی کہ اس کے ذہن نے گھبرا کر کل آٹھ سال کی عمر میں ایک ڈھلا ڈھلایا شعر اگل دیا جو یہ تھا ؎

ایسے نوکر جہاں میں کم نکلے　　خربچا میرا ہو، اُس کا دم نکلے

لیکن جیسے جیسے اس کا شعور پختہ ہوتا گیا اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں دولت و ثروت اسے وہ بلند و انفرادی مقام دینے کے لئے مچل رہی ہے جو اس کے آبا و اجداد کو دے چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت بڑے گھر کا فرد ہے، اس لئے اسے بڑے لوگوں کا رہن سہن، طرز گفتگو اور رکھ رکھاؤ سیکھنا ہے اور اس نے یہ سب کچھ بڑے سلیقے سے سیکھا۔ شاید کوئی وقتی جذبہ تھا جس نے اسے یہ سب کچھ سیکھنے اور سمجھنے پر مجبور کیا تھا۔ اور پھر جب اس نے

عباس علی خاں بیخود

غزل

ہلکا سا اس میں رنگ نہ ہوتا جو یار کا
ہرگز دلوں پہ رنگ نہ جمتا بہار کا
دھوکا نظر کا ہے چمن رنگ و بو نہیں
یہ تو خزاں نے روپ بھرا ہے بہار کا
اچھا ہوا موت آ ہی گئی انتظار میں
کوئی نہیں بھروسہ تو رہا انتظار کا
شانہ کے دل سے زلفِ پریشاں کے پوچھ تو
جو حال پوچھنا ہے دلِ بے قرار کا
موت آ رہی ہے وعدے پہ یا آ رہے ہو تم
کم ہو رہا ہے درد دلِ بے قرار کا
تم سے کرم تو درد ستم بھی نہ ہو سکا
ہوں شکوہ سنج میں ستم روزگار کا

بیخود پڑا تھا در پہ تو پوچھی نہ بات بھی
اب حال پوچھتے ہیں غریب الدیار کا

○

پروفیسر عبدالرؤف

"قربت"

خوشا یہ لمحہ کہ بیٹھا ہوا ہوں میں خاموش
وفورِ شوق سے سرشار، اپنی فکر میں گم
کچھ ایسا لگتا ہے مجھ کو کہ دور ملکوں میں
ہیں میری طرح سے کچھ لوگ اس گھڑی بیٹھے
نیازِ شوق میں گم، اپنی فکر میں ڈوبے
میں دیکھتا ہوں کہ وہ سر بجیب بیٹھے ہیں
فرانس، جرمنی، ہسپانیہ اور اٹلی میں
پہنچتی ہے جو نظر اور دور ملکوں میں
تو دیکھتا ہوں کہ جاپان، روس، چین میں بھی
خموش بیٹھے ہیں کچھ لوگ اپنی فکر میں محو
زبانیں ان کی ہیں گو مختلف مگر ان سے
میں اپنے آپ کو اتنا قریب پاتا ہوں
کہ جیسے میرے ہی اہلِ وطن ہیں وہ سب لوگ
خوشا یہ جذبۂ باہم کہ بُعد ختم ہوا
یقین ہے کہ ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن
پیام دیتی ہے اک دوسرے کو الفت کا
ہے اطمینان کہ میں ان کے درمیاں رہ کر
گزار دوں گا مسرت میں زندگی اپنی

(ویٹ مین کی ایک نظم کا ترجمہ)

پرویز شاہدی

غزل

موقعِ یاس کبھی تیری نظر نے نہ دیا
شرطِ جینے کی لگا دی مجھے مرنے نہ دیا

کم سے کم میں غمِ دُنیا کو بھلا سکتا تھا
پر تری یاد نے یہ کام بھی کرنے نہ دیا

اس رفاقت پہ فدا تیری پریشاں حالی
اپنی زلفوں کو کبھی تو نے سنورنے نہ دیا

تیری غمخوار نگاہوں کے تصدق کہ مجھے
غمِ ہستی کی بلندی سے اُترنے نہ دیا

میں نے دیکھا ہے ترے حسن خود آگاہ کا رعب
اجنبی نظروں کو چہرے پہ بکھرنے نہ دیا

وہ تری سرخیِ عارض کے قریب آ نہ سکی
رنگ جس فکر کو بھی خونِ جگر نے نہ دیا

حسنِ ہم درد ترا ہم سفرِ شوق رہا
مجھ کو تنہا کسی منزل سے گذرنے نہ دیا

کتنی خوش ذوق ہے تیری نگہِ بادہ فروش
خالی رہنے نہ دیا جام کو بھرنے نہ دیا

اداریہ:۔

حرفِ آغاز

پرویز صاحب اب نہیں رہے۔ اس لئے یہ میگزین ان کی عظیم اور پُرخلوص آرا سے یکسر محروم ہے۔ دیکھئے! ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم نے اپنے تئیں اسے بہتر سے بہتر بنانے کی سعی کی ہے چشم پوشی نہیں کی، پھر بھی اگر اس میں آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو اسے ہماری کوتاہی ہی سمجھئے۔

شاید کلکتہ یونیورسٹی کی پوری تاریخ میں پہلی بار اردو کو چوبیس صفحات ملے ہیں۔ اس طرح اداکین یونین نے جس اُردو دوستی کا ثبوت دیا ہے ہم اس کے لئے ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ زائد صفحات کے پیش نظر امسال ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی عظیم تخلیق کو بھی اس میگزین میں شامل کر لیا ہے۔

ہماری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس میگزین میں پرویز صاحب کی بھی تصویر ہو۔ اور کم سے کم چاروں سکشن میں پرویز صاحب پر مضامین چھپیں، اور جب ہم نے یہ تجویز پیش کی تو۔ اس میگزین کے ایڈیٹر سومن گھوش نے پوری پوری تائید کی۔ اس کے بعد انگلش۔ بنگلہ اور ہندی میں پرویز صاحب پر کئی مضامین آئے۔ لیکن ایڈیٹوریل بورڈ کو پروفیسر عبدالرؤف صاحب کا وہی مضمون پسند آیا جو "اسٹرگل" میں شائع ہو چکا تھا۔ اور ہندی میں شاستری جی کا مضمون جو "گیانودے" ہندی میں شائع ہو چکا ہے اور بنگلہ میں خود سومن گھوش کا مضمون جو مختصر مگر تاثرات سے لبریز ہے، پسند آیا۔ اس کے لئے ہم کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس لئے کہ پرویز صاحب صرف اُردو والوں کے تو نہیں تھے۔ وہ تو سب کے تھے۔

اب اخیر میں ہم جناب وسیم الحق (ایڈیٹر اسٹرگل) جنھوں نے بلا تامل پرویز صاحب کا بلاک دیدیا) اور راسم بھیا جنھوں نے پرویز صاحب کی تصویر کی فراہمی میں ہماری مدد کی (جو کلاس روم میں آویزاں ہے) اس کے لئے ہم ان دونوں حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور فیروز عابد کا بھرپور تعاون اس میگزین کی کتابت و طباعت کے درمیان شامل رہا ـــــ مجھے سخت افسوس ہے کہ کتابت ہو جانے کے باوجود حیدر علی خاں کی کہانی "ٹیس یادوں کی" صفحات کی کمی کی وجہ سے چھپ نہ سکی۔

نصیر
وصیہ عرشی

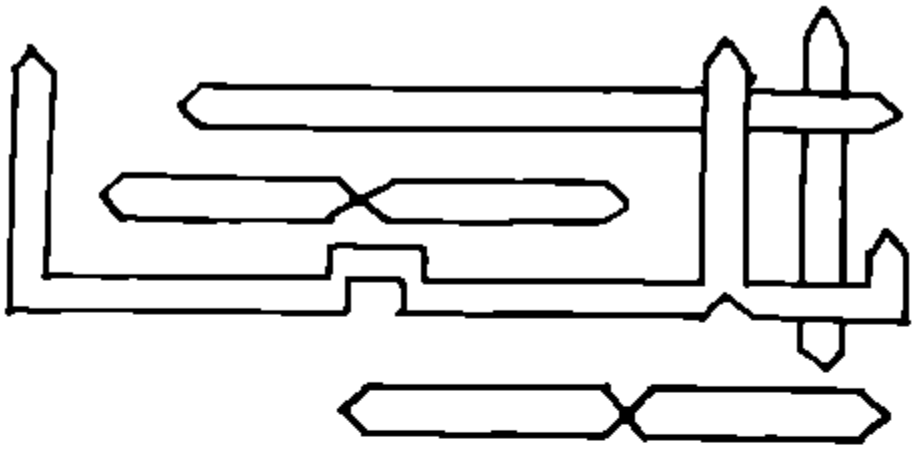

کلکتہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین میگزین

۱۹۶۷ — ۱۹۶۸ء

نگارشات

پرویز شاہدی

پروفیسر عباس علیخاں بیخود ● پروفیسر عبدالرؤف

سجاد نظر　　وحید عرشی　　فیروز عابد

محشر اشرفی ● حشمت الیاس

اور

شمیم النور

سومن گھوش
ایڈیٹر

وحید عرشی
ایڈیٹر اردو سکشن

راما بیس شس لال

1968—GREETINGS
To the Newcomers in our
Beloved University
of Calcutta.
University Student's Union

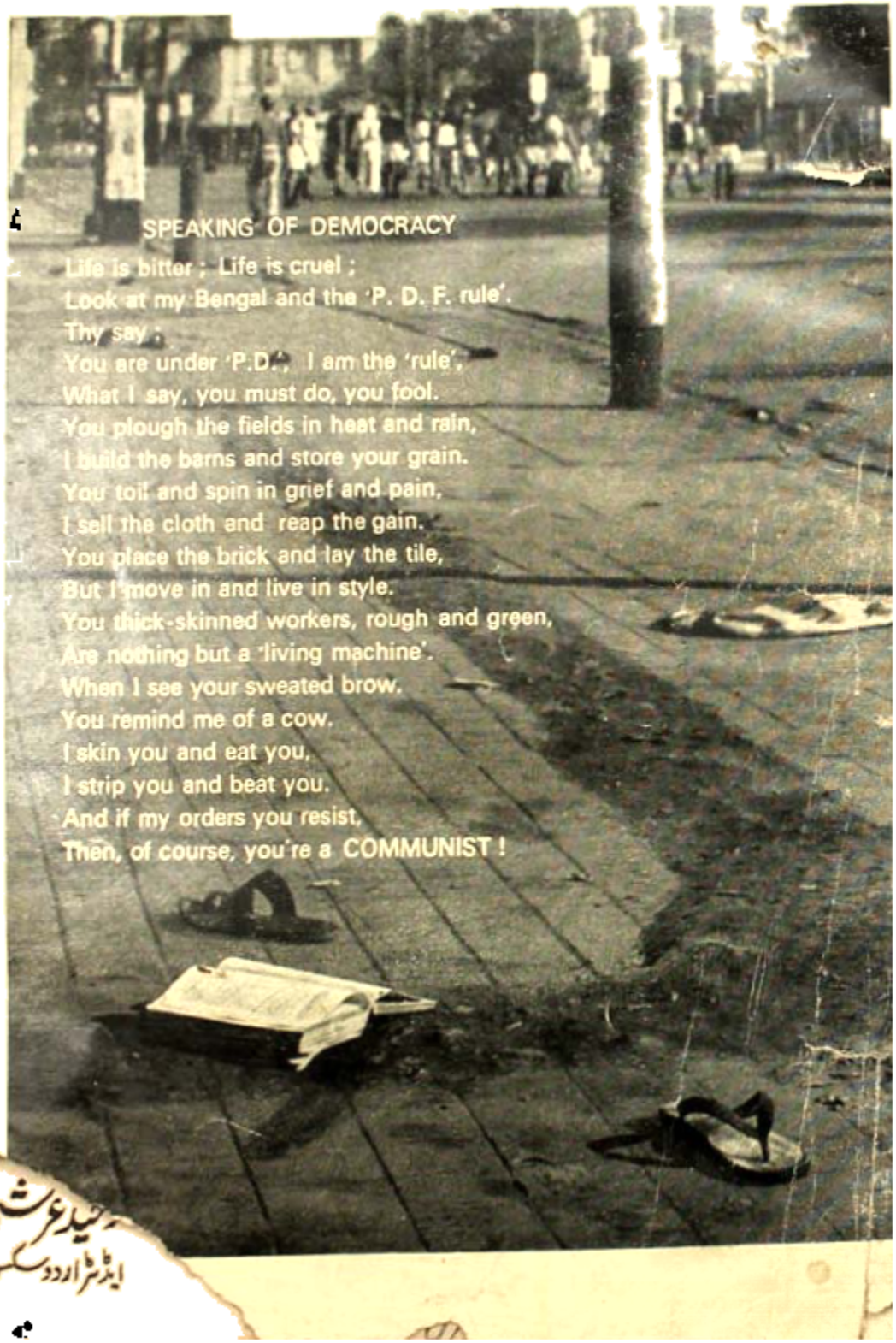

سید عرشی
ایڈیٹر اردو سکن